সম্পাদনা : শিশিরকুমার বসু

ভাষান্তর : সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ ও শিরোনামা : রবীন দত্ত

অনুবাদ-স্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশিকা : সান্ত্বনা দে : পত্রপুট, ২/৩এ রামকান্ত মিস্ত্রি লেন, কলকাতা-১২। মুদ্রক : দিলীপকুমার চৌধুরী। সরস্বতী প্রেস, ১২ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯।

সূচী

নিবেদন ... ...

পর্ব : ২য় ১৯৩৯

ফরওয়ার্ড ব্লক কেন ১
ফরওয়ার্ড ব্লকের ভূমিকা ৬
শান্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবৃতি ১১
মহাজাতি সদন ১৩
আমাদের সমালোচকরা ১৬
এই ক্ষণে যা প্রয়োজন ২০
বন্ধুর কণ্ঠস্বর ২৪
পথের সন্ধানে ২৮
আমার দেশ পরিক্রমা ৩২
অতীতে দৃষ্টিপাত ৪৯
হাই-কমাণ্ড কোন পথে? ৫৭
তাদের সঙ্গে লড়াই কার? ৬২
আমাদের ওয়ার্কিং কমিটি ৬৭
আবার গর্জন ৭২
একটি স্মারক ৭৬
সঠিক পন্থা ৮১
নেতাদের ভুল নেতৃত্ব ৮৬

পর্ব : ৩য় ১৯৪০

ভারতের ছাত্র-সমাজের প্রতি ৯৫
সম্মুখে বিপদ ১০৫
রামগড় ১১০
আমাদের সমস্যা ১১৫
পতন রোধ কর ১১৭
বাংলার জট ১২২
সাম্প্রদায়িক ঐক্যের দিকে ১২৭
জার্মানি সম্পর্কে একটি কথা ১৩০
রামগড় অভিভাষণ ১৩৩
বঙ্গীয় হিন্দুমহাসভা ১৪২
রামগড়ের আহ্বান ১৪৬
যাত্রা হলো শুরু ১৪৯

স্বামীজির বাণী ১৫১
নতুন কুচকাওয়াজ ১৫৩
কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক সংগঠন ১৫৭
ভারত, জাগো ! ১৬১
কাজে তৎপর হও ১৬৫
বাংলা, এগিয়ে চল ! ১৬৭
এ কি ন্যায়সঙ্গত ? ১৭১
অস্থায়ী জাতীয় সরকার ১৭৫
দেশবন্ধু দীর্ঘজীবী হোন ১৭৯
প্যারিসের পর ১৮১
নাগপুরে স্বাগত ১৮৪
নাগপুর অভিভাষণ ১৮৬
দেশের সামনে কর্তব্য ২০৩
হলওয়েল মনুমেণ্ট ২০৬
ফরওয়ার্ড ব্লকের পটভূমি ... ২০৮
জেলের চিঠি ২২৪
আমার রাজনৈতিক প্রতীতি এবং সরকারকে
লেখা অন্যান্য চিঠিপত্র ২৪০
আমার জীবনের বাণী ২৬১
আমার বিবেক আমার নিজের ২৬৫
বাংলা কংগ্রেসের জট ... ২৬৭
লর্ড লিনলিথগোকে লেখা দুইটি চিঠি ২৭৯
বসু-গান্ধী পত্রালাপ : ১৯৪০-৪১ ... ... ২৮৭
বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের নিকট শেষ চিঠি ... ২৯৩

পরিশিষ্ট

নেতাজীকে লেখা রাসবিহারী বসুর একটি
চিঠি ১৯৩৮ ... ২৯৭
১৯৩৯ সালে নেতাজীর চীন সফরের পরিকল্পনা
সংক্রান্ত নথিপত্র ৩০১
নেতাজীকে লেখা জয়প্রকাশ নারায়ণের গোপন
চিঠি ১৯৪০ ... ... ৩০৭

নিবেদন

'ক্রসরোডস্'এর বাংলা সংস্করণ "কোন পথে ?"র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। অনিবার্য কারণে প্রকাশে বিলম্বের জন্য আমরা দুঃখিত।

গত বছর আগস্ট মাসে প্রকাশিত "কোন পথে ?"র প্রথম খণ্ডে ১৯৩৮ সালের এবং ১৯৩৯ সালের প্রথমার্ধের সুভাষচন্দ্রের যাবতীয় বক্তৃতা, রচনা ও চিঠিপত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে রচিত 'ফরওয়ার্ড ব্লক কেন ?' নিবন্ধটি দিয়ে এই খণ্ডের শুরু। তারপর প্রায় এক বছর ধরে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনাগুলি ধারাবাহিকভাবে দেওয়া হয়েছে। বক্তৃতাগুলির মধ্যে নাগপুর ও রামগড় ভাষণ দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪০ সালের জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত শেষ কারাবাসকালীন তাঁর লেখাগুলির মধ্যে শরৎচন্দ্র বসুকে ও সরকারকে লেখা চিঠিগুলি তো আছেই। তাছাড়া এ পর্যন্ত অপ্রকাশিত তাঁর দুটি প্রবন্ধ 'আমার জীবনের বাণী' ও 'ফরওয়ার্ড ব্লকের পটভূমি' এবং কয়েকটি চিঠিও সংযোজন করা হয়েছে। ১৯৪০-এর ডিসেম্বরে মুক্তিলাভের পর ও ১৯৪১ সালের জানুয়ারীতে দেশত্যাগের পূর্বে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের শেষ পত্রালাপ এই খণ্ডের আর একটি বিশিষ্ট সংযোজন। ব্রিটিশ রাজদূত লিনলিথগোকে লেখা তাঁর দুটি চিঠি এবং বাংলা সরকারকে লেখা তাঁর শেষ চিঠি দিয়ে বইটি সম্পূর্ণ হয়েছে।

পরিশিষ্টে তিনটি মূল্যবান দলিল প্রকাশ করা হলো। প্রথম, ১৯৩৮ সালে জাপান থেকে সুভাষচন্দ্রকে লেখা রাসবিহারী বসুর চিঠি, দ্বিতীয়, ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্রের চীন যাত্রার পরিকল্পনা সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য, এবং তৃতীয়, ১৯৪০ সালের শেষে সুভাষচন্দ্রকে লেখা জয়প্রকাশ নারায়ণের গোপন চিঠি। এগুলির রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য সুস্পষ্ট।

১৯৩৮-৪০ সালের ভারতে বিকল্প বৈপ্লবিক নেতৃত্বের প্রবক্তা সুভাষচন্দ্রকে বুঝবার জন্য 'কোন পথে ?' একটি অবশ্য-পাঠ্য প্রামাণ্য বই। কেবল তাই নয়, বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক পটভূমি ত্রিরিশ দশকের শেষের দিকেই রচিত হয়েছিল। দেশের বর্তমান রাজনীতির সূত্র ও নানাজাতীয় সমস্যার সমাধান অনেক ক্ষেত্রেই সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যের মধ্যে পাওয়া যাবে। সুতরাং 'কোন পথে ?' কেবল

ইতিহাসের ছাত্রের জন্যই নয়, বর্তমানের ও ভবিষ্যতের সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মীদের পক্ষেও একটি অপরিহার্য বই।

নতুন তথ্যে এই গ্রন্থ সমৃদ্ধ করতে আমাদের সাহায্য করেছেন দিল্লীর ন্যাশনাল আর্কাইভস্ অব্ ইণ্ডিয়া, লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ও শ্রীনৃপেন্দ্র-চন্দ্র মিত্র মহাশয়। শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুবাদের কাজ অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পত্রপুট সংস্থার উদ্যম গ্রন্থপ্রকাশ সম্ভব করেছে। শ্রীবিনোদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ছাপার কাজ তত্ত্বাবধানের সব ভার সানন্দে বহন করেছেন। এঁদের সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

সাধারণ পাঠকমহলে নেতাজীর জীবনী অবলম্বন করে নানাপ্রকার অ্যাডভেঞ্চার ও রহস্যের কাহিনীর চাহিদা তাঁর নিজের রচনাবলীর চেয়ে অনেক বেশী। দেশের স্বার্থে এই অবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে। 'কোন পথে?'র মত বইয়ের বহুল প্রচারে ও পঠনপাঠনের মাধ্যমেই তা সম্ভব। আশা করি দেশবাসী এই প্রয়াসে আমাদের সহায় হবেন।

জয়হিন্দ

১৩ শরৎ বসু রোড
কলকাতা-২৬ — শিশিরকুমার বসু
৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

কোন পথে ?

দ্বিতীয় খণ্ড

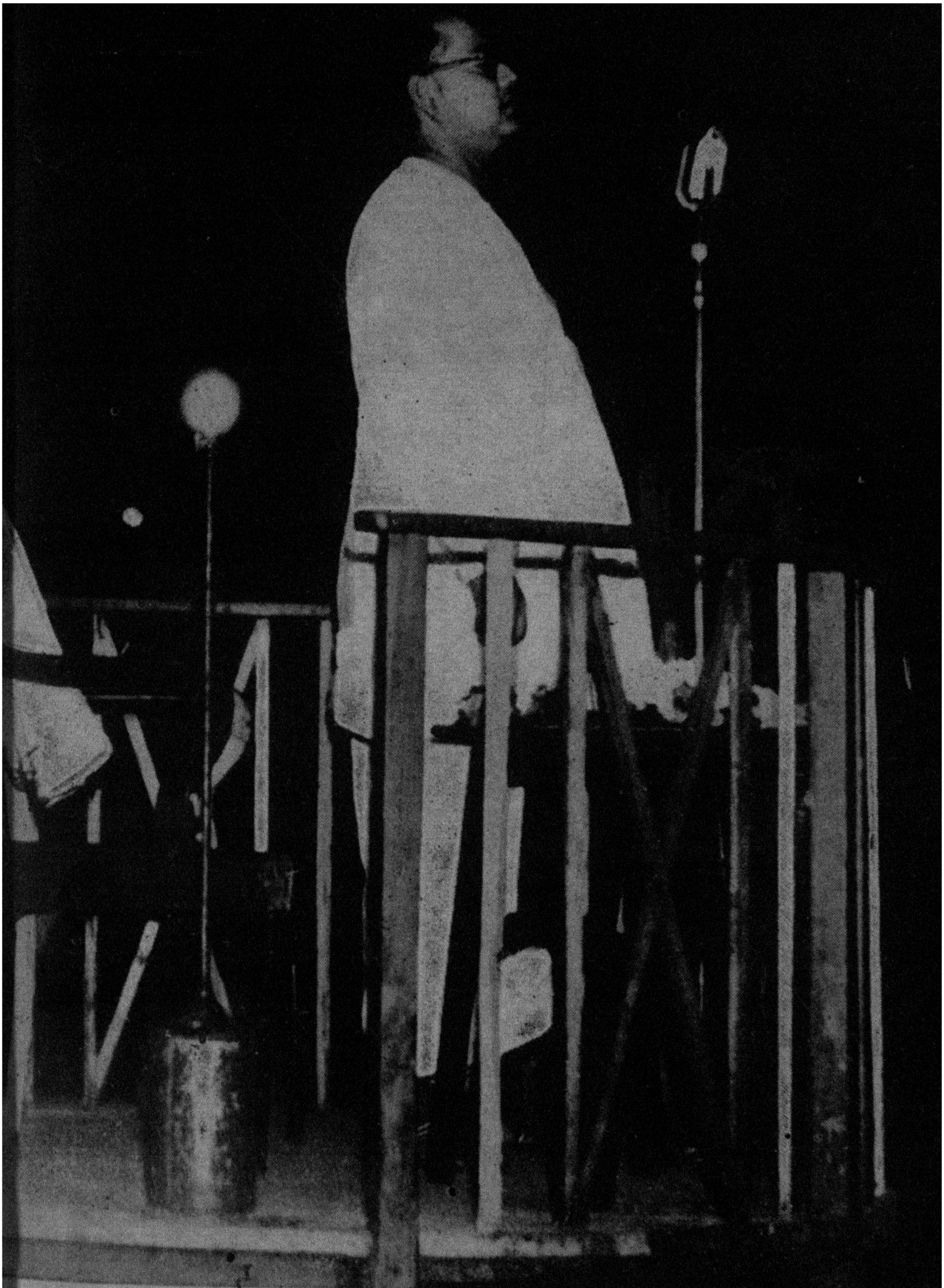

কলকাতার জনসভায় বক্তৃতারত – ১৯৩৯

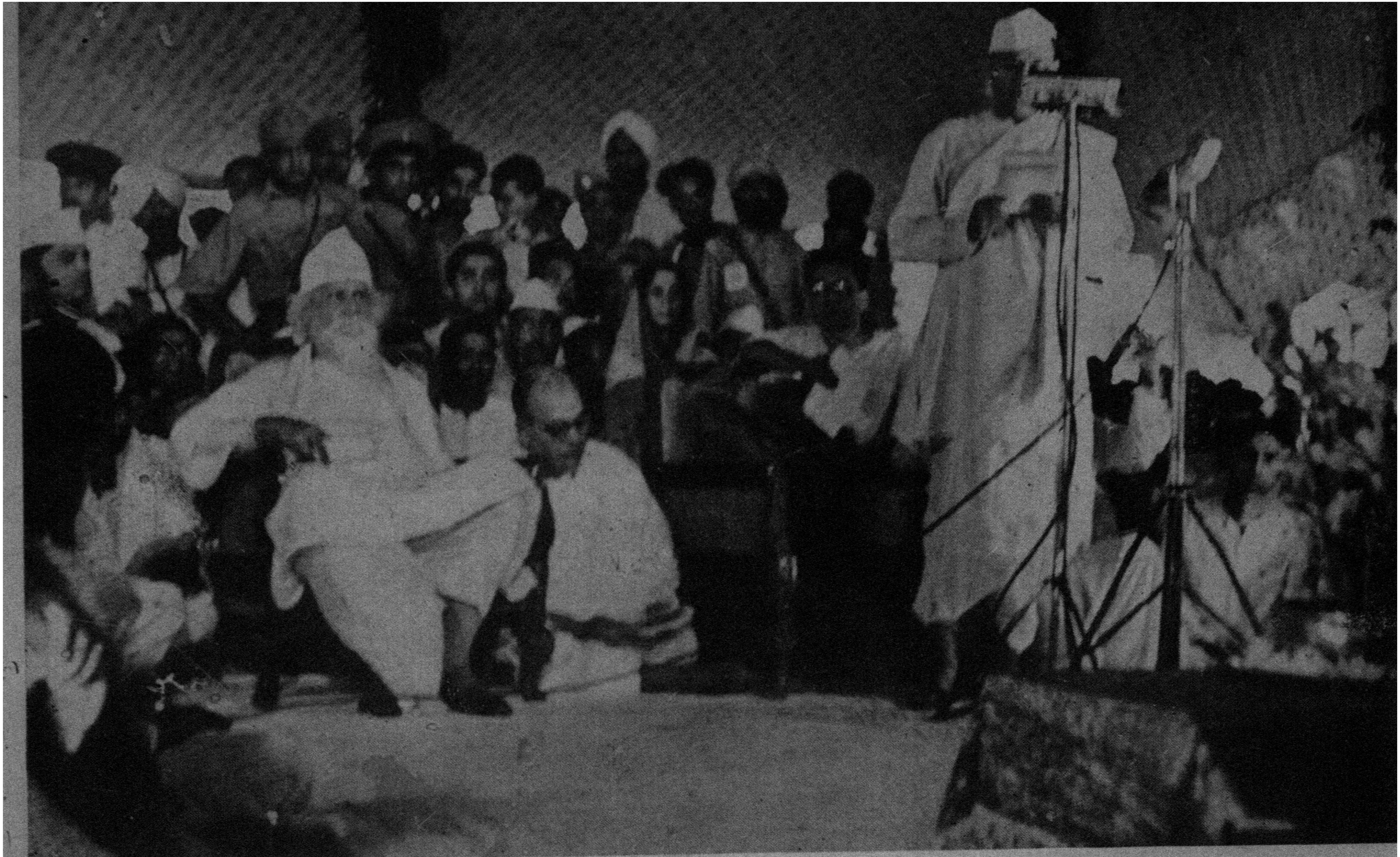

মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনা অনুষ্ঠান — ১৯৩৯। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র

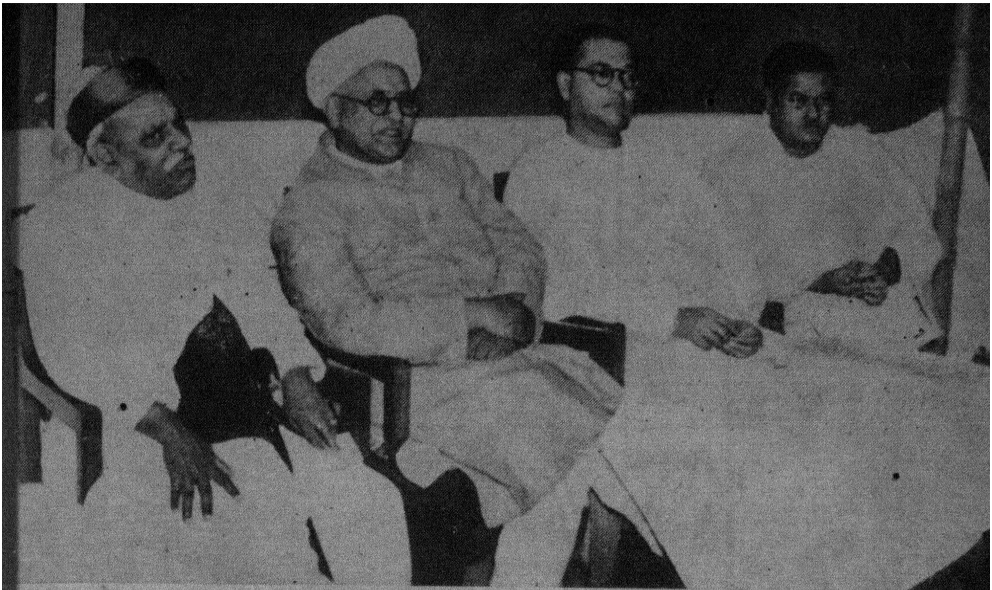

ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের প্রাক্কালে বিরোধী নেতাদের সম্মেলন (৪১নং উডবার্ন পার্ক ১৯৩৯)
এম. এস. অ্যানে, সত্যপাল, সুভাষচন্দ্র, কামিনীকুমার দত্ত

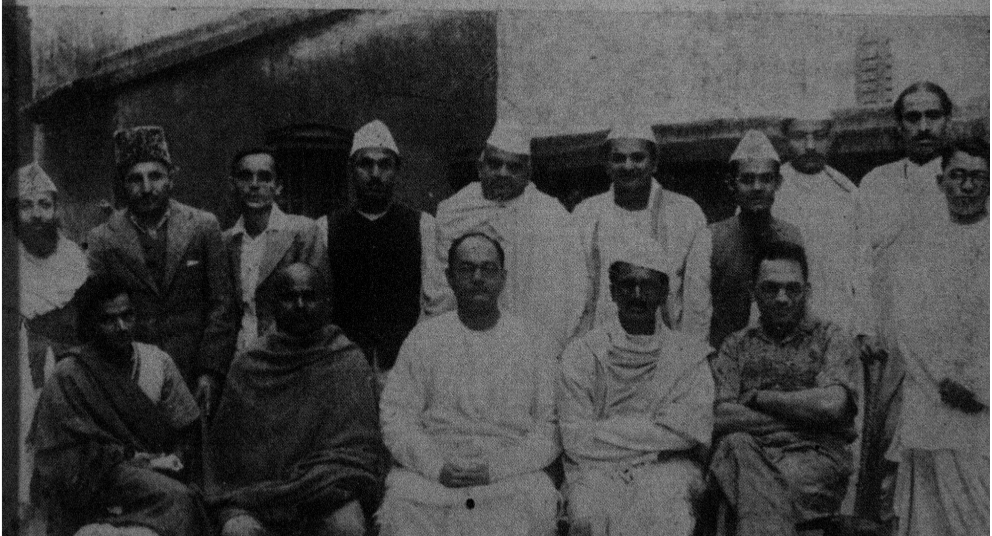

কলকাতায় (নেতাজী ভবনে) বামপন্থী নেতাদের সভা – ১৯৩৯

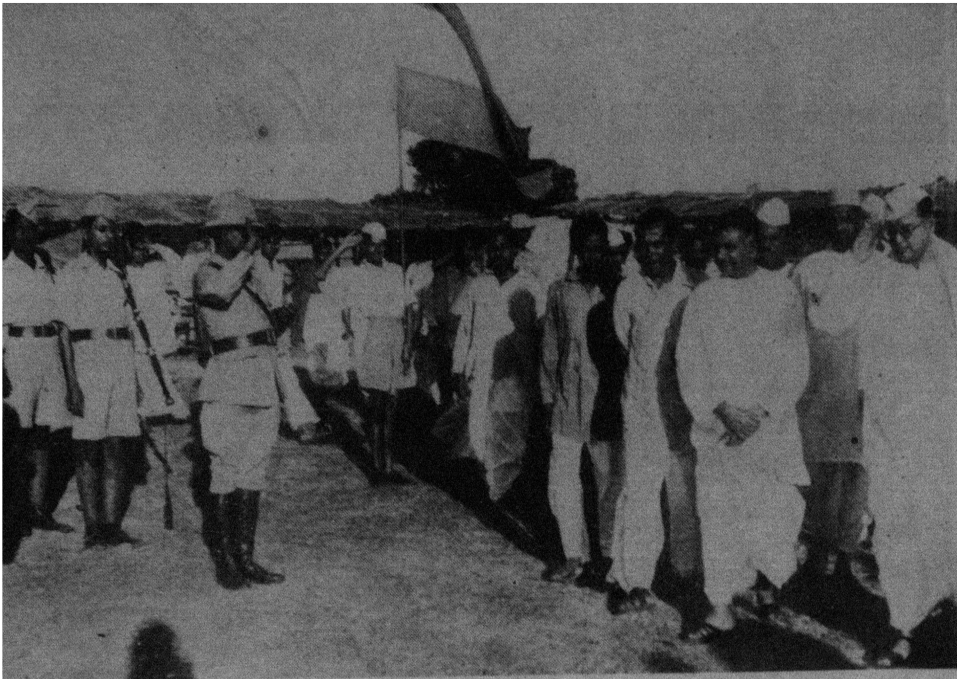

রামগড়ে আপোষ বিরোধী সম্মেলনে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান—১৯৪০

শেষবার জেল থেকে মুক্তি পাবার পর
গৃহীত ছবি — ডিসেম্বর ১৯৪০।
(আনন্দবাজার পত্রিকার সৌজ

ফরওয়ার্ড ব্লক কেন

৫ই আগস্ট ১৯৩৯-এর 'ফরওয়ার্ড ব্লকে' স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে ভারতভূমি থেকে উদ্ভূত এক আন্দোলন রূপপরিগ্রহ করেছে। এটি ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক মুখপাত্র এবং এরই মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে তাদের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ। এটি এমন এক সংগঠন যার উন্নতি ও বিকাশের অফুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে—ভারতীয় জাতির সম্ভাবনা যেমন সীমাহীন এই সংগঠনের সম্ভাবনাও তেমনই। কংগ্রেসের উন্নতি ও বিকাশ ভিতরকার তাগিদের ফলেই সম্ভব হয়েছে যদিও বাইরের অনেক কারণে তা প্ররোচিত। ভিতরকার এই তাগিদই ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্মের জন্য মুখ্যত দায়ী। ব্যক্তিগত কারণ কিংবা আকস্মিক কোন অবস্থার উদ্ভব ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে এই নতুন ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। ফরওয়ার্ড ব্লকের আবির্ভাব ঘটেছে যেহেতু কংগ্রেসকে তার ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়ায় নতুন এক পর্যায়ে প্রবেশ করতে হবে।

এখন, কংগ্রেসের এই বিকাশ ও উন্নয়ন কিভাবে সংঘটিত হয়? তার অন্তর্নিহিত নিয়মসূত্র কী? ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে অনেক তত্ত্বের কথা বলা যেতে পারে, কিন্তু আমার কাছে যা সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় এবং আমার মতে যেটি আর সবের থেকে বেশী বাস্তবানুগ, তা হেগেলীয় ডায়ালেকটিক বা দ্বন্দ্ববাদ। প্রগতি যেমন সরল রেখা অনুসরণ করে না, তেমনই তার চরিত্রও সব সময় শান্তিপূর্ণ নয়। প্রায়ই প্রগতি আসে সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে।

'তত্ত্ব' ও 'বিপরীত তত্ত্বে'র সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে 'সমন্বয় তত্ত্বে'র জন্ম হয়। এই 'সমন্বয় তত্ত্ব' আবার ক্রমবিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে 'তত্ত্ব' হয়ে ওঠে। এই 'তত্ত্ব' আবার 'বিপরীত তত্ত্ব'কে জাগিয়ে তোলে

এবং সেই সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটে আরেক 'সমন্বয় তত্ত্বে'। এইভাবে প্রগতির চাকা ক্রমাগত এগিয়ে চলে।

যাঁরা যখন তখন একতার কথা বলেন এবং সর্বক্ষেত্রে ও সর্ব অবস্থায় একতা বজায় রাখার জন্যে আবেদন করেন, তাঁরা ক্রমবিকাশের এই মূল সূত্রটি খেয়াল রাখেন না। সত্যকার একতা এবং ভুয়ো একতা, কর্মের একতা ও অকর্মণ্যতার একতা, যে একতা প্রগতিধর্মী এবং যে একতা অচল অবস্থা সৃষ্টি করে—এদের মধ্যে আমাদের পার্থক্য করতে হবে। আজ 'যে কোন মূল্যে এবং সকল অবস্থায় একতা' স্লোগান তাদের কাছেই সুবিধাজনক স্লোগান হয়ে উঠেছে যারা আর সক্রিয় নয় এবং বৈপ্লবিক প্রেরণা যাদের আর নেই। এই মন ভোলানো আবেদনে আমরা যেন বিপথে চালিত না হই।

জীবন্ত ও সক্রিয় প্রতিটি আন্দোলনে প্রচ্ছন্ন একটি বামপন্থী শক্তি থাকে—আপনারা বলতে পারেন—একটি প্রচ্ছন্ন 'বিপরীত তত্ত্ব'। কাল পূর্ণ হলে এই প্রচ্ছন্ন বামশক্তি প্রকট হয় এবং সময়ে তার আরও বিকাশ ও অভিব্যক্তি ঘটে। কতকগুলি অবস্থার একটি নির্দিষ্ট সন্নিবেশের মধ্যে কি ভাবে বামপন্থী শক্তির পোষকতা করা যেতে পারে তা জেনে ঠিক করতে হলে রাজনৈতিক, এবং কখনও কখনও দার্শনিক, অন্তর্দৃষ্টি দরকার। প্রায়ই এমন হয় যে, দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে আপস ও সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে বামপন্থীরা শক্তি অর্জন করে এবং প্রভাব বিস্তার করে। ভিন্ন অবস্থার সন্নিবেশে, তা সম্ভব নাও হতে পারে। অতএব বামপন্থীর পক্ষে দক্ষিণপন্থী থেকে নিজেদের আলাদা করা এবং নিজস্ব শক্তি ও দলকে সংহত ও প্রসারিত করা প্রয়োজন হতে পারে। এই রকম অবস্থায়, সাময়িকভাবে বেদনাদায়ক হলেও, তীব্র সংঘর্ষ বাস্তবিকপক্ষে প্রগতির অনুকূল হতে পারে এবং আসলে তা অপরিহার্যও। বামপন্থী শক্তির আবির্ভাব ও বিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে যুক্ত থাকে সাংগঠনিক উন্নতি। দক্ষিণী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা করে অথবা তার সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে বামপন্থী শক্তি যতদিন পর্যন্ত সংগঠনকে দখল করতে না পারে অথবা দক্ষিণীদের তাদের স্বমতে

আনতে না পারে ততদিন বামশক্তির অব্যাহত বৃদ্ধি প্রয়োজন। যখন এই লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে এবং বামপন্থী শক্তির (তখন যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হবে) সকল সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাবে, তখন ইতিহাসের পুনরাবর্তন ঘটবে, নতুন এক বামপন্থী দলের উদ্ভব হবে—যারা শেষ-পর্যন্ত বিগত দিনের বামপন্থীদের উৎখাত করবে। ১৯২০-এর গান্ধী-বাদীরা কংগ্রেসের বামপন্থী দল ছিল, কিন্তু তাই থেকে এই বোঝায় না, তারা আজকেরও বামপন্থী। কাল যারা বামপন্থী ছিল তারা সব সময়ে না হলেও, প্রায়ই আগামীকালের দক্ষিণপন্থী হয়ে যায়। আজকের কংগ্রেসের মধ্যে বাম ও দক্ষিণের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকা উচিত নয় এই কথা বলা এবং কংগ্রেস সমগ্রভাবে বামপন্থী এই রকম যুক্তি দেখানো—অর্থহীন প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়। যতই অপ্রীতিকর হোক না কেন যা বাস্তব ঘটনা তা আমাদের মেনে নেবার সময় হয়েছে।

১৯৩৬ এবং ১৯৩৮-এর মধ্যে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতার ফলে কংগ্রেসের বামপন্থী শক্তি বেড়ে ওঠে এবং বিকাশলাভ করে। ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরে দক্ষিণপন্থীদের তরফ থেকে প্রথম ধুয়ো তোলা হয় যে, বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা আর সম্ভব নয় এবং তারা এত হৈহল্লা করছে ও এমন ঝঞ্ঝাট করছে যে তাদের সঙ্গে হাত মেলানো আর চলে না। এই নতুন ধুয়ো শেষপর্যন্ত চরমে পৌছয় ১৯৩৯-এ, যখন দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা বন্ধ করার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেয়। দক্ষিণপন্থীরা যে বর্তমানে সমমতাবলম্বী কেবিনেট বা ওয়ার্কিং কমিটির জন্যে জিদ্ করে চলেছে তার পিছনে আর কী গভীর তাৎপর্য থাকতে পারে? তিন বছর তারা বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করে এসেছে, কিন্তু আর তারা তা পারছে না। কেন? যেহেতু কংগ্রেসের ভিতরে বামপন্থীরা ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠছে দেখে দক্ষিণপন্থীদের আর নির্বিকার থাকা সম্ভব নয়।

নতুন কেবিনেটের বা ওয়ার্কিং কমিটির এই সমস্যা সমাধান করার জন্যে ১৯৩৯-র ২৯শে এপ্রিল কলকাতায় যখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসে তখন দেখা গেল বামপন্থীরা দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে

সহযোগিতা করতে রাজী এবং তাদের স্লোগান ছিল সর্বদলীয় বা মিশ্র কেবিনেটের সপক্ষে। দক্ষিণপন্থীরা কিন্তু বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত ছিল না এবং তাদের স্লোগান ছিল সমমতাবলম্বীদের নিয়ে কেবিনেট গঠনের স্লোগান। ফলত দক্ষিণপন্থীরাই কিন্তু আপস, সহযোগিতা এবং একতা অসম্ভব করে তুলল। বামপন্থীদের সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে, তার কমে আজকের দক্ষিণপন্থীরা কিছুতেই খুশী নয়। একতার জন্যে কি বামপন্থীরা তা মেনে নেবে ? যদি তারা তাই করে, তার পরিণাম কী হবে ? আমরা কি তার ফলে প্রগতির চাকাকে আরও বেগে চলাতে পারব কিংবা আমাদের দলের ভিতরকার প্রতিক্রিয়াকে রসদ যোগাব ?

দক্ষিণপন্থীরা যখন বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজী নয়, তখন আমরা বামপন্থীরা একতার জন্যে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেদের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে পারতাম, যদি দক্ষিণ-পন্থীদের তখনও কোন সক্রিয় ভূমিকা থাকত। কিন্তু মার্চ ও এপ্রিল মাসে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার যে পত্রালাপ হয়েছে তাতে দুর্ভাগ্য-বশত একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তিনি আসন্ন কোন সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে আর চিন্তা করছেন না। মন্ত্রীরা এবং তাঁদের পরিচালক-রূপে যাঁরা এখন কংগ্রেসের উপর আধিপত্য করছেন, তাঁদেরও চিন্তায় সংগ্রামের স্থান নেই। এইরকম পরিস্থিতিতে দক্ষিণপন্থীদের কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং বাইরে একতার ভেথ বজায় রাখার অর্থ আসলে দাঁড়ায় কংগ্রেসের ভিতরকার প্রতিক্রিয়া ও অচলাবস্থাকে টিঁকিয়ে রাখা। আমরা তা পারি না। তা পারা আমাদের পক্ষে উচিতও না।

অতএব বামপন্থীদের দক্ষিণপন্থীদের থেকে আলাদা হয়ে নিজেদের সংহত হবার সময় এসেছে। যখন তা সম্পন্ন হবে, বামপন্থীরা তখন কংগ্রেসের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে এবং তারপরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নামে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করতে অগ্রসর হবে। আজকের বামপন্থীদের এই কাজ। এই কাজের দায়িত্ব পালন করতে ফরওয়ার্ড ব্লকের উদ্ভব হয়েছে।

বর্তমান বামপন্থী দলগুলির পক্ষে এই বামসংহতির ভূমিকা গ্রহণ করতে কোন বাধা ছিল না, কিন্তু কোন না কোন কারণে, গত বছরে তাঁরা সে ভূমিকা গ্রহণ করেননি। গত বছর বামপন্থী কংগ্রেসকর্মীরা যখন বামপন্থী ব্লক গঠন করার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করছিলেন—মনে হয়েছিল বামপন্থী দলগুলি এই প্রস্তাব গ্রহণ করে তা কার্যকর করার প্রয়াস করবে। কিন্তু পরে তাঁরা মত বদলান। তখন বামপন্থী দলগুলি থেকে আগত নতুন কর্মীদের নিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক পত্তন করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াল। অতএব ফরওয়ার্ড ব্লক কেবলমাত্র কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ তাগিদ থেকেই সৃষ্টি হয়নি, তা ঐতিহাসিক আবশ্যকতারও ফল। এ ছাড়াও, আজকের অবস্থা সন্নিবেশও এর আবির্ভাবের পক্ষে। যে ফরওয়ার্ড ব্লকের এইভাবে এবং এই অবস্থার মধ্যে উদ্ভব, সেই ফরওয়ার্ড ব্লক মরতে পারে না। আমাদের রাজনৈতিক বিকাশধারায় এটি একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। তা স্থায়ী হয়ে রইল এবং যত দিন যাবে তত শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আমার কথার সত্যতা সম্বন্ধে যাঁদের সন্দেহ আছে তাঁরা যেন ধৈর্য ধরে কংগ্রেসের এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের ভবিষ্যৎ ইতিহাস অনুধাবন করেন।

ফরওয়ার্ড ব্লকের ভূমিকা

১২ই আগস্ট, ১৯৩৯-এর 'ফরওয়ার্ড ব্লকে' প্রকাশিত স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

কয়েকটি ছোটখাটো খণ্ডযুদ্ধের পর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে বামপন্থীরা ১৯২০ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দখল করে নিতে সক্ষম হয়। তাই থেকেই মিস্টার জিন্না, মিস্টার বি. সি. পাল, মিস্টার বি. চক্রবর্তীর মত প্রাক্তন নেতারা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্কেত পান। বামপন্থীরা কংগ্রেসের প্রধান দল হয়ে দাঁড়াল এবং কিছুদিন তারা সংখ্যায় সর্বাধিক হয়ে রইল। ১৯২২ সালে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে ভাঙন দেখা দিল। এবং আইন সভাতে লড়াই চালানোর প্রশ্নে এই দল দুটি উপদলে ভাগ হয়ে গেল—স্বরাজবাদী এবং সনাতনপন্থী (নোচেঞ্জার)। কিছুকাল পরে আইন সভায় লড়াই সম্প্রসারিত করার স্বরাজবাদী পরিকল্পনা কংগ্রেস গ্রহণ করায় এই বিরোধ মিটে যায়।

১৯২৮ সালে নেহরু কমিটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সেই রিপোর্টে অধিকাংশ সদস্য ডমিনিয়ন স্টেটাসের ভিত্তিতে ভারতের একটি গঠনতন্ত্রের সুপারিশ করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ-রূপে এক বামপন্থী দলের আবির্ভাব ঘটে। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের যে বার্ষিক অধিবেশন হয় তাতে লীগের সদস্যরা কংগ্রেসকে তাদের স্বমতে আনতে চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। লীগের সদস্যরা চেয়েছিল কংগ্রেস তার আদর্শের পরিবর্তন করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করুক যে কংগ্রেসের লক্ষ্য—স্বাধীনতা। কংগ্রেসের মূল সংস্থা থেকে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়েছিল এবং তার নেতৃত্ব করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। এক বছর ধরে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সঙ্গে সংঘর্ষ চলে। শেষপর্যন্ত ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে মহাত্মাজীর অনুরোধে স্বাধীনতাকে তার লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

এই আপসের ফলে কংগ্রেসের সব দল-উপদলের পক্ষে একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

১৯৩৩-এ লড়াই স্থগিত রাখা এবং ১৯৩৪-এ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সংসদীয় কার্যক্রম গ্রহণ বামপক্ষকে বিদ্রোহী করে তুলল। তখনই কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির উদ্ভব হয় এবং যথাসময়ে এই দলের আবির্ভাব ও তাদের সক্রিয় ভূমিকার ফলেই নিয়মতান্ত্রিকতার দিকে যে প্রবণতা দেখা গিয়েছিল তা অনেকাংশে নিরস্ত হয়। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি শীঘ্রই কংগ্রেসের ভিতরকার বামপন্থীদের মিলন কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল।

১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত সংখ্যা ও প্রভাব এই উভয় দিক থেকেই কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারিতে হরিপুরায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে দেখা গেল সি.এস.পি.-র অগ্রগতি থেমে গেছে। হরিপুরা কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টের অভিভাষণে আমি বলেছিলাম কংগ্রেসের ভিতরে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির ভূমিকা সমাজতান্ত্রিক ভূমিকার বদলে হওয়া উচিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বামপন্থীর ভূমিকা এবং একমাত্র এই শেষোক্ত ভূমিকা পালন করেই তা অগ্রগতি বজায় রাখতে পারবে।

হরিপুরা কংগ্রেসের পর সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট বন্ধুদের সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়, তাঁরা এই মতের সঙ্গে একমত হন। সাধারণভাবে সবাই বোধ করছিল, সোশ্যালিস্ট বা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে প্রস্তুত নয়, অথচ কংগ্রেসের ভিতরে যারা প্রগতিশীল, বৈপ্লবিক ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী তাদের ন্যূনতম সাধারণ একটি কার্যক্রমের ভিত্তিতে সংগঠিত করা দরকার। আমার আরও মনে হয়েছিল, একমাত্র এই উপায়েই দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণ প্রতিহত করা যেতে পারে এবং একটি মার্কসবাদী পার্টির বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে পারে।

গান্ধী সেবা সঙ্ঘ, যাকে বলা যেতে পারে কংগ্রেসের বর্তমান সংখ্যা-

গরিষ্ঠ দলের (অথবা গান্ধী পার্টির) 'লৌহ কাঠামো', সেই সঙ্ঘ ১৯৩৮—এর মার্চ মাসে ওড়িশার দেলাংয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি কনফারেন্সের অনুষ্ঠান করে। এই কনফারেন্সে গান্ধী সেবা সঙ্ঘ বামপন্থীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মধ্যে সঙ্ঘ স্থির করে শ্রমিক এলাকায় তারা তাদের লোক পাঠাবে, উদ্দেশ্য এদেশে শ্রেণীসচেতন ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের পক্ষে যে সকল ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী কাজ করছে তাদের যাতে উৎখাত করা যায়। আরও স্থির হয়, দেশের প্রাদেশিক ও অন্যান্য কংগ্রেস সংগঠনগুলিকে হাত করার জন্যে তারা তাদের প্রধান প্রধান সদস্যদের নিয়োজিত করবে।

১৯৩৪ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যে সংসদীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে তার চূড়ান্ত পরিণতি দেখা দেয় ১৯৩৭-এ প্রদেশগুলিতে সরকারী ক্ষমতা গ্রহণে। এর ফলে দক্ষিণপন্থীরা তাদের অবস্থা এত সংহত করে তুলল এবং তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি এমন বাড়িয়ে ফেলল যে ১৯৩৮—এ তারা বামপন্থী শক্তির উপর আক্রমণ চালাতে শুরু করল। এই সুচিন্তিত আক্রমণের বিরুদ্ধে বামপন্থী শক্তি যদি সচেতন-ভাবে নিজেদের সংগঠিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে পারত তবেই তার টিকে থাকার আশা ছিল।

যদি কংগ্রেসের ভিতরকার প্রগতিশীল, বৈপ্লবিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সকলে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির পতাকাতলে মিলিত হতে পারত, তাহলে ব্যাপারটা খুবই সহজ হয়ে যেত। কিন্তু তা হল না। এই কারণেই, হরিপুরা কংগ্রেসের পরে ন্যূনতম সাধারণ এক কার্যক্রমের ভিত্তিতে বামপন্থী সবাইকে সংগঠিত করার জন্যে একটি বামপন্থী ব্লক গড়বার কথা ভাবা হয়েছিল। যদি বর্তমান বামপন্থী পার্টিগুলি এই বামপন্থী ব্লক (এখন যার নতুন নামকরণ হয়েছে ফরওয়ার্ড ব্লক) গড়ে তোলার দায়িত্ব নিত, তাহলে এর মধ্যে বামপন্থীদের সংহত করার কাজ অনেক এগিয়ে যেত।

কিন্তু ব্যক্তি বা দল আমাদের নিরাশ করলেও, আদর্শের অবহেলা

কখনই স্বীকার্য নয়। এই জন্যে বামপন্থী যাদের পাওয়া গেছে তাদের নিয়েই ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করা হয়েছে। পথ বাধাসঙ্কুল হওয়া সত্ত্বেও ব্লক যে অভূতপূর্ব ত্বরিতগতিতে বিকাশ ও প্রসার লাভ করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এবং সে-সময় শীঘ্রই আসবে যখন আজ যাঁরা এতে যোগ দিতে দ্বিধাগ্রস্ত তারা দ্বিধা ত্যাগ করে যোগ দিতে এগিয়ে আসবেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের সামনে এবং কংগ্রেসের বামপন্থী শক্তির সামনে তিনটি কর্তব্য—বামপন্থীদের মধ্যে সংহতি, কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠদের জয় করে আনা, এবং জাতীয় সংগ্রাম শুরু করা। যাঁরা আমাদের সমালোচনা করেন এবং ছিদ্রান্বেষণ করে থাকেন তাঁরা এর চেয়ে ভালো কিছু বিকল্প প্রস্তাব দিন। আমরা তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করব না। তবে আমাদের যতদূর মনে হয় অন্য কোন বিকল্প সম্ভব নয়।

যে দক্ষিণপন্থীরা সংগ্রামের কথা ভাবা ছেড়ে দিয়েছে এবং এখন নিয়মতান্ত্রিকতা ও সংস্কারবাদের ধারায় চিন্তা করছে তাদের কব্জা থেকে কংগ্রেসকে বাঁচাতেই হবে। একমাত্র বামপন্থী শক্তিই কংগ্রেসের বৈপ্লবিক চরিত্র বজায় রেখে অবিলম্বে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম শুরু করতে পারে।

আজকাল কোন কোন মহলে 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি সস্তা হয়ে গেছে। কিছু প্রদেশে এমন সোশ্যালিস্টদের পাওয়া যেতে পারে যারা মন্ত্রীদের তল্পীবাহক। অতএব যে সকল দক্ষিণপন্থী সমাজতন্ত্রের ভেখ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের সম্পর্কে আমাদের সাবধান হতে হবে। কথা নয়, কাজ চাই। যারা যথার্থ সোশ্যালিস্ট দৈনন্দিন কার্যকলাপে তাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বামপন্থী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। শুধু বামপন্থী বুলি আউড়িয়ে এবং চটকদার বক্তৃতা দিয়ে বিশেষ কিছু লাভ হবে না।

কংগ্রেসের মধ্যে যারা প্রগতিবাদী, বৈপ্লবিক ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, তারা সোশ্যালিস্ট হোক বা নাই হোক, ফরওয়ার্ড ব্লক তাদের সবাইকে একত্র করবে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ফলে

ভারত তার জন্মগত স্বাধীনতার অধিকার লাভ করবে, এই সংহতির মধ্যে দিয়ে জনগণ সেই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবে। কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ব্লককে ভেঙে দেওয়া হবে না। এর জীবন ও কর্মপ্রয়াসের নবপর্যায় তার দ্বারা সূচিত হবে। এবং সেই পর্যায় নিঃসন্দেহে হবে সমাজতান্ত্রিক পর্যায়।

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবৃতি

আগস্ট ১৯, ১৯৩৯।

কংগ্রেস থেকে কার্যত তিন বছরের জন্যে আমাকে বহিষ্কার করার যে সিদ্ধান্ত ওয়ার্কিং কমিটি নিয়েছে আমি তা সাদরে গ্রহণ করছি। গত কয়েক বছর ধরে 'দক্ষিণপন্থীদের জোট বাঁধবার' যে প্রক্রিয়া চলে আসছে প্রদেশে প্রদেশে মন্ত্রিত্বের গদি নেবার ফলে তা আরও জোরদার হয়ে উঠেছে। সেই প্রসঙ্গে যুক্তিসঙ্গত পরিণতি এই সিদ্ধান্ত। ওয়ার্কিং কমিটির এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে কংগ্রেসের বর্তমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আসল চরিত্র এবং তারা যে ভূমিকা পালন করে চলেছে তা উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ছে। আমাকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তা তাদের দিক থেকে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। নিয়মতান্ত্রিকতা ও সংস্কারবাদের দিকে নিয়মিত সরে যাওয়া সম্পর্কে দেশকে সতর্ক করে যে-সব প্রস্তাবে কংগ্রেসের বৈপ্লবিক চরিত্রকে হনন করার প্রয়াস করা হয়েছে তার প্রতিবাদ করে, বামসংহতির উদ্দেশ্যে কাজ করে, এবং সবশেষে হলেও যার গুরুত্ব কম নয়, আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হতে দেশবাসীর কাছে ক্রমাগত আবেদন করে—আমি এমন একটি অপরাধ করেছি যার জন্যে আমাকে দণ্ডভোগ করতেই হবে। আমাকে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে আমার অগণিত দেশবাসীর কাছে তা অভাবিত আঘাত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তা হয়নি। এতে প্রকট হয়েছে নিয়মতান্ত্রিকতা এবং গণসংগ্রামের মধ্যে বিরোধের যথার্থ যুক্তিসঙ্গত পরিণতি এবং আমাদের রাজনৈতিক বিবর্তনের অনিবার্য এক পর্ব। এইজন্যে, আমার মধ্যে রাগ বা তিক্ততা লেশমাত্র নেই। শুধু এই ভেবে আমার দুঃখ হচ্ছে যে, ওয়ার্কিং কমিটি বোঝেনি তাদের এই ধরনের কাজে আমি যতটা আঘাত পাব তার চেয়ে তারাই আঘাত পাবে বেশী।

ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্যদের কাছে, সাধারণভাবে বামপন্থীদের কাছে এবং জনসাধারণের কাছে আমার আবেদন তাঁরা যেন এই প্ররোচনা সত্ত্বেও শান্ত ও সংযত থাকেন এবং আরও বেশী ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যান। আমার উপরে যদি নিপীড়ন চালানো হয় তাতে কী আসে যায় ? আমি আগের থেকেও আরও বেশী অনুরাগের সঙ্গে কংগ্রেসকে জড়িয়ে ধরব এবং জাতির একজন সেবকরূপে দেশকে ও কংগ্রেসকে সেবা করে যাব। দেশবাসীর কাছে আমি আবেদন করছি তাঁরা দলে দলে এগিয়ে এসে কংগ্রেসে যোগ দিন এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্য তালিকাভুক্ত হোন। একমাত্র এইভাবে চললেই আমরা কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীদের আমাদের মতে ভিড়িয়ে আনতে পারব এবং নিয়মতান্ত্রিকতা ও সংস্কারবাদের বর্তমান নীতির বিপর্যয় ঘটিয়ে ভারতীয় জনগণের সম্মিলিত শক্তি নিয়ে স্বাধীনতার জন্যে জাতীয় সংগ্রাম শুরু করতে পারব।

পরিশেষে জনসাধারণকে অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন ভুলে না যান যে, আজ যা ঘটছে তা ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তিমাত্র। অনেক বছর আগে বামপন্থীদের একবার কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, কিন্তু বেশীদিন অতিবাহিত হয়নি, তারা বিপুল সংখ্যায় ফিরে আসে। কংগ্রেসকে তখন তাদের নীতি ও কার্যক্রম মেনে নিতে হয়। আমার মনে কোন সন্দেহ নেই, আমরা বামপন্থীরা যে আদর্শকে রূপ দিতে চাই তা ন্যায়সঙ্গত এবং ওয়ার্কিং কমিটির এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণে তার যতখানি বিকাশ ঘটবে অন্য কোন উপায়ে তা ঘটবে না। দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সব অঞ্চল থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের ডাকে যে বিস্ময়কর সাড়া জেগেছে তাতে আমি নিশ্চিত বোধ করছি যে, কংগ্রেসকে আবার আমরা পুনরুজ্জীবিত করে তার বৈপ্লবিক ভূমিকায় ফিরিয়ে আনতে পারব এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নামে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করতে সক্ষম হব।

মহাজাতি সদন

৯ই আগস্ট ১৯৩২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'মহাজাতিসদনে'র ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে নেতাজীর ভাষণ।

বহুদিনকার এক স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করবার প্রথম প্রচেষ্টা উপলক্ষ্যে আজ আমরা সকলে একত্রিত হয়েছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা এবং সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার ও নির্যাতন ভোগ করে আসছেন, তাঁরা অনেকদিন থেকে একটা অভাব বোধ করে আসছেন; সে অভাব একটা গৃহের, যেখানে তাঁদের যাবতীয় সেবাকার্য আশ্রয় পেতে পারে এবং যেটা তাঁদের আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও আদর্শের একটা বাহ্য প্রতীক স্বরূপ হতে পারে। ইতিপূর্বে আমাদের জাতীয় নিকেতন নির্মাণের চেষ্টা একাধিকবার করা হয়েছে কিন্তু কৃতকার্য হয়নি। পরিশেষে আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা 'মহাজাতি সদনের' ভিত্তি স্থাপনা আজ করা হবে। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা আজ আপনাকে আমাদের মাঝে পেয়েছি এবং আপনার দ্বারা সেই বীজ বপন করাতে পারছি যার ফলের দ্বারা আমরা একদিন ভবিষ্যৎ ভারতের জাতীয় জীবনকে পরিপুষ্ট ও সুসমৃদ্ধ করে তুলতে পারব।

আজকার এই শুভ অনুষ্ঠানে আমাদের অতীত ও ভবিষ্যতের কথা আপনাআপনি মনে আসছে। এই ভূমিতেই সেই আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল যার দ্বারা আমাদের ধর্ম ও কৃষ্টি সংস্কারের ভিতর দিয়ে পুনর্জীবন লাভ করেছে। এই আন্দোলন প্রাদেশিকতার গণ্ডী মানেনি —এমনকি জাতীয়তার গণ্ডীও অতিক্রম করেছিল। রামমোহন ও রামকৃষ্ণ যে বাণী দিয়েছিলেন—তা কি বিশ্বমানবের জন্য নয়? তাঁদের ভিতর দিয়ে কি সুপ্তোত্থিত, নবজাগ্রত ভারত আত্মপ্রকাশ লাভ করেনি? আমরা জানি যে আমরা তাঁদেরই কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী।

নবজাগরণের ফলে, প্রবুদ্ধ ভারতের মুক্ত আত্মা যখন 'বহু'র মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দিতে চাইলেন তখন দেখলেন যে একদিকে রাষ্ট্র এবং অপরদিকে সমাজ তাঁকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে। তারপর আরম্ভ হল—রাষ্ট্রবিপ্লব এবং সমাজবিপ্লব। সেই বিপ্লবের সূচনাও এই ভূমিতে —যেখানে একদিন ধর্মবিপ্লবের ও কৃষ্টিবিপ্লবের আবির্ভাব হয়েছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের (বা নিখিল ভারত জাতীয় মহাসভার) জন্ম হয়। কুড়ি বৎসর নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পর আমাদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে এক নূতন যুগ আরম্ভ হয়—সেটা স্বাবলম্বনের যুগ, স্বদেশীর ও বিদেশীবর্জনের যুগ। তার পরের একদিকে বঙ্গভঙ্গ এবং অপরদিকে আমলাতন্ত্রের দমননীতি এমন একটা বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করলে যে দেশের তরুণ সম্প্রদায় উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে, আত্মসংযম হারিয়ে ইতিহাসের চিরপরিচিত পন্থা—সশস্ত্র বিদ্রোহের পন্থা—অবলম্বন করলে। দশ বৎসর অতীত হতে না হতে আমরা পুনরায় আমাদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায়ে প্রবেশ করলাম—"অহিংস অসহযোগ ও সত্যাগ্রহের" অধ্যায়।

আজ ভারতীয় রাষ্ট্রীয় গগন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। আমরাও ইতিহাসের এমন এক চৌমাথায় গিয়ে পড়েছি যেখান থেকে বিভিন্ন দিকে পথ বেরিয়ে গেছে। এখন আমাদের সম্মুখে সমস্যা এই—যে নিয়মতান্ত্রিকতার পথ আমরা ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে বর্জন করেছিলাম, পুনরায় কি সেই পথে ফিরে যাব? অথবা আমরা কি গণআন্দোলনের পথে অগ্রসর হয়ে গণসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হব? এখানে তর্কবিতর্ক আমি শুরু করব না—আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে, নবজাগ্রত ভারতীয় মহাজাতি স্বাবলম্বন, গণআন্দোলন এবং গণসংগ্রামের পন্থা কিছুতেই পরিত্যাগ করবে না। এই পন্থার দ্বারাই তারা অনেকটা সাফল্যলাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও বেশী সাফল্যলাভ করবে বলে বিশ্বাস করি। সর্বোপরি, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের সহিত একটা তুচ্ছ আপস করে তারা কিছুতেই তাদের জন্মগত অধিকার—স্বাধীনতা —হেলায় ছেড়ে দেবে না।

যে স্বপ্ন দেখে আমরা বিভোর হয়েছি তা শুধু স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নয়। আমরা চাই ন্যায় ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক স্বাধীন রাষ্ট্র—আমরা চাই এক নূতন সমাজ, ও এক নূতন রাষ্ট্র, যার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠবে মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতম আদর্শগুলি। গুরুদেব! আপনি বিশ্বমানবের শাশ্বত কণ্ঠে আমাদের সুপ্তোত্থিত জাতির আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছেন। আপনি চিরকাল মৃত্যুঞ্জয়ী যৌবনশক্তির বাণী শুনিয়ে আসছেন। আপনি শুধু কাব্যের বা শিল্পকলার রচয়িতা নন। আপনার জীবনে কাব্য এবং শিল্পকলা রূপ পরিগ্রহ করেছে। আপনি শুধু ভারতের কবি নন—আপনি বিশ্বকবি। আমাদের স্বপ্ন মূর্ত হতে চলেছে দেখে যে সমস্ত কথা, যে সমস্ত চিন্তা, যে সমস্ত ভাব আজ আমাদের অন্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে—তা আপনি যেমন উপলব্ধি করবেন, তেমন আর কে করবে? যে শুভ অনুষ্ঠানের জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি তার হোতা আপনি ব্যতীত আর কে হতে পারবে? গুরুদেব! আজকার এই জাতীয় যজ্ঞে আমরা আপনাকে পৌরোহিত্যের পদে বরণ করে ধন্য হচ্ছি। আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা 'মহাজাতি সদনের' ভিত্তি স্থাপনা করুন। যে সমস্ত কল্যাণ প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্ত জীবনের আস্বাদ পাবে এবং ব্যক্তির ও জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হবে—এই গৃহ তারই জীবন কেন্দ্র হয়ে 'মহাজাতি সদন' নাম সার্থক করে তুলুক—এই আশীর্বাদ আপনি করুন। এবং আশীর্বাদ করুন যেন আমরা অবিরাম গতিতে আমাদের সংগ্রাম পথে অগ্রসর হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করি এবং আমাদের মহাজাতির সাধনাকে সকল রকমে সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত করে তুলি।

আমাদের সমালোচকরা

১৯শে আগস্ট ১৯৩৯-এ 'ফরওয়ার্ড ব্লকে' স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

ন্যায্য সমালোচনা করার অধিকার যেহেতু আমরা মানি এবং বিশ্বাস করি সুস্থ সমালোচনা বিকাশ উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য, সেই জন্যে ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্মলগ্ন থেকে তার উদ্দেশ্যে যে সব সমালোচনা বর্ষিত হচ্ছে আমরা তা সাদরে গ্রহণ করেছি। আমরা সেগুলি সযত্নে পরীক্ষা করে দেখেছি এবং তাদের থেকে লাভবান হবার প্রয়াস করছি। আমাদের সাধ্যমত সেগুলির জবাব দেবারও চেষ্টা করেছি। আমরা দেখে খুশী হয়েছি যে, তার ফলে, আমাদের যাঁরা সমালোচক ছিলেন তাঁদের কতকাংশ এখন আমাদের সমর্থক হয়েছেন।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে এক শ্রেণীর সমালোচক আছেন যাঁরা কিছুতেই খুশী হবেন না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং তাঁরা তাঁদের অভিযোগগুলি সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের অধিকাংশই দক্ষিণপন্থী, তা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে এমন কিছু লোককেও পাওয়া যাবে যাঁদের সাধারণতঃ বামপন্থী বলে মনে করা হয়। এই ধরনের অবুঝ দক্ষিণপন্থী সমালোচকরা কোন উদ্দেশ্যে চালিত হচ্ছেন তা কল্পনা করা কষ্টকর নয় কিন্তু যাঁরা নিজেদের বামপন্থী বলে পরিচয় দেন অথচ ফরওয়ার্ড ব্লককে আক্রমণ করে অদ্ভুত ধরনের তৃপ্তিলাভ করেন বলে মনে হয়, তাঁদের বোঝা শক্ত।

প্রথম দিকে বলা হচ্ছিল, ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্মের মূলে আছে ব্যক্তিগত কারণ এবং দলাদলি—ব্লকের যথার্থ কার্যক্রম নেই, আসলে ব্লক ব্লক-গঠনের বিরোধী—গান্ধীবাদী নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করেও ফরওয়ার্ড ব্লক যখন কংগ্রেসের ভিতরে নতুন একটা সংগঠন গড়তে চাইছে, তখন তার উদ্দেশ্য অকারণ একটা ভাঙন সৃষ্টি করা, ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করার একমাত্র উদ্দেশ্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অথবা তার ভিতরকার কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের সঙ্গে লড়াই চালানো। ২২শে

জুন বোম্বাইয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের নিখিল ভারত কন্‌ফারেন্স অনুষ্ঠিত হবার পর থেকে এই ধরনের সমালোচনা কার্যত বন্ধ হয়েছে, যেহেতু তাতে ব্লকের মূল নীতি, পদ্ধতি ও কার্যক্রম নিঃসন্দিগ্ধভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু অন্য আরেক ধরনের সমালোচনা, অনেক দিক থেকে সঙ্গত জবাব নিয়মিত দেওয়া সত্ত্বেও, চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এই সব সমালোচনাকে দুভাগে ভাগ করা যায়। এক ধরনের সমালোচনার মূল বক্তব্য, ফরয়ার্ড ব্লক সুবিধাবাদী ও ফ্যাসিস্টদের তার আওতার মধ্যে টেনে আনছে। ফরওয়ার্ড ব্লককে সুবিধাবাদের দায়ে দায়ী করা বাস্তবিক হাস্যকর। ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্যকে দুদিকে লড়াই করতে হচ্ছে—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এবং কংগ্রেসী আমলাতন্ত্র—এবং দুদিক থেকেই নিগৃহীত হতে হচ্ছে। ব্যক্তিগত দিক থেকে দেখতে গেলে, কিছুই সে লাভ করছে না, অথচ খোয়াচ্ছে সব কিছুই। সুবিধাবাদের পথ, যে-পথে সবচেয়ে কম বাধা সেই পথ কিন্তু সোজা নিয়ে যায় দক্ষিণপন্থীদের শিবিরে। সেখানে রয়েছে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা। যতদিন কংগ্রেস সত্যাগ্রহ (অথবা আইন-অমান্য) পরিহার করে সংসদীয় রাজনীতির পথ গ্রহণ করেনি ততদিন খোলাখুলিভাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করে এসেছে। এমন অনেক লোককে সেখানে দেখা যাবে যারা কস্মিনকালে ইংরেজের জেলখানার ধারেকাছে যায় নি। সেখানে কোটিপতিরা দেশপ্রেমিক সেজে বিচরণ করছে দেখা যাবে, যেহেতু তারা নিজেদের গান্ধীবাদী বলার অধিকার পেয়েছে। দেখা যাবে এমন কংগ্রেসকর্মীদের, যারা কংগ্রেসী মন্ত্রীদের অনুগ্রহে (যেমন মধ্যপ্রদেশ) স্থানীয় সংস্থাগুলিতে মনোনয়ন গ্রহণ করেছে, যদিও স্থানীয় সংস্থাগুলির জন্য সরকারী মনোনয়ন কংগ্রেস সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। দেখা যাবে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা (যেমন বোম্বাইয়ে) সুবিধাবাদীদের বেশী করে দলে ভিড়াবার জন্যে ঢালাও ভাবে জে. পি. পদ দিয়ে চলেছে, যদিও বহু আগেই কংগ্রেসকর্মীদের উপর কংগ্রেসের নির্দেশ আছে তারা যেন জে. পি. বা অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ না গ্রহণ করে। যে সব জমিদার (জমির মালিক), শিল্পপতি ও কোটি-

পতিরা এখন কংগ্রেসী মন্ত্রীদের আসেপাশে ঘুরঘুর করছে তারা যদি সুবিধাবাদী না হয়, তবে সুবিধাবাদী কে ? এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজের ব্রিটিশ মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলি যারা রাতারাতি মন্ত্রীদের মুখপত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারাও কি নির্লজ্জ সুবিধাবাদী নয় ? দক্ষিণপন্থীরা এবং তাদের মিত্রবন্ধুরাই যে যথার্থ সুবিধাবাদী এতে কোনই সন্দেহ নেই এবং একথা জোরের সঙ্গে বলা যেতে পারে ।

এবং আমাদের তথাকথিত বামপন্থীদের প্রসঙ্গেও বলা যেতে পারে, মুখে বামপন্থী এবং কাজে দক্ষিণপন্থী হওয়া—কথার তুবড়িতে গান্ধীবাদকে উচ্ছেদ করার প্রয়াস করা, পরমুহূর্তে দক্ষিণপন্থীর ধমক খেয়ে নতিস্বীকার করা—ওয়ার্কিং কমিটিকে বয়কট করা অথচ তার আলাপ-আলোচনায় যোগদান করা—সম্ভবত এইগুলিই সুবিধাবাদের উৎকৃষ্ট নিদর্শন ।

এবার ফ্যাসিস্ট সম্পর্কে। ভারতীয় প্রসঙ্গে 'ফ্যাসিস্ট' শব্দের ঠিক অর্থ কি বোঝা মুশকিল, অবশ্য শব্দটিকে যদি বৈজ্ঞানিক বা টেকনিকাল অর্থে ব্যবহার করা হয়। তা সত্ত্বেও 'ফ্যাসিস্ট' অর্থে যদি যারা নিজেদের হিটলার, মহা-হিটলার বা উঠতি-হিটলার বলে জাহির করে তাদের বোঝায়, তাহলে বলা যেতে পারে মানবজাতির এই নিদর্শনগুলির হদিস দক্ষিণপন্থীদের শিবিরে মিলতে পারে।

অপর ধরনের সমালোচনার বক্তব্য এই যে, ফরওয়ার্ড ব্লক দেশের কংগ্রেসবিরোধীদের সঙ্গে জোট পাকাচ্ছে এবং শীঘ্রই কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে তাদের সহায়তায় প্রতিদ্বন্দ্বী এক সংগঠন গড়ে তুলবে। যারা এইরকম পরোক্ষভাবে কংগ্রেসবিরোধী সংগঠন বলে ফরওয়ার্ড ব্লককে হেয় করতে চায় তারা ভালোমতই জানে কংগ্রেসের সদস্য না হলে কেউ ব্লকের সদস্য হতে পারে না। এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্য হতে গেলে কংগ্রেসসদস্য হওয়া ছাড়াও বৈপ্লবিক নীতিতে বিশ্বাসী হওয়া চাই। এ ছাড়া, নানা জায়গায় আমি বারেবারে বলেছি যে, কোন অবস্থাতেই আমরা কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে আসব না। আমাদের কাজ কংগ্রেসকে পরিবর্তিত করা—কংগ্রেসকে পরিত্যাগ করা নয়।

আমাদের যাঁরা সমালোচক তাঁরা এ কথা আমাদের মতই জানেন, তবুও তাঁরা এই আশায় তাঁদের অভিযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন যে, বিস্তর কাদা ছেটালে শেষ পর্যন্ত তার কিছুটা গায়ে লাগতেও পারে।

হয়তো আমাদের সমালোচকরা ঈর্ষান্বিত, তার কারণ তাঁদের দক্ষিণপন্থী বন্ধুরা যখন সংখ্যালঘুদের এবং ভারতীয় জনগণের অন্যান্য অংশকে তাঁদের দলে টেনে আনতে পারছে না, তখন ফরওয়ার্ড ব্লক বহুল পরিমাণে তাদের সহানুভূতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। দেশবাসীর এই সব অংশ, যারা কংগ্রেসের বাইরে রয়েছে, তাদের আস্থা কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের থেকে বামপন্থীদের উপর তুলনায় বেশী। এবং যদি তারা নিকট ভবিষ্যতে কংগ্রেসে যোগদান করে, তাহলে সেই কংগ্রেস হবে বামপন্থীদের আয়ত্তাধীন কংগ্রেস। এর কারণ হয়তো এই যে, বামপন্থীরা গণতন্ত্রের জন্যে লড়াই করে চলেছে, তারা গণআন্দোলন এবং জনহিতকর কার্যক্রমের সপক্ষে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে তাদের আপসহীন বিরোধিতা তারা ঘোষণা করে জানিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এতে হালে পানি পাওয়া যাবে না। ভারতের জনসাধারণকেও আজ আর এইভাবে ধোঁকা দেওয়া চলে না। তাদের যতটা সরল বলে মনে করা হচ্ছে তারা ততটা সরল নেই। ফলে, এইসব সমালোচক থাকা সত্ত্বেও, ফরওয়ার্ড ব্লক এগিয়ে চলেছে এবং তাদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকবেও। দক্ষিণপন্থীদের জোট ও নিয়মতান্ত্রিকতার একমাত্র বিকল্প ফরওয়ার্ড ব্লকের কার্যক্রম। ব্লকের তিনদফা কর্তব্য এই—বামসংহতি, কংগ্রেসের মধ্যে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের আমাদের মতে টেনে আনা এবং কংগ্রেসের সম্মিলিত শক্তিতে জাতীয় সংগ্রাম শুরু করা। ফরওয়ার্ড ব্লক যা স্থির করেছে তার থেকে আরও ভালো কিছু যদি আপনারা প্রস্তাব করতে পারেন, নিশ্চয় করবেন। আমরা মনেপ্রাণে উন্মুক্ত এবং বোঝবার জন্যে আমরা প্রস্তুত। তবে ছিদ্রান্বেষী নিন্দুকের মত সবকিছুকে নস্যাৎ করেও কোন লাভ নেই। তার পরিণাম ব্যর্থতা ও সর্বনাশ।

এই ক্ষণে যা প্রয়োজন

২৬শে আগস্ট, ১৯৩৯এর 'ফরওয়ার্ড ব্লকে' স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ।

যখন আমি লিখছি ইওরোপে তখন কী ঘটে চলেছে কে জানে? খবর পাওয়া যাচ্ছে, হের হিটলার পোল্যাণ্ডকে চরমপত্র দিয়েছে। খুবই সম্ভব—হয়তো ঘটেছেও তাই। যদি তাই ঘটে থাকে পোল্যাণ্ডের প্রতিক্রিয়া কি হবে? রুশো-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বাধীনতাপ্রিয় পোলরা কি তাদের পবিত্র ভূমির জন্যে লড়াই করবে? অথবা তারা চেকদের পন্থা অনুসরণ করবে? মার্শাল পিল্‌সুডস্কি যদি জীবিত থাকতেন তাহলে অনাক্রমণ চুক্তি ও জার্মান চরমপত্র সত্ত্বেও নিশ্চিন্তে যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী করা চলত। কিন্তু পোল্যাণ্ডের অগ্রণী মার্শাল আর নেই, তাঁর অবর্তমানে তাঁর দেশবাসী কী করবে, জানা নেই। পোলরা সত্যি যতটা আবেগপ্রবণ ততখানি যদি না হত, তাহলে জার্মানীর কাছে আত্মসমর্পণের মূল্যে পাওয়া শান্তির উপর ভরসা করা যেত। কিন্তু আজ নিশ্চিত কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়, যদিও গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্সের কূটনৈতিক চাপে পড়ে পোল্যাণ্ড শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে, সৎসাহসের অনেকখানিই সুবিবেচনা।

জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে যদি যুদ্ধ বাধে, তাহলে একথা ঠিক ভারতীয় জনগণের সহানুভূতি থাকবে পোলদের পক্ষে। জার্মানীর পক্ষে আমাদের বোঝাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হবে যে, পোলিশ করিডরে অথবা যে এলাকা নিয়ে যুদ্ধ হতে পারে সেই এলাকায় এখন পোলদের থেকে জার্মানদেরই বসবাস বেশী। কিন্তু ডানজিগের প্রশ্নে, জার্মানদের দাবি নিশ্চয়ই অখণ্ডনীয় এবং যদি কেবলমাত্র ডানজিগ প্রশ্ন নিয়ে যুদ্ধ বাধে বিশ্ব জনমতের দরবারে জার্মানীর আরজি হবে অনস্বীকার্য।

এই আন্তর্জাতিক সংঘর্ষে আমাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া যাই হোক না কেন, জাতি হিসাবে আমাদের করণীয় কী? আমরা কি বসে বসে

ভাবব আর বচসা করে চলব যখন যুদ্ধের দাবানল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে? যদি রাশিয়ান ও জার্মানরা, যারা কাল পর্যন্ত পরস্পরের চরম শত্রু ছিল, বিশ্বসঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে তাদের বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে পারে, তাহলে কংগ্রেসের দুই পক্ষ তাদের বিরোধ ভুলে গিয়ে পূর্ণ স্বরাজের দিকে জাতিকে চালিত করার জন্যে কেন হাত মেলাতে পারবে না? নির্দলীয় 'জাতীয়' কেবিনেট কি একান্তভাবে ইওরোপীয় ঘটনাই হয়ে থাকবে? এই রকম জরুরী অবস্থায় কংগ্রেসকর্মীরা সমমতাবলম্বী কেবিনেটের ধারণা পরিহার করে, তার জায়গায় মিশ্র কেবিনেট গঠন করার শিক্ষা কি নেবে না? এর জবাব দিতে পারেন কেবলমাত্র কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা এবং তাঁদের উপদেষ্টা মহাত্মা গান্ধী। বামপন্থীরা বরাবরই মিশ্র কেবিনেট গঠনের নীতির সপক্ষে, কিন্তু এতদিন পর্যন্ত তাদের অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সবার পক্ষে এই কথা খেয়াল রাখা ভালো যে, কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং তাদের নেতারা যদি অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে এই সংকট মুহূর্তে জাতিকে যথোচিত নেতৃত্ব দিতে না পারেন, তাহলে যে ধারণা এখন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, অর্থাৎ কংগ্রেসের দক্ষিণ-পন্থীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের চেষ্টা করছে, সেই ধারণাকেই তাঁরা সুদৃঢ় করবেন। গ্রেটব্রিটেন এবং তার সমর্থকরা এখন পোলদের জন্যে আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলছে এবং যদি সে যুদ্ধে যায়, মুখে "আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার" বুলি নিয়েই সে যুদ্ধে যাবে। আমাদের ব্রিটিশ শাসকদের কি এখন মনে করিয়ে দেওয়ার সময় আসেনি যে, সুয়েজখালের পুবে একটা ভূখণ্ড রয়েছে, যেখানকার সুপ্রাচীন ও সংস্কৃতিবান এক জাতির অধিবাসীরা স্বাধীনতার জন্মস্বত্ব থেকে বঞ্চিত হয়ে ব্রিটিশ শাসনের চাপে নিষ্পেষিত হচ্ছে? এবং ব্রিটিশ জনসাধারণ ও তাদের সরকারকে কি একথা বলার সময় হয়নি যে, নিজেদের ঘরে যারা গোলাম তারা অপরের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করতে পারে না?

যতদূর সম্ভব সোজা কথায় ব্রিটেনকে জানিয়ে দেওয়ার সময় এসেছে যে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে লোকবল, অর্থ ও সামর্থ্য দিয়ে ভারত রসদ যোগাবে না। যুদ্ধ প্রতিরোধের জন্য কংগ্রেস প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যদিও সেই প্রতিরোধের চরিত্র আবশ্যিকভাবে হবে অহিংস। অতএব ওয়ার্কিং কমিটি সম্প্রতি যা বলেছে, যেমন, যুদ্ধের কোন জরুরী অবস্থায় আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করব না, এইটুকু বলাই যথেষ্ট নয়। আমাদের আরও অগ্রসর হতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যোগদানে বাধ্য করানোর চেষ্টাকে অহিংসভাবে প্রতিরোধ করার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করতে হবে।

ওয়ার্কিং কমিটি কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্যদের কেন্দ্রীয় এসেম্ব্লি ও কাউন্সিল অফ স্টেটের পরবর্তী অধিবেশনে যোগদান না করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছে। কিছু না করার থেকে নিশ্চয় এটুকুও ভালো—তবে প্রয়োজন অনুপাতে এ ব্যবস্থা অত্যন্ত সামান্য। ভারত সরকারের যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্যদের এখনই পদত্যাগ করা উচিত এবং এই প্রশ্নে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে নতুন নির্দেশের জন্য আবেদন করা উচিত। এর ফলে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পাবে এবং এমনকি রাস্তার লোকদের কাছেও যুদ্ধে ভারতের যোগদানের প্রশ্ন জীবন্ত প্রসঙ্গ হয়ে দাঁড়াবে।

যদি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে যুদ্ধ না বাধে এবং বর্তমান বিপদ কেটে যায়, আমরা যেন নির্বোধের মত না ভাবি যে সংকটের চরম মীমাংসা হয়ে গেছে। রুমানিয়া নিয়ে অথবা উপনিবেশের উপর জার্মানদের দাবি নিয়ে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা আবার বেড়ে উঠতে পারে। তাছাড়া, হের হিটলার যদি যুদ্ধ চায়, লাগসই সুযোগের তার অভাব হবে না। অতএব ভারতবর্ষে আমরা যেন খেয়াল রাখি যে বর্তমান আন্তর্জাতিক উত্তেজনা অব্যাহত থাকবে এবং সেই অনুযায়ী আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।৹

আজকের সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে আমি মহাত্মা গান্ধী ও ওয়ার্কিং কমিটির কাছে একটি প্রস্তাব দিয়েছি। আমি তাতে বলেছি,

তাঁরা যদি দৃঢ় নীতি গ্রহণ করেন এবং ভারতের জাতীয় দাবির প্রশ্নটি ব্রিটিশ সরকারের কাছে তোলেন তাহলে আমরা আমাদের সব বিভেদ ভুলে গিয়ে অনুগত সৈনিক হিসেবে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেব। এবং প্রয়োজন দেখা দিলে, যে সকল পদ আমরা বামপন্থীরা এখন দখল করে আছি সানন্দে তা ত্যাগ করব। আমরা সাগ্রহে তাঁদের জবাবের জন্য প্রতীক্ষা করব।

ইত্যবসরে ব্রিটিশ সরকারকে আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই, যদি যুদ্ধ বাধে তাহলে আমাদের নীতি কী হবে একমাত্র স্বাধীন ভারতই তা স্থির করতে পারে। যুদ্ধ হোক বা নাই হোক স্বাধীনতা আমাদের দাবি, এবং সে দাবি আমরা আদায় করবই।

বন্ধুর কণ্ঠস্বর

২রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯এর 'ফরওয়ার্ড ব্লকে' প্রকাশিত স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ।

দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া—দি স্টেট্‌স্‌ম্যান বলে সুবিদিত—কিছুদিন যাবৎ বৈদেশিক নীতি এবং বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর অনেক চমৎকার প্রবন্ধ লিখে চলেছেন। এই সংকটকালে ভারতের জনসাধারণের কি রকম ব্যবহার করা উচিত সে বিষয়েও তাঁদের মূল্যবান উপদেশ দিচ্ছেন। লেখকের মত এতজন নগণ্য লোকের উপর 'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' যে বিশেষ দৃষ্টি ও গুরুত্ব দান করেছেন তার জন্য লেখক 'ফ্রেণ্ড'এর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।

এ এক আশ্চর্য জগতে আমরা বাস করি এবং এ জগৎ ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এমন এক সময় ছিল যখন মস্কো ছিল আমাদের 'ফ্রেণ্ড'এর কাছে জুজুর মত! এই কাহিনী প্রচার করা হয়েছিল যে মস্কোর টাকা ভারতের রাজনৈতিক বিদ্রোহীদের নিয়মিত হাতফেরতা হয়ে চলেছে। হের হিটলার ক্ষমতায় আসীন হওয়ার পর থেকে স্টালিন এবং ট্রটস্কির জায়গায় সম্প্রতি বার্লিনের ভূত—এবং বার্লিনের সঙ্গে, রোম এবং টোকিওর ভূত—আমাদের 'ফ্রেণ্ড'এর কাঁধে ভর করেছে এবং বহু বিনিদ্র রজনীর কারণ হয়েছে। একই কালে মস্কো ভালো ছেলে হয়ে গেছে এবং যে টাকা ছিল মস্কোয় তা এখন বার্লিন, রোম এবং টোকিওয় চালান হয়েছে। সম্প্রতি আমাদের 'ফ্রেণ্ড' কল্পনায় দেখতে পাচ্ছেন, বার্লিন-রোম-টোকিও ভারতে এখন তাল তাল সোনা ঢালছে এবং তার ফলে এ দেশের নিরীহ ও ভালোমানুষ লোকগুলির মন বিষিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু 'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' এখন কী ভাববেন বা বলবেন তাই মনে করে অবাক লাগছে। রুশো-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির পর নীচ বার্লিনের সংস্পর্শে আসার দরুন মস্কোর উপর নেকনজর কি থাকবে না, না, মস্কো তবুও ভালো ছেলে হয়েই থাকবে?

'ফ্রেণ্ড' একটি আশ্চর্য আবিষ্কার করে ফেলেছেন—আবিষ্কার না বলে উদ্ভাবন বলা কি উচিত?—তা এই, যে মুহূর্তে যুদ্ধ বাধবে, ভারতের বিদ্রোহীরা হের হিটলারের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তার এবং রোম-টোকিও-বার্লিন চক্রের পিছনে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়বে। ব্রিটিশ জনসাধারণের কল্পনার খ্যাতি বিশেষ একটা নেই, কিন্তু আমাদের 'ফ্রেণ্ড' স্পষ্টতই একটি ব্যতিক্রম—এবং ব্যতিক্রম থাকে বলেই নিয়ম প্রমাণিত হয়। তাঁর ধারণা বাস্তবিকই চমকপ্রদ এবং তারিফ করার মত।

যেহেতু বিদ্রোহী ভারতবাসীরা ইওরোপে যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে 'হাইল হিটলার' বলে চিৎকার করতে শুরু করে দেবে, 'ফ্রেণ্ড' তাদের জন্যে মৃত্যুদণ্ড সুপারিশ করেছেন। মৃত্যুদণ্ড যদি না দিতে পারা যায় তাহলে তাদের জেলখানায় নিরাপদে কয়েদজাত করে রাখা উচিত হবে। তাহলে ইওরোপ এবং ভারত সব দিক থেকে রক্ষা পাবে। এইরকম একজন 'ফ্রেণ্ড'এর কাছে ভারত নিশ্চয় কৃতজ্ঞ থাকবে।

যদিও 'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র এইসব তর্জনগর্জন আমাদের যথেষ্ট আমোদের খোরাক জুগিয়েছে, তা সত্ত্বেও আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে এ সবের গভীরে একটা দুরভিসন্ধি আছে। এই সংবাদপত্রটি প্রায়শই ভারত সরকারের মুখপাত্র ও সমর্থকের ভূমিকা-গ্রহণ করে থাকে এবং তার ফলে গ্রেটব্রিটেনের সরকারী মনোভাব কী তার কিছুটা আভাস আমরা পেয়ে থাকি। তাই 'ফ্রেণ্ড' যা বলেছেন তা কেবলমাত্র একটা মজার ব্যাপার বলে হালকাভাবে উড়িয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

সম্প্রতি এক প্রবন্ধে 'ফ্রেণ্ড' আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যুদ্ধ বাধার অর্থ ফেডারেশন স্থগিত রাখা বোঝাবে না। সংবাদপত্রটি অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে নিয়মিত সমর্থন জানিয়ে আসছে, কারণ তাই নাকি ভারতীয় সমস্যার সমাধান ঘটাবে। ভারতীয় জনসাধারণ নিজেরা তাদের নিজস্ব সমস্যার এই সমাধান সম্পর্কে কী চিন্তা করে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন বলে বিবেচিত হয়নি। যুদ্ধ

বাধার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে আপনিই স্থগিত রাখা সঙ্গত হবে, কোন কোন সরকারী মহলে এই ধরনের প্রস্তাব করা হচ্ছে শুনে সম্ভবত আমাদের 'ফ্রেণ্ড' দুঃখিত এবং 'ফ্রেণ্ড'এর কাছে ব্যাপারটা একটা দুর্ঘটনা থেকে কোন অংশে কম বলে মনে হচ্ছে না। অতএব জনসাধারণকে বোঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে যে, যুদ্ধ বরঞ্চ ফেডারেশনের পত্তন ত্বরান্বিত করবে। যে কোন লোক কিন্তু একটা কথা ভেবে অবাক হবে, সারা দেশ যখন বামপন্থীতে ছেয়ে গেছে তখন ফেডারেশন কি করে প্রবর্তন করা সম্ভব। এই বিপত্তি 'ফ্রেণ্ড' আগেই তাঁর প্রস্তাব মারফত সমাধান করে দিয়েছেন—দুষ্কৃতকারীদের মুখ বন্ধ করে দেবার পক্ষে মৃত্যুদণ্ড বা কারাবাসই যথেষ্ট এবং এই উপায়েই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে সহজে আমদানী করার পথ প্রশস্ত হবে।

যদি উল্লিখিত প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকারের গ্রহণযোগ্য হয়, অথবা যদি তা সরকারী চিন্তার মাপকাঠি হয়, তাহলে যুদ্ধ বাধলে ব্রিটিশ সরকার সব বামপন্থীদের চালান দেবে। কথাটা ঘুরিয়ে বলা হচ্ছে না, তা বর্ণে বর্ণে সত্য হবে। দরিয়া যখন একেবারে সাফ হয়ে যাবে, ফেডারেশন তরণী তখন তরতর করে তীরে এসে ভিড়বে এবং মন্ত্রীরা তাকে সংবর্ধনা জানাবে দামামা বাজিয়ে পতাকা উড়িয়ে—এ পতাকা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতাকা, যা শান্তি, গণতন্ত্র ও প্রগতির প্রতীক।

কিন্তু এই পরিকল্পনায় মৌলিক নতুনত্ব কিছুই নেই। সেকেলে সেই দমন এবং আপস প্রণালীর আরেকটি দৃষ্টান্তমাত্র, শুধু এইটুকু তফাত যে এবারে যে প্রণালী গ্রহণ করা হবে তা আগেকার থেকে অনেক বেশী জবরদস্ত।

এখন এই চিকিৎসা প্রণালী সম্বন্ধে আমাদের কী বক্তব্য থাকতে পারে ? এই বিষয়ে রোগীর নিশ্চয় বলার কিছু থাকবে। এই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের 'ফ্রেণ্ড'কে বলতেই পারি, অতীতে যখন এই অনবদ্য প্রণালী প্রতিবারই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে, এবারে ভারতীয় জনগণের

কাছে তা সাদরে গৃহীত হবে বলে খুব একটা আশা আছে কি? আজ তারা একেবারে ঠিক মুখবোজা গরুর পাল নয় এবং অপরে তাদের জন্যে যে কাঠামো তৈরি করেছে তাতে তারা নিজেদের খাপ খাওয়াতে নাও রাজী হতে পারে। তাছাড়া জনসাধারণের মেজাজটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জনসাধারণের এক অংশের উপর দমন চালালে বাকি অংশ বা অন্য কোন অংশ যে আতঙ্কিত হবেই এমন কোন কথা নেই। এর ফলে আসলে হয়তো উল্টো উৎপত্তি হতে পারে, তারা দুর্দান্ত হয়ে উঠতে পারে। সেই অবস্থাবিপাকে পতাকা উড়িয়ে দামামা বাজিয়ে কে ফেডারেশনকে সংবর্ধনা জানাবে? প্রাথমিক দমন চিকিৎসার ফলে, এমনকি ফেডারেশন-ভক্তদের পক্ষেও জনসাধারণের মনে বিদ্রোহের মনোভাব থাকার দরুন, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে সংশোধনসহ বা বিনা-সংশোধনে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে।

না 'ফ্রেণ্ড', সমাধানটা তত সহজ নয় যত সহজ তুমি এখন মনে করছ, অথবা লর্ড উইলিংডন এককালে মনে করেছিলেন। বামপন্থীদের যতটা নগণ্য শক্তি বলে গণ্য করতে পারলে তোমরা খুশী হও, দেশে তারা ততটা নগণ্য শক্তি নয়।

বামপন্থীদের দমন করা সম্ভবপর হতে পারে, কিন্তু তার ফলে তোমার মতলবও ভেস্তে যেতে পারে। তোমার মতলব জানতে দিয়েছ বলে এবং আমাদের আগে থেকে সাবধান করেছ বলে তোমাকে ধন্যবাদ। তোমাকে আমরা এইটুকু ভরসা দিতে পারি, আমরা আমাদের দিক দিয়ে সবরকম দুর্বিপাকের জন্য প্রস্তুত আছি এবং 'ফ্রেণ্ড'এর সাহায্য পাই বা না পাই আমরা যে আমাদের স্বাধীনতা নেবই, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

পথের সন্ধানে

২৮শে অক্টোবর ১৯৩৯এর 'ফরওয়ার্ড ব্লকে' স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ।

প্রতিটি জাতির জীবনে এমন সময় আসে যখন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সেই সিদ্ধান্ত জাতির ভবিষ্যৎকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে অথবা সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিতে পারে। এই সব সময়ে প্রায়ই দেখা যায়, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে কয়েকজনকে, কখনও বা এক জনকেও। ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্ব যদি ভিন্ন খাতে চলত তাহলে রাশিয়ার ভাগ্যে কী ঘটত, আজ তা অনুমান বা কল্পনার বিষয়।

জাতির ভবিষ্যৎ যাদের হাতের মুঠোর মধ্যে কীভাবে তারা এই প্রচণ্ড দায়িত্ব পালন করবে; স্বভাবত তাদের ভাবতে হবে এবং গভীরভাবে ভাবতে হবে। সামনে পিছনে তাদের তাকিয়ে দেখতে হবে—দেখা দরকার সম্ভাব্য বিকল্প বিবেচনা করার জন্য এবং পরিণাম কী হতে পারে তা বুঝে নেবার জন্যে। তবুও সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হতে পারে। সঙ্কটের মুখোমুখি হয়ে সব নেতা বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। যদিও সেই সামর্থ্য কারও থেকে থাকে, একটা নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসতে হলে যে-সকল তথ্য ও আনুষঙ্গিক বিষয় জানা প্রয়োজন মানুষের বুদ্ধি তা নাও যোগাতে পারে।

আমরা সময় সময় শুনি বুদ্ধিতে যেখানে কুলোয় না সজ্ঞান বা প্রজ্ঞা সেখানে সফল হয়। ইতিহাসের যাঁরা মহানায়ক তাঁরা দুর্ভেদ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পথ চিনে এগিয়ে গেছেন এবং সজ্ঞান বা প্রজ্ঞায় ভর করে তাঁরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পরবর্তী ঘটনাবলী তার সার্থকতা প্রমাণ করেছে।

এই উক্তির মধ্যে অনেকখানি সত্য আছে। আমাদের সীমিত অভিজ্ঞতার মধ্যেই আমরা এমন অনেক নেতা দেখেছি যাঁরা নির্ভুল রাজনৈতিক সজ্ঞানে চালিত হয়ে সংকট মুহূর্তে আশ্চর্য সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করেছেন এবং পরবর্তী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয়েছে তাঁরা ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। এখন, ধরাছোঁয়ার বাইরে এই সজ্ঞান বা প্রজ্ঞা কী? এ কি রহস্যময় কিছু—এমন কিছু যা আমাদের বোধের অতীত—যা সহজাত? কিছু পরিমাণে তা সহজাত ঠিকই। সার্থক শিল্পী বা সঙ্গীতজ্ঞের এমন একটা সুকুমার স্পর্শবোধ এবং এমন সূক্ষ্ম অনুভূতি থাকে যা তার শিক্ষা বা চর্চা থেকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না। যদি শুরু থেকেই তার মধ্যে সহজাত একটা শৈল্পিক প্রবণতা না থাকে সে কখনই শিল্পনৈপুণ্যের শীর্ষে উঠতে পারে না। রাজনৈতিক সংগ্রামীর ক্ষেত্রেও একই কথা। প্রথম থেকেই তার মধ্যে একটা রাজনৈতিক বোধ থাকা চাই।

কিন্তু চর্চা দ্বারা সজ্ঞানকে শানিত করা দরকার এবং সেই চর্চাও হওয়া দরকার নিরবচ্ছিন্ন। কিছু ক্ষেত্রে সজ্ঞান বা প্রজ্ঞা যদি নির্ভুল পথের নির্দেশ দিয়ে থাকে, তাই থেকে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই যে সর্বদাই তা নির্ভুল হবে। এখন, রাজনৈতিক সজ্ঞানকে যতটা সম্ভব নির্ভুল করে তুলতে কী সাহায্য করতে পারে?

প্রথমত, নিজের লক্ষ্যে চলার পথে পুরোপুরি নিঃস্বার্থ হওয়া একান্ত দরকার। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে স্বার্থচিন্তা যদি সজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে, তাহলে তা ঠিক পথে চালিত না করে বিপথচালিত করবে। যখন সজ্ঞানের উপর স্বার্থের প্রাধান্য ঘটে, আমাদের সর্বনাশ তখন আসন্ন। অতএব, কোন জাতির ভাগ্যকে চালিত করার সময় যতখানি সম্ভব নিঃস্বার্থ হতে চেষ্টা করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত চেতনাকে সমষ্টির মধ্যে মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করা উচিত—যাতে সমষ্টির মন আমাদের ব্যক্তিগত সজ্ঞান বা প্রজ্ঞার মধ্যে দিয়ে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। এটি সাধারণ লোকের পক্ষে সহজ নয়। সৌভাগ্যবশতঃ কিছু কিছু লোক তাদের ব্যক্তিসত্তাকে অপরের চেয়ে অনেক সহজে জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারে এবং সেই কারণে গণমানসকে অনেক ভালোভাবে বুঝতে পারে। আমরা আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারি, সব কিছু একই

রক[illegible]কলে যে নেতা জনতার মনস্তত্ত্ব ভালোমত বোঝে সেই নেতারই প্রভাব বেশী, ক্ষমতা বেশী, এবং সাফল্যও বেশী। এই মন বোঝা কেবলমাত্র যুক্তি দিয়ে সম্ভব নয়, তা বুঝতে হলেও সজ্ঞানের সাহায্য দরকার।

চর্চার দ্বারা মনকে এমনভাবে তৈরি, এমনভাবে নিয়মনিষ্ঠ করে তোলা যায় যে তা গণমানসের সঙ্গে যোগ রেখে চলতে পারে। তবে তার জন্যে ক্রমাগত চেষ্টা করা ও সতর্ক থাকা দরকার। কল্পনা করুন পাহাড়ের গহ্বর ভেদ করে দুরন্ত জলস্রোত তোড়ে নেমে আসছে। যে জলবিন্দুগুলি ওই জলপ্রপাতের অংশ তারা কি তাদের সত্তা মিশিয়ে দিয়ে সমগ্র জলস্রোতের সঙ্গে এক হয়ে যেতে পারে না? বার্গসঁর প্রাণবন্যার কথা কল্পনা করুন। মানবাত্মাও কি বস্তুজগতের গহনে প্রবেশ করে তার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহের সঙ্গে নিজেকে এক করে দেখতে পারে না? হেগেলের পরমতত্ত্বের কথা কল্পনা করুন, যা বিশ্ব প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে চলেছে। ব্যক্তি কি ক্রমাভিব্যক্ত সেই বিকাশধারায় নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে তা অবধারণ করতে পারে না? সেই দিব্য শক্তির কথা কল্পনা করুন যা বহুবিচিত্র এই সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে প্রকট। মানবাত্মা কি চিন্তায় বা অনুভবে তার সঙ্গে অভেদ হয়ে যেতে পারে না?

সংক্ষেপে গণমানসের সুরে ব্যক্তিমানসকে বাঁধা সম্ভব। কিন্তু এই সজ্ঞান বা প্রজ্ঞাজনিত অনুভূতি ঠিক পথে নাও যেতে পারে এবং আমরা যদি মানুষ ও বিশ্বের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যুক্তিসিদ্ধ ধারণা দিয়ে নিজেদের মনকে সুরক্ষিত করতে না পারি, তা আমাদের রহস্যবাদের অন্ধগলিতে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারে। অতএব তৃতীয়ত আমাদের দরকার ব্যাপকভাবে ইতিহাস অধ্যয়ন এবং তার বিশ্লেষণ ও বিচারের উপর ভিত্তি করে যুক্তিবাদী ধারণা। যুক্তি যেখানে ব্যর্থ হয়, সজ্ঞান সেখানে আমাদের পরিচালনা করতে পারে। যেখানে সজ্ঞান রহস্যের ধোঁয়া সৃষ্টি করে আমাদের বিপথচালিত করে, সেখানে যুক্তি আমাদের ঠিক পথে নিয়ে আসতে পারে।

চতুর্থত, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ও অবস্থার বিকাশ আমাদের ঠিকমত বোঝা দরকার। আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যখন, বলতে গেলে, সীমান্তরেখাগুলি লোপ পেয়েছে। সমস্ত পৃথিবী আজ একক সত্তা। এক প্রান্তে যা ঘটছে আমাদের এই ভূমণ্ডলের সর্বত্র তার সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ছে। ফলত, গণমানসের সঙ্গে আমরা একসুরে বাঁধা থাকলেও, ঐতিহাসিক বিকাশধারা সম্বন্ধে আমাদের সঠিক ধারণা থাকলেও, যদি আমাদের আন্তর্জাতিক বোধের অভাব থাকে আমরা তাহলে ভুল পথে চলে যেতে পারি।

পৃথিবীর এবং ভারতের এক অত্যন্ত সংকট সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা এখন চলেছি। ওয়ার্ধায় ফরওয়ার্ড ব্লকের নিখিল ভারত ওয়ার্কিং কমিটি ৮ই সেপ্টেম্বর ও তার পরবর্তী কয়েকদিনের বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্ত যথারীতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্তটি কি ঠিক হয়েছিল? উল্লিখিত চারটি পরীক্ষায় তা কি উত্তীর্ণ হতে পারবে? একমাত্র ভবিষ্যৎই নিশ্চিত জবাব দিতে পারে। ইতাবসরে আসুন, আমাদের সাধ্যমত সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকর করতে লেগে যাই। যাই ঘটুক না কেন, আমরা নিশ্চয় এইটুকু দাবি করতে পারি যে, আমাদের আর কোন ইচ্ছা নেই, আর কোন কামনা নেই, একমাত্র কামনা সম্ভবমত সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে আদর্শের সেবা করে যাওয়া।

আমার দেশপরিক্রমা

২৮শে অক্টোবর এবং ২৫শে নভেম্বর ১৯৩৯এ 'ফরওয়ার্ড ব্লকে' স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ।

১

১৯৩৯ সালের মে মাসের গোড়ার দিকে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠিত হবার পর, কিছুটা তাড়াহুড়া করে হলেও, আমি মোটামুটি ব্রিটিশ ভারতের সবটাই পর্যটন করি। আমি কয়েকটি দেশীয় রাজ্যের মধ্যে দিয়ে যাই এবং পথের ধারের কয়েকটি স্টেশনে দেশীয় রাজ্যের বিরাট সংখ্যক প্রজাদের সমাবেশে বক্তৃতা দিই। গত কয়েক মাসে আমি যা দেখেছি এবং শিখেছি তার হিসাব নেবার এবং তাই থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ পথনির্দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এখন সময় এসেছে।

প্রথমেই আমি বলে রাখতে চাই যে, গত কয়েকমাসের ঘটনাবলী ও অভিজ্ঞতা থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠার ন্যায্যতা সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে এবং ফরওয়ার্ড ব্লক যে তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করার জন্য পাকাপাকিভাবে রয়ে গেল, সে বিষয়ে আজ কারও মনে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। পরে যা বলছি তার থেকে এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করার প্রয়াস করব।

আমি যে যে জায়গায় গিয়েছি, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কংগ্রেস-নেতাদের বা কংগ্রেস-সংগঠনগুলির কাছ থেকে কোন সাহায্য বা সহযোগিতা আমি পাইনি। এই নিয়মের ব্যতিক্রম যেটুকু হয়েছিল, তা খুবই সামান্য। কয়েক জায়গায় কায়েমী কংগ্রেসের মনোভাব ছিল নিরপেক্ষ বা নির্বিকার—কিন্তু অন্যান্য জায়গায় ছিল প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে শত্রুতা। অন্ধ্র ও তামিলনাদ প্রদেশে (অর্থাৎ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে) দুটি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট দুজন আমাকে বয়কট করার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন করেন। অন্যত্রও এইভাবে জনসাধারণের কাছে আবেদন করা হয়। অন্যান্য

জায়গায়, যেমন গুজরাটে, প্রচ্ছন্নভাবে প্রচার চালানো হয় এবং আমার কোন কোন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ অত্যন্ত জঘন্য ও নির্লজ্জভাবে আমার নামে অপবাদ ছড়াতে কুণ্ঠা বোধ করেনি। পাটনায় একদল লোক প্রাদেশিক বিদ্বেষকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগিয়েছিল এবং 'গান্ধীবাদ জিন্দাবাদ' আওয়াজ তুলে জুতো ও ইটপাটকেল ছুঁড়েছিল। ৯ই জুলাই আমার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পর, আমাকে খোলাখুলিভাবে কংগ্রেসবিদ্রোহী বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা আমার বিরুদ্ধে যে প্রচার চালায় তারমধ্যে নানা রকমফের ছিল। কখনও তারা বলে, হিন্দু মহাসভা এবং ডাক্তার আম্বেদকরের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টির মত কংগ্রেসবিরোধী দলগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমি একটা নতুন দল গঠন করছি। অন্য সময়ে বলে, আমি মুসলীম লীগে যোগ দিয়েছি। এই ধরনের প্রচার তবু সহ্য করা যায়। কিন্তু সত্য ও অহিংসার ধ্বজাধারীরা মুখে মুখে গোপনে যে কদর্য প্রচার চালিয়ে চলেছিল, যার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না, সে সম্পর্কে করার কী ছিল ?

এই অবস্থার মধ্যে এবং এইরকম বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে আমাকে পর্যটন করতে হয়েছে। এছাড়া, মহাত্মা গান্ধী থেকে শুরু করে পরিচিত নেতারা প্রায় সবাই আমার বিরুদ্ধে একজোট। আমার কাছে সুপারিশ বলতে কী যে ছিল তা বলে বোঝানোর থেকে কল্পনা করাই ভালো। তা সত্ত্বেও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, এই পরিক্রমা হয়ে উঠেছিল যেন জয়যাত্রা। এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে যতই গিয়েছি আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর ততই বেড়েছে। এবং আজ আমার পক্ষে বলা কঠিন, কোন প্রদেশ আমাকে সংবর্ধনা জানাতে সর্বাধিক উৎসাহ দেখিয়েছে।

১৯৩৯-এর ২৯শে এপ্রিল কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মিটিংয়ে আমি যখন ভারতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট পদ থেকে ইস্তফা দিই, তখন আমি অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছিলুম। আমার

সহকর্মী বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ আমার কাজ সমর্থন করেন কিন্তু অনেকেই মনে করেন আমি ভুল করেছি। সেই চরম সিদ্ধান্ত নেবার সময় শেষ পর্যন্ত আমার বিবেক ও রাজনৈতিক বোধ দ্বারা আমি চালিত হই। কিন্তু আমার পদত্যাগের মধ্যে দিয়ে জনমতকে যে অভাবিত মাত্রায় আমাদের সমর্থনে আনতে সমর্থ হয়েছি এই সুখকর বিস্ময়টি শীঘ্রই আমি আবিষ্কার করি। বিশেষ করে বাংলাদেশ দৃঢ়ভাবে আমাদের সমর্থন করল এবং সেখান থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের যে যাত্রা শুরু হল তার চেয়ে সেরা যাত্রা সম্ভব নয়।

কিন্তু ভারতের বাকি অংশ সম্পর্কে ? ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করার পর আমি তা জানতে পেরেছি। আমি প্রথমে যাই যুক্ত-প্রদেশে, কিংবা আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, উনাও-এ এবং কানপুরে। দু জায়গাতেই ফরওয়ার্ড ব্লক বেশ ভালোমতই সংবর্ধনা পেয়েছিল। স্বার্থসংশ্লিষ্ট কিছু লোক ব্লকের নীতি ও কার্যক্রম সম্পর্কে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল, তবে আমার বক্তৃতার ফলে আমি তা দূর করতে সমর্থ হই। যখন ওখান থেকে ছেড়ে যাই, বাংলা দেশের বাইরের প্রতিক্রিয়া আমাদের অনুকূল হবে এই ভেবে আশান্বিত হই।

যুক্তপ্রদেশের পর পাঞ্জাব। যখন আমি লাহোর স্টেশনে নামি, সামনে চেয়ে দেখি অগণিত মানুষের জনসমুদ্র এবং ঘনঘন উল্লাসধ্বনি উঠছে "ফরওয়ার্ড ব্লক জিন্দাবাদ"। গত বছর কংগ্রেস প্রেসিডেন্টরূপে আমি যে-লাহোরে গিয়েছিলাম, এ লাহোর সে-লাহোর নয়। মুহূর্তের মধ্যে আমি বুঝতে পারলাম ফরওয়ার্ড ব্লক জনগণের চিত্ত জয় করেছে। কিন্তু এই অঘটন কি করে ঘটল ? ব্লকের কথা কে সুদূর লাহোরে বয়ে নিয়ে গেছে ? সম্ভবত কোন মানুষ দূত নয়, কবির মেঘদূত কিংবা ঐতিহাসিকের কালশক্তি।

পাঞ্জাবের জনতার আবেগ উচ্ছ্বাস এমনিতেই বেশী, এবারে তা অতিরিক্ত মাত্রায় আমার ভাগ্যে জুটেছিল। আমার আনন্দও সেইরকম হয়েছিল। সেখান থেকে আমি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

প্রদেশে যাত্রা করি। এখানে আমি আগে কখনও আসিনি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের ডাকে পাঠান ভাইরা কিভাবে সাড়া দেবে সে সম্পর্কে আমার কোনই ধারণা ছিল না। সীমান্ত অঞ্চলের লোকদের উপর খান-ভ্রাতাদের আশ্চর্য প্রভাবের কথা এত বেশী শোনা যে এই অবস্থায় অনিশ্চিত মনোভাব থাকা স্বাভাবিক। লাহোরেই আমি খবর পেয়েছিলাম, খান আবদুল গফুর খানের তরফ থেকে ইতিমধ্যে সর্বত্র জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আমার সঙ্গে কংগ্রেসের কোনই সম্পর্ক নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার ভাগ্যে সাদর অভ্যর্থনা জুটেছিল দেখে আমি আশ্বস্ত হই। সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমার যা কিছু সন্দেহ সব দূর হয়ে গেল। পথের ধারের স্টেশনগুলিতে বিরাট জনতার সমাবেশ এবং তাদের মধ্যে বিশেষ করে নজরে পড়ে লালকোর্তা বাহিনী (বা খুদাই খিদ্‌মৎগার)। আমরা যত পেশাওয়ারের নিকটবর্তী হতে লাগলাম জনতা তত বিপুলাকার ধারণ করতে লাগল এবং পেশাওয়ারে পৌঁছিয়ে দেখি একেবারে রাজকীয় সংবর্ধনার ব্যবস্থা।

পেশাওয়ারে আমি পুরো একদিনও ছিলাম কিনা সন্দেহ। কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় পাঠান যে মনেপ্রাণে ফরওয়ার্ড ব্লক অনুগামী না হয়ে পারে না সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে ঐ সময়ই ছিল যথেষ্ট। পেশাওয়ার শহরে এবং ক্যান্টনমেন্টে বিরাট সাফল্যের সঙ্গে জনসভা হয়। ক্যাণ্টনমেণ্ট কর্তৃপক্ষ প্রথমে আমাদের জনসভা নিষিদ্ধ করে দেয়, যদিও সেখানে বক্তৃতা দিতে মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল—কিন্তু আমরা যখন নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার সংকল্প করি, কর্তৃপক্ষ পিছু হটে গিয়ে আদেশ প্রত্যাহার করে। কংগ্রেসকর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয় তা খুবই কাজের হয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমরা ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হই। ফরওয়ার্ড ব্লক লাভবান হয়েছিল নওশেরার মিয়া আকবর শাহ্‌-সাহেবের মত একজন দুর্ধর্ষ কর্মী ও সংগঠককে পেয়ে।

স্বল্পকালের জন্যে সীমান্ত প্রদেশ ঘুরে আসার পরে একথা স্পষ্ট

হয়ে উঠেছিল যে, অন্তত উত্তর-ভারত সম্পর্কে স্বতঃপ্রবৃত্ত জনসমর্থন ফরওয়ার্ড ব্লক আশা করতে পারে। তা জনতার চিত্ত জয় করেছে এবং এরই মধ্যে "ফরওয়ার্ড ব্লক জিন্দাবাদ" জনতার স্লোগান হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু উত্তর-ভারতই ভারতবর্ষ নয়। বোম্বাইয়ে, মাদ্রাজে ও অন্যত্র রয়েছে দক্ষীণপন্থীদের ঘাঁটি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ঘাঁটিগুলি পর্যুদস্ত না হচ্ছে সমগ্র ভারত সম্পর্কে কোন সাধারণ উক্তি করা চলে না। অতএব আমি পেশাওয়ারে ফ্রন্টিয়ার মেল ধরে সোজা বোম্বাইয়ে চলে আসি। সেখানে শ্রীযুক্ত কে. এফ. নরিমান ফররয়ার্ড ব্লকের সারা ভারত কনফারেন্সের জন্য ব্যবস্থাপনা করছিলেন।

২

১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারী মাসে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি বোম্বাই গিয়েছিলাম। হরিপুরা কংগ্রেস থেকে সোজা যখন সেখানে আসি, পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সাড়ম্বরে সংবর্ধনা জানানো হয়। সেই অনুষ্ঠানে ছিল সবার সহযোগিতা এবং এই কারণেই তা অভূতপূর্ব হয়েছিল। এবারে (১৯৩৯-এর জুন মাসে) অবস্থা ছিল ভিন্ন প্রকার। আমি আর প্রেসিডেন্ট নই। ফরওয়ার্ড ব্লকের তরফ থেকে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, অতএব কংগ্রেস হাইকমাণ্ড আমাকে ১নং বিদ্রোহীর ছাপ দেগে দিয়েছে। দেশের শত্রু বলে আমাকে ঘোষণা করা যায় না, যেহেতু মহাত্মা গান্ধী তাঁর কোন এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন—"যতই হোক সুভাষবাবু দেশের শত্রু নন।"

গান্ধীবাদীদের ঘাঁটি বোম্বাই এইরকম লোককে কিভাবে অভ্যর্থনা জানাবে? ২২শে ও ২৩শে জুন সেখানে যে ফরওয়ার্ড ব্লকের সারা ভারত কনফারেন্স বসবার কথা আছে তার কী হাল হবে? আমি যখন 'ভারতের সিংহদ্বার'-এর দিকে এগিয়ে চলেছি তখন এই সব প্রশ্ন স্বভাবত আমার মনকে ভাবিয়ে তুলেছিল। কিন্তু আমি আশা

ছাড়িনি। বোম্বাই থেকে যা খবর পাচ্ছিলাম তা ছিল আমার মনোভাবের পক্ষে। তাছাড়া যাত্রাপথের স্টেশনগুলিতে আমি যে সংবর্ধনা পাচ্ছিলাম, বিশেষ করে দিল্লীতে, জব্বলপুরে এবং অনুরূপ আরও অনেক জায়গায়, তাতে জনসাধারণের মনোভাব আমি বুঝতে পেরেছিলাম। স্টেশনগুলিতে যে বিপুল জনতার সমাবেশ ঘটেছিল তাই শুধু আমার আগ্রহ জাগায়নি, যে উৎসাহের প্রাচুর্য তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল, তাদের মুখে যে ভাব, তাদের চোখে যে দীপ্তি দেখেছিলাম তাও আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি কোন মিথ্যা ভেখ নিয়ে হাজির হইনি। তারা ভালোভাবেই জানত আমি কী উদ্দেশ্য নিয়ে পরিভ্রমণ করছি—কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এসেছে এবং এসেছে তাদের নিজেদের ইচ্ছায়। সেই সময়ে আমাকে পোষকতা করার মত কোন সংগঠন ছিল না বললেই হয়। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে নিঃসন্দেহে কালধর্ম মূর্ত হয়ে উঠেছিল। জনসাধারণকে যে অস্ফুট অনুভূতি আশা আকাঙ্ক্ষা নাড়া দিচ্ছিল ফরওয়ার্ড ব্লক তাকেই ভাষা দিয়েছিল। সেই কারণেই ব্লক স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের চিত্ত জয় করেছে এবং জয় করেছে অভূতপূর্ব মাত্রায়।

বোম্বাইয়ে পৌঁছনোর পর আমি যে সংবর্ধনা পাই তা সংখ্যার দিক থেকে দেখতে গেলে গত বছরের পর্যায়ে হয় নি। কিন্তু উৎসাহের মাত্রা ছিল যেমন অনেক বেশী, তেমনই ছিল তা সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত। কংগ্রেস সংগঠনের মনোভাব ছিল অসহযোগের মনোভাব এবং সম্ভবত, কিছু পরিমাণে, প্রচ্ছন্ন শত্রুতারও—কিন্তু তাতে তেমন কিছু আসে যায় নি। আজাদ ময়দানে যে জনসভা হয় তাকে বলা যেতে পারে বিরাট জনসভা এবং শ্রোতাদের করতালি থেকে বিচার করলে, জনসাধারণ ছিল পুরোপুরি আমাদের দিকে। এই বিরাট জনসভার পর শহরের প্রতিটি এলাকায় আমরা পর পর সভা করি। যে সব এলাকাকে গান্ধীবাদীদের ঘাঁটি বলে গণ্য করা হত, সেই সব এলাকায় অনুষ্ঠিত সভায় বিপুল সংখ্যক উৎসাহী জনতার সমাবেশ দেখে অনেকেই অবাক হয়েছে এবং অনেককেই বলতে শোনা গেছে, এই

সভাগুলি ১৯৩০-এর গৌরবমণ্ডিত দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। আমরা যে বোম্বাইয়ের জনসাধারণের চিত্ত জয় করেছি তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর হলে যখন ফরওয়ার্ড ব্লকের সারা ভারত কনফারেন্স চলছিল আগ্রহী ও উৎসাহী শ্রোতার ভীড়ে তিলধারণের জায়গা ছিল না। এমনকি রাস্তায় লাউডস্পীকার লাগাতে হয়েছিল যাতে যে বিরাট জনতা ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনি, তারা শুনতে পায়। সমস্ত প্রদেশের ডেলিগেটরা কনফারেন্সে যোগ দেন, এবং তাঁদের সহায়তায় ও সহযোগিতায় ব্লকের গঠনতন্ত্র ও কার্যক্রম প্রণয়ন করা হয়। যতদিন তা না হয়েছে ব্লক ছিল সবার আক্রমণের লক্ষ্য। দক্ষিণপন্থীরা একে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলে নস্যাৎ করেছে। বাইরে থেকে না হলেও, ভিতরে ভিতরে আসলে এটা একটা গান্ধীবাদী পার্টি, এই বলে কিছু কিছু বামপন্থী (অথবা ভুয়ো-বামপন্থী) কুৎসা রটনা করেছে। একটা কল্পিত কারণে ব্লকের নামে বরাবর অপবাদ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা এই যে, ব্লকের কোন সুনির্দিষ্ট নীতি ও কার্যক্রম নেই, যত সুবিধাবাদী ও নানারকমের হতোদ্দম ব্যক্তিদের এটা ঘাঁটি হয়েছে। ফরোয়ার্ড ব্লকের গঠনতন্ত্র ও কার্যক্রম গৃহীত হবার পর যখন তা সংবাদপত্রে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হল—এই ধরনের মিথ্যা প্রচার—বিশেষত সেই অংশ যা সরল বিশ্বাসে করা হয়েছিল—আপনিই বন্ধ হয়ে গেল।

প্রধান যে সমস্যা নিয়ে বোম্বাইয়ে আমাদের ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল তা নবগঠিত ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে বর্তমান বামপন্থী পার্টি ও গোষ্ঠীগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক। আমরা স্বভাবত চেয়েছিলাম সর্বসম্মত ন্যূনতম একটি কার্যক্রম অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে একটি সংগঠনের মধ্যে সব বামপন্থীরা তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত করবে। বর্তমানে যে সব বামপন্থী পার্টি বা গোষ্ঠী আছে তাদের কোনটিকেই ভেঙে দেবার দরকার নেই এবং তারা অতিরিক্ত যে কোন কার্যক্রমকে রূপ দেবার জন্যে কাজ করে যেতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত তা সম্ভব হল

না। অংশত পারস্পরিক অবিশ্বাসের জন্য, অংশত অন্যান্য কারণে, সর্বসম্মত ন্যূনতম কার্যক্রমের ভিত্তিতে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের বিলুপ্তি সম্ভব হল না। অন্যদিকে কোন পার্টি বা গোষ্ঠী তাদের সদস্যদের ফরওয়ার্ড ব্লকে ব্যক্তিগতভাবে যোগ দেবার স্বাধীনতা দিল না। অতএব বর্তমান পার্টি ও গোষ্ঠীগুলি তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখবে ধরে নিয়ে বামপন্থী সংহতির প্রয়াস করতে হল।

এইটেই ছিল এর পরে সবচেয়ে সেরা পন্থা এবং এর চেয়ে ভালো কোন সমাধান সম্ভবপর ছিল না। অতএব বামপন্থী সংহতি কমিটি গঠিত হল। এতে যোগ দিল কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল ফ্রন্ট গ্রুপ, র‍্যাডিকাল লীগ, এবং নবগঠিত ফরওয়ার্ড ব্লক। স্থির হল, এককভাবে পার্টি ও গোষ্ঠিগুলির সমান অধিকার থাকবে এবং এদের মধ্যে সর্বসম্মত মতৈক্য হলেই বামপন্থী সংহতি কমিটি কাজ করতে পারবে।

এই উপায়টি কাগজে-কলমে যত না ফলপ্রসূ হোক, কার্যক্ষেত্রে অনেক বেশী হয়েছিল। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মিটিংয়ে বামপন্থী সংহতি কমিটির উপস্থিতি ভালোমতই বোঝা গিয়েছিল, কারণ সেখানে সমস্ত বামপন্থীদের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা সম্ভব হয়েছিল এবং যদিও সংখ্যায় তারা ছিল অনেক কম তা সত্ত্বেও এ.আই.সি.সি'র আলাপ-আলোচনার উপর তারা প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। এ.আই.সি.সি'র মিটিং শেষ হয়ে যাবার পর, বামপন্থী সংহতি কমিটি (বা এল. সি. সি) মিলিত হয়ে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা কী হবে তা স্থির করে।

এ.আই.সি.সি মিটিং সম্পর্কে একটি কথা। যদিও সংখ্যালঘু বামপন্থীদের বিরোধিতা উপেক্ষা করে কিছু কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়, এ.আই.সি.সি'র সুসংগঠিত বামপন্থী শক্তি সমবেত দর্শকদের মনে ভালো ধারণাই সৃষ্টি করতে পেরেছিল। বামপন্থী নেতারা, বিশেষ করে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতারা, যখনই কিছু বলার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে, ঘনঘন করতালি দিয়ে তাদের সংবর্ধিত করা হয়েছে।

বোম্বাই সফরে সাফল্যের পর আমি পুণায় যাই। সেখানে আমি অপরিচিত ছিলাম না এবং পুণা কখনই গান্ধীবাদীদের ঘাঁটি হয়নি। সুতরাং, আগে থেকেই আমাকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল, আমি সেখানে উচ্ছ্বসিত ও আন্তরিক সাড়া পাব। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলার কর্মীদের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করি এবং সন্ধ্যায় এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দিই। আমাদের সৌভাগ্য যে সেনাপতি বি. এম. বাপত'এর মত মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত এক জননেতা ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন। তাঁর সহযোগিতা পাবার পর মহারাষ্ট্রে ব্লকের অগ্রগতি যে দ্রুত হবে সে বিষয়ে আমরা আশ্বস্ত হলাম।

মহারাষ্ট্রের পর এলাম কর্ণাটকে, সেখানে আমার বরাতে কী আছে তার কোন ধারণাই আমার ছিল না। কিন্তু বাস্তবিক যা ঘটল তা আমার সমস্ত প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেল, এবং আমি কর্ণাটক ত্যাগ করে চলে আসার আগে দক্ষিণপন্থীদের মহলে দারুণ এক বিপর্যয় ঘটে গেল, এবং, বিপর্যয় এল এই ঘোষণার সূত্রে যে, কর্ণাটক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত এস. কে. হোসমানি. এম.এল.এ (কেন্দ্রীয়) ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেছেন। এ বিষয়ে পরবর্তী লেখায় বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে।

৩

পুণা থেকে ধারওয়াড় হুবলি যাবার জন্যে আমি রাতের ট্রেন ধরি। ভোর হতে দেখি জায়গায় জায়গায় পার্বত্য দৃশ্যাবলীর মধ্যে দিয়ে ট্রেনটা ঘুরে ঘুরে চলেছে। আবহাওয়া ভিজে, কনকনে—কিন্তু তা সত্ত্বেও চারপাশের গ্রাম্য পরিবেশ দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। পথের ধারের স্টেশনগুলিতে দলে দলে মানুষ প্রতীক্ষা করছিল আমার কাছ থেকে সামান্য কিছু শোনার জন্য। আমরা সোজা ধারওয়াড়ে গিয়ে নামলাম।

আমার কর্ণাটকের কর্মতালিকায় কোন ফাঁক ছিল না। বিজাপুর জেলা বাদ দিয়ে প্রদেশের অধিকাংশ অঞ্চল আমি পরিভ্রমণ করি কিছুটা ট্রেনে এবং কিছুটা মোটরগাড়িতে। যেহেতু এই প্রদেশে আমি নবাগত, সেখানে যাঁরা আমাদের সহকর্মী ছিলেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা দাবি করার মত ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁদের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত অমায়িক এবং তাঁদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি, ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষে যে পরিমাণ জনসমর্থন আমি সেখানে পেয়েছি তা আমার কাছে সুখকর এক বিস্ময়। বহিরাগত অনেকের মত আমারও ধারণা হয়েছিল, যেহেতু শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর রাও দেশপাণ্ডে কর্ণাটক কংগ্রেসের অগ্রগণ্য নেতা, সেইজন্য সেখানে ব্লক বোধহয় তেমন সুবিধা করতে পারবে না। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের মত, সেখানকার অবস্থাও এমন বদলে গেল যে চেনা ভার। গণজাগরণে অগ্রগতির দরুন আমাদের আন্দোলনে নতুন নতুন শক্তি ও ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছিল। তাছাড়াও, গত কয়েক বছরের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আরও কিছু সংগঠন গড়ে উঠেছিল। যারা সময়ের তালে পা ফেলে চলতে পারেনি, কংগ্রেসের পরিবর্তনশীল গঠনের সঙ্গে যারা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারেনি এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগঠনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে পারেনি, তারা ধীরে ধীরে আরও প্রগতিশীল ও সক্রিয় ব্যক্তিত্বের আড়ালে অপসৃত হচ্ছিল। আমার কাছে মনে হয়েছিল—আশাকরি পরিস্থিতি বুঝতে আমি ভুল করছি না—জি. আর. দেশপাণ্ডের মত প্রবীণ নেতারা অতীতে যতই স্বার্থত্যাগ ও সেবা করে থাকুন, উঠতিযুগের তরুণদের সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছেন এবং তাদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছেন না, অথচ এই তরুণরাই কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই ভুলে যাই যে, রাজনীতি এমন কিছু যা গতিশীল এবং যার নিত্য পরিবর্তন ঘটছে। কিছু না করে, অতীতে যে স্বার্থত্যাগ ও সেবা করেছ তারই উপর ভরসা করে যদি বসে থাক এবং আবদার কর সবাই সব সময়ে

তোমাকে মাথায় তুলে রাখবে, তাহলে তোমার কপালে দুর্গতি অনিবার্য। সব সময়ে যদি সামনের সারিতে থাকতে চাও, অগ্রগমন সর্বদা অব্যাহত রাখতে হবে।

ভারতব্যাপী আমার পর্যটনকালে বারেবারে আমার মনে হয়েছে কী দ্রুতগতিতে কংগ্রেসের গঠনের পরিবর্তন হচ্ছে, সেইসঙ্গে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নতুন নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটছে এবং ভারতের রাজনৈতিক পট কী তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে। প্রবীণ নেতারাও যদি একইভাবে এই কথাটা বুঝতেন, তাহলে রাজনীতিতে আমাদের প্রগতি হয়তো দ্রুততর হতে পারত এবং সেই সঙ্গে তা আত্মকলহ থেকেও মুক্ত থাকত।

আমি জানি না সবাই একথা মেনে নেবে কিনা যে, কোন একটি দেশের বিপ্লবের চরিত্র নির্ণীত হয় প্রগতিবিরোধী ও প্রগতি-প্রতিরোধী শক্তির প্রকৃতি থেকে এবং এই শক্তির প্রকৃতিও নির্ণীত হয় নেতাদের এবং সেই সময়কার সরকারের মনস্তত্ত্ব থেকে। যেক্ষেত্রে নেতাদের বা সরকারের মনস্তত্ত্ব অনমনীয় বা স্থিতিধর্মী, প্রগতির পথে বাধা সেক্ষেত্রে আরও বেশী এবং সেই বাধার প্রতিক্রিয়াও হয় অনেক বেশী কঠিন ও অদম্য। কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতিবিরোধিতা যে দিনে দিনে বেড়ে চলেছে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং এই ব্যাপার সবার কাছেই দারুণ উদ্বেগের কারণ হওয়া উচিত। যদি কোনক্রমে এই বিরোধিতা অপসৃত হয় তাহলে ভারত দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে এবং এক ধাক্কায় তার আন্দোলনের রাজনৈতিক এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক পর্যায় দুটি অতিক্রম করে যাবে। তা যদি না হয়, আমাদের ভাগ্যে অশেষ দুঃখ ও দুর্গতি রয়েছে।

আমাদের কথায় আবার ফিরে আসা যাক। ধারওয়াড় থেকে শুরু করে বেলগাঁওয়ে আমার যাত্রা শেষ করি। 'আবহাওয়া খুব একটা ভালো ছিল না। তাসত্ত্বেও, আমরা যখন বেলগাঁওয়ে পৌঁছই সেখানে দেখি দারুণ উদ্দীপনা। ঐ দিনের জন্যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছিল। সারা শহরে অভূতপূর্ব এক উত্তেজনা। ছাত্রদের

এক বিপুল সমাবেশে বক্তৃতা দিয়ে আমি জনসভায় যাই। তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে, কিন্তু সেই বিরাট জনতা ছাতা থাকা সত্ত্বেও দারুণভাবে ভিজছিল এবং প্রায় অনড় অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ এমন একটা দৃশ্য যা, যে কোন মানুষের মনে শিহরণ না জাগিয়ে পারে না।

যতদূর আমার মনে পড়ছে, সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন কর্ণাটক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য শ্রীযুক্ত এস. কে. হোসমানি। আমার স্পষ্ট মনে আছে, তিনি আমার পাশে বসেছিলেন। সভা অনুষ্ঠানের পর ব্লকের সমর্থকদের নিয়ে বন্ধ ঘরে আমরা একটা বৈঠকে মিলিত হই। তাতে শ্রীযুক্ত এস. কে. হোসমানিও যোগ দেন। ব্লকের প্রাদেশিক সংগঠনী কমিটির প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণের জন্য একবাক্যে তাঁকে অনুরোধ জানানো হয়, অনুগ্রহ করে তিনি তা গ্রহণ করেন। প্রদেশের দক্ষিণপন্থী মহলে খবরটা বোমা বিস্ফোরণের মত এসে পৌছল। তারা ভাবতেই পারেনি শ্রীযুক্ত হোসমানি'র মত ধীর স্থির বিচক্ষণ ও প্রবীণ ব্যক্তি ফরওয়ার্ড ব্লকের মত 'বিদ্রোহীদের' একটা দলে নাম লেখাবেন। এই প্রসঙ্গে তিনি আমার কাছে অত্যন্ত মজার এক মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে যদি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর পাশে দাঁড়াবার জন্যে আরও একজন প্রেসিডেন্ট দরকার। শ্রীযুক্ত হোসমানি ছাড়াও, আমরা শ্রীযুক্ত মান্দগি এবং শ্রীযুক্ত ইদ্‌গুন্‌জির মত উৎসাহী কর্মী পেয়েছিলাম।

কর্ণাটক থেকে পুণা হয়ে আমি বোম্বাই ফিরে আসি। বোম্বাই পৌছিয়ে দেখি, বোম্বাই সরকারের মাদক বর্জন পরিকল্পনার উপর আমি যে বিবৃতি দিয়েছিলাম তাই নিয়ে দারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। বিবৃতিটি আমি দিই জুলাই মাসের গোড়ায় যখন আমি পুণা ও মহারাষ্ট্র পরিভ্রমণে বার হই। কোন কোন মহলে আমার বিবৃতির বিকৃত ব্যাখ্যা করা হয় এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে সেটি ব্যবহার করা হয়েছে। বিপক্ষীয় কোন কোন সংবাদপত্রের এইটুকু

শালীনতা বোধ ছিল না যে, আমাকে আক্রমণ করার আগে সম্পূর্ণ বিবৃতিটা প্রকাশ করে। ফরয়োর্ড ব্লক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে তার অগ্রগতি এমন অপ্রতিহত হয়েছে যে কোন কোন মহল তাতে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। তার অগ্রগতিকে কি ভাবে রোধ করা যায়—এই ছিল তাদের চিন্তা। মাদক বর্জনের উপর আমার বিবৃতিটা দিয়ে তারা আমাকে অপদস্থ করাবে ঠিক করেছিল।

৪

কর্ণাটক থেকে পটপরিবর্তন হয় গুজরাটে, কিন্তু পাঠকদের সেখানে নিয়ে যাবার আগে ভিন্ন প্রসঙ্গে আমাকে কয়েকটি কথা বলে নিতে হচ্ছে। জুলাইয়ের গোড়ায়, বোম্বাই ত্যাগ করে মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটক যাবার আগে, আমি স্বল্পকালের জন্য জব্বলপুরে যাই। আমাদের সহমর্মী ও সমর্থকরা সেখানে একটি কনফারেন্স আহ্বান করেছিলেন। সেই জন্যে আমার সেখানে যাওয়া—যদিও আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল মহাকোশল প্রদেশে (অর্থাৎ সি. পি. হিন্দুস্থানী প্রদেশ) ফরোয়ার্ড ব্লককে জনপ্রিয় করা। সেই উপলক্ষ্যে মহাকোশলের বিভিন্ন জেলা থেকে ফরওয়ার্ড ব্লক সমর্থকদের একটা জমায়েত মত হয় এবং সেখানে আমাদের সংগঠনের সূত্রপাত ভালোভাবেই হয়েছিল।

১৯৩২ সালে আমি জব্বলপুরে গিয়েছিলাম, কিন্তু তখন গিয়েছিলাম বন্দী অবস্থায়, এবং জব্বলপুর জেলে কয়েক মাস ছিলাম। পরের বার আমি যাই কংগ্রেস প্রেসিডেন্টরূপে। কিন্তু ত্রিপুরি (জব্বলপুরের কাছে) কংগ্রেসে যখন যাই তখন আমি রোগে পঙ্গু এবং যখন ফিরে আসি তখনও তাই। সত্যি বলতে কি, আমাকে স্ট্রেচারে এবং অ্যাম্বুল্যান্স গাড়িতে করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাই আমার পক্ষে জব্বলপুর, বা ত্রিপুরি, বা ত্রিপুরি কংগ্রেস,

কিছুই তেমন দেখা হয়নি। আমার বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে শুধু আমি জানতে পাই, প্রেসিডেন্টের শোভাযাত্রা খুব ঘটা করে হয়েছিল এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল থেকে যারা এসেছিল আমার অভাবে তারা নাকি মর্মাহত হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হয়ে, প্রেসিডেন্টের মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে সেখানে যাওয়া এক কথা, এবং কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর ছাপ নিয়ে সামান্য একজন কংগ্রেসকর্মীরূপে যাওয়া অন্য কথা। তখনও পর্যন্ত আমি এমন কিছু করিনি যাকে বিদ্রোহাত্মক কাজ বলে কলঙ্কচিহ্নিত করা যায়—আমি শুধু কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টপদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকে যোগদান করেছি। তা সত্ত্বেও কায়েমী কংগ্রেস মহলে তাই বিদ্রোহ বলে গণ্য করা হয়েছে এবং সেইমত প্রচারও চালানো হয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের সারা ভারত কনফারেন্সের পর জব্বলপুরেই আমি প্রথম যাই এবং সেইজন্যে সেখানে আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তার একটা অতিরিক্ত তাৎপর্য আছে।

যখনই আমার ট্রেন মধ্যপ্রদেশে প্রবেশ করল, তখনই আমি বুঝতে পারলাম সেখানে আমি কী ধরনের অভ্যর্থনা পাব। জনতা আর জনতা—পথের ধারের স্টেশনে স্টেশনে উৎসাহী জনতার ভীড়। স্পষ্ট বোঝা গেল কংগ্রেসের কায়েমী নেতারা আমাদের উপর যে কলঙ্ক লেপন করেছে তা জনতাকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে নি। সবদিক থেকে শোনা যাচ্ছিল উল্লসিত স্লোগান "ফরওয়ার্ড ব্লক জিন্দাবাদ" এবং যখন আমরা জব্বলপুরে পৌছলাম সেখানে দেখি অগণিত মানুষের জনসমুদ্র। সব সন্দেহের নিরসন হল।

স্টেশন থেকে কোন শোভাযাত্রা বার হয়নি, তবে পরে কোন এক সময়ে তা হবে ঠিক ছিল। সচরাচর শোভাযাত্রা আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি—তাতে অযথা সময় নষ্ট হয় এবং প্রায়ই তা বিশেষত দিনের বেলায়, যথেষ্ট দুর্ভোগ ও কষ্টের কারণ হয়। কিন্তু অন্যদিক থেকে তার প্রয়োজন আছে। তার থেকে গণমানসকে কিছুটা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাওয়া যায়। রাজনৈতিক নানা ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকা

সত্ত্বেও মনস্তত্ত্ব ও দর্শন সম্পর্কে আমার আগ্রহ আমি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। লরিতে সিংহাসনের মত চেয়ারে কিংবা মোটরগাড়ির হুডের উপরে বসে কিংবা সুন্দর করে সাজানো ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চেপে নারীপুরুষের ভীড় লক্ষ্য করার এবং তাদের মনস্তত্ত্ব অনুধাবন করার দুর্লভ সুযোগ পাওয়া যায়। সন্দেহ নেই, অবস্থাটা শো-কেসের মধ্যে একটা পুতুলে যদি প্রাণসঞ্চার করা হয় অনেকটা সেইরকম। তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে এই অভিজ্ঞতার মূল্য আছে।

জব্বলপুরের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। বিপুল শোভাযাত্রা অভ্রান্তভাবে জনতার ভালোবাসাকেই প্রকট করেছিল এবং সেই সঙ্গে আমি যে আদর্শের প্রচার করছিলাম তাতে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন। জনসভাটিও নিঃসন্দেহে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল এবং স্থানীয় বন্ধুদের মতে, জনসভা ও শোভাযাত্রা—দুটিই এমন হয়েছিল যার সঙ্গে জব্বলপুরের সেরা রেকর্ডের তুলনা করা চলে।

এইসব প্রকাশ্য ঘটনাগুলি থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না প্রদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত কর্মীদের নিয়ে বন্ধঘরে ছোট কনফারেন্সটি। সেখানে সংগঠনের একটা কাঠামো খাড়া করা হয়েছিল এবং স্থায়ীভাবে কিছু একটা রেখে যাওয়া যাচ্ছে ভেবে আমরা আশ্বস্ত হয়েছিলাম। জব্বলপুর থেকে মোটরে চেপে অল্পক্ষণের জন্যে আমি মাণ্ডলা যাই। মে মাসের দুপুরের খরা রোদে সেখানে বিরাট এক জনতা প্রতীক্ষা করছিল। চাঁদি ফাটানো রোদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা বিদ্রোহী বক্তৃতা শোনার জন্যে অপেক্ষা করা, এ বোধহয় মাঝ-বোশেখের প্রমত্ততা, তবু এই ধরনের মত্ততায়, যে মত্ততা মানুষকে রোদ বৃষ্টির কথা ভুলিয়ে দেয়, এমন কিছু আছে যা মহৎ, যা পবিত্র।

জব্বলপুর থেকে বোম্বাই আসার পথে মধ্যবর্তী স্টেশনগুলিতে আবার দেখলাম উদ্‌গ্রীব জনতার ভীড়। সব জায়গাতেই দু-চার কথায় কিছু বলতে হল। মহাকোশলের সফর এত কম সময়ের জন্য হল বলে আমি আফসোস না করে পারিনি।

৭ই জুন বোম্বাই পৌঁছিয়ে এক বিস্ময়কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি।

তা কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের বিবৃতি। ৯ই জুলাই আমরা ভারতব্যাপী যে প্রকাশ্য বিক্ষোভ পরিকল্পনা করেছিলাম বিবৃতিতে তা কার্যতঃ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পাঠকের স্মরণে আছে জুন মাসের শেষাশেষি বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে বৈঠক হয় তাতে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এবং আমরা বামপন্থীরা ঐ প্রস্তাব দুটি সম্পর্কে ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছিলাম। তার মধ্যে একটিতে আগে থেকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অনুমতি না নিয়ে কংগ্রেসকর্মীদের পক্ষে সত্যাগ্রহ বা আইন অমান্য করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, এবং অপরটিতে প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলিকে সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি থেকে কার্যত স্বাধীন করা হয়েছে। বামপন্থীদের মতে এই সিদ্ধান্তগুলির গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণপন্থীদের শক্তিশালী করা এবং কংগ্রেসকে গণসংগ্রামের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। ফলে প্রস্তাবগুলির বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ জানানো বাঞ্ছনীয় ও প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে ৯ই জুলাই সারা ভারত প্রতিবাদ দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল, সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বামপন্থী সংহতি কমিটি—ফরওয়ার্ড ব্লক একা নেয় নি।

ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের বিবৃতির আড়ালে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রচ্ছন্ন হুমকি ছিল এবং কারও তা নজর এড়ায়নি। বিবৃতিটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, তা বিবেচনা করার জন্যে বামপন্থী সংহতি কমিটির মিটিং আহ্বান করা প্রয়োজন বলে মনে হল। সোশ্যালিস্ট পার্টি, ন্যাশনাল ফ্রন্ট গ্রুপ, র‍্যাডিকাল লীগ এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিনিধিরা সেই অনুযায়ী মিলিত হয়ে বিবৃতিটি বিবেচনা করেন এবং সাধারণ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। আমাদের পূর্বেকার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার কোন কারণ আমরা পেলাম না। অতএব বোম্বাইয়ে যথাযোগ্য (প্রতিবাদ) পালনের জন্য আয়োজন শুরু হল।

পরে মিস্টার এম. এন. রায় র‍্যাডিকাল লীগের তরফ থেকে এই সিদ্ধান্ত বানচাল করতে এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু মারফত

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টিকেও সেইভাবে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেন —তা সত্ত্বেও বোম্বাইয়ে এবং ভারতের অন্যত্রও উক্ত চারটি সংগঠনের এবং কিসান সভার যুক্ত নেতৃত্বে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়।

বামপন্থী সংহতি কমিটি গঠন করার পর বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে এই প্রথম সংঘর্ষ। বামপন্থীদের ডাকে জনসাধারণ কীভাবে সাড়া দেয় তা দেখবার জন্যে বোম্বাইয়ের জনগণের কৌতূহল ও আগ্রহের সীমা ছিল না। অস্পষ্ট কিছু গুজবও রটে যে দক্ষিণপন্থীদের সমর্থকরা আমাদের সভাসমিতিগুলি ভেঙে দিতে আসছে। কিন্তু অঘটন কিছুই ঘটেনি। বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত সব সভাই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। ফ্রাঞ্জি কাওয়াসজি হলের সভায় আমি যোগ দিয়েছিলাম। হলের মধ্যে তিলধারণের জায়গা ছিল না, হলের বাইরে অসংখ্য লোক ভীড় করেছিল। সাধারণের উৎসাহ চরমে পৌঁছেছিল।

এইভাবে আমরা প্রথম বাধা অতিক্রম করলাম।

অতীতে দৃষ্টিপাত

৪ঠা নভেম্বর, ১৯৩৯এ 'ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

গত সপ্তাহে আমরা কিছুটা পথের হদিস নেবার চেষ্টা করেছি। এই সপ্তাহে অতীতে দৃষ্টিপাত করার প্রয়াস করব এবং গত বছর থেকে রাজনীতির দাবার ছকে কী কী পরিবর্তন ঘটেছে তার হিসাবনিকাশ করার চেষ্টা করব। তারপরে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কোন ভূমিকা পালন করতে আমাদের এখনও বাকী আছে তা অবধারণ করতে আমরা সচেষ্ট হব।

স্মরণে থাকতে পারে, ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে হরিপুরায় অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তা ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনে অঙ্গীভূত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কিত। তাতে যে নীতি নির্ধারিত হয় তা প্রস্তাবিত ফেডারেশনের বিরুদ্ধে আপসহীন বিরোধিতার নীতি। তখন গভীরভাবে আশঙ্কা করা হয়েছিল যে, ব্রিটিশ সরকার আমাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করে ফেডারেশন দাওয়াই আমাদের গিলিয়ে দেবে এবং বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর ফেডারেল (যুক্তরাষ্ট্রীয়) কাঠামো সম্পর্কে অত্যধিক আগ্রহ এই আশঙ্কার রসদ জুগিয়েছিল। মাসের পর মাস যত চলে যেতে লাগল আমাদের মধ্যে অনেকেই ভাবতে শুরু করল, প্রদেশে প্রদেশে সরকারী কার্যভার গ্রহণ কংগ্রেসকর্মীদের একটি অংশের মধ্যে বিশুদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক মনোভাব জাগিয়ে তুলে তাদের নীতভ্রষ্ট করতে আরম্ভ করেছে। একই সঙ্গে খবর আসতে শুরু করল, ব্রিটিশ সরকারের দালালরা মূল আকারে অথবা কিছু রদবদল করে ফেডারেল (যুক্তরাষ্ট্রীয়) কাঠামোর সমর্থনে জনমতকে আনবার জন্যে ধূর্ত অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। এইসব কারণে ১৯৩৮-এর জুলাই মাসে ৪ঠা (ফেডারেল) কাঠামোর বিষয়ে

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করার বিপদ সম্পর্কে বাধ্য হয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। একথাও আমি বলে রাখি যে, এই প্রশ্নে আমি এত গভীরভাবে বিচলিত যে, ঘটনাচক্রে কংগ্রেস যদি ভোটাধিক্যের জোরে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিষয়ে আপস করা অনুমোদন করে, আমি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে আপসের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করা আমার কর্তব্য বলে মনে করব। এই বিবৃতি গান্ধীবাদী মহলে বিরক্তির কারণ হয়। ফেডারেশন সম্পর্কে আমার সুদৃঢ় অভিমত ততটা বিরক্তি ঘটায়নি, যতটা ঘটিয়েছিল সেখানে আমার স্পষ্ট ইঙ্গিত যে, এই রকম সর্বাত্মক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মানেই যে সংখ্যালঘিষ্ঠের মুখ চাপা দেওয়া বা তাদের নিষ্ক্রিয় রাখা তা নয়। পরে যে ঝড় উঠেছিল সম্ভবত এই থেকেই তার সূচনা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো সম্পর্কে কংগ্রেসের আপসহীন বিরোধিতার নীতিকে অগ্রাহ্য করে কয়েকজন দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসকর্মী খোলাখুলিভাবে যখন সংশোধিত আকারে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে গ্রহণের সপক্ষে বলে বেড়াচ্ছিলেন তাতে গান্ধীবাদী মহলে কোন বিরক্তি বা অসোয়াস্তি দেখা দেয়নি, অথচ অবাক লাগল যখন দেখলাম অনেক বেশী ঐ নীতিসম্মত আমার বিবৃতি সবার বিরক্তি ও অসন্তোষের কারণ হল। আসলে, আমরা বামপন্থীরা লক্ষ্য না করে পারি নি যে, যে ফেডারেশন প্রশ্ন দেশের সামনে মস্ত একটা সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল, সে সম্পর্কে কংগ্রেসের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নীতি থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণপন্থী কোন নেতাই তার বিরুদ্ধে কখনই কোন জোরদার আন্দোলন শুরু করেননি।

১৯৩৮-এর অক্টোবরে দিল্লীতে কংগ্রেসের শিল্পমন্ত্রীদের এক কনফারেন্স বসে এবং তাতে আমি সভাপতিত্ব করি। সেখানে সর্ব-সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, একটি ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি নিয়োগ করা হবে। সেই মিটিংয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও গণ্যমান্য আরও কয়েকজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন এবং কারও কাছ থেকে আপত্তিসূচক কিছু শোনা যায়নি, অথচ মহাত্মা

গান্ধীর সঙ্গে যে-সব মহল ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত তাঁরা এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেন না এবং ন্যাশনাল প্লানিং কমিটিকে মনে করেন মহাত্মা গান্ধী সৃষ্ট ভিলেজ ইণ্ডাস্ট্রিজ্ অ্যাসোসিয়েশন্ (গ্রামীন শিল্প সঙ্ঘ)-এর আদর্শ ও উদ্দেশ্যের পথে মস্ত এক প্রতিবন্ধক। কেউ কেউ এমন কথাও বলেছে যে, মহাত্মাজীর সারা জীবনের সাধনার ফল ন্যাশনাল প্লানিং কমিটি খতম করে দিতে চাইছে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগে আরও একটি অপরাধ যোগ করা হল।

ফেডারেশন সম্পর্কে জুলাই মাসে আমার বিবৃতির পর ভারতে ও ভারতের বাইরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে থাকে এবং আমাদের অনেকেই ভাবতে শুরু করে আমাদের দেশবাসীর কাছে ফেডারেশন আর আসন্ন বিপদ নয়। খুবই সম্ভব যে, ব্রিটিশ সরকার তাদের নিজেদের স্বার্থে কয়েক বছরের জন্যে, অন্তত যতদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ঘোরালো পরিস্থিতি সহজ হয়ে না আসে, ফেডারেশন প্রস্তাব ধামা চাপা রাখবে। তাতে সরকারের কিছুই ক্ষতি হবে না। তাদের দিক থেকে দেখলে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ভালোভাবেই চলেছে এবং কেন্দ্রে পুরনো স্বেচ্ছাতান্ত্রিক সরকারও নির্ঝঞ্ঝাটে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। যদি ফেডারেশন প্রবর্তনের অর্থ দাঁড়ায় গণপ্রতিরোধ এবং সম্ভবত আইন অমান্য আন্দোলন এবং তা এমন এক সময়ে যখন আন্তর্জাতিক দিগন্ত ঘনঘটাচ্ছন্ন, তাহলে ফেডারেশন স্থগিত রাখলেই সরকার আসলে লাভবান হবে। ভারতের সমস্যা তখন দাঁড়াবে, সত্যিই যদি স্থগিত রাখা হয় আমাদের কর্তব্য কী হবে?

গতবছর নভেম্বরে আমি যখন পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের কিছু অঞ্চল সফর করি তখন প্রকাশ্যভাবে এই প্রশ্ন তুলেছিলাম। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করি, ব্রিটিশ সরকার যদি ফেডারেল (যুক্তরাষ্ট্রীয়) কাঠামো ধামা চাপা দিতে চায়, ভালো, তাই বলে, যতদিন ফেডারেশন একটা জীবন্ত সমস্যা না হয়ে ওঠে ততদিন পর্যন্ত আমরা জাতীয় সংগ্রাম স্থগিত রাখব, তা হতে পারে না। আমরা নিজেরাই ভারতের জাতীয় দাবির প্রশ্নটি তুলব—তার জবাব দেবার জন্যে

ব্রিটিশ সরকারকে সময় দেব, এবং আমাদের দাবি প্রথমে প্রত্যাখাত হতে পারে ধরে নিয়ে আমরা প্রস্তুত হতে থাকব। আমাদের এই ঘোষণায় জনসাধারণ সোৎসাহে সাড়া দিয়েছিল কিন্তু তাতে দক্ষিণপন্থী নেতারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি, এমনকি, পরে তাঁরা ঘোষণাটিকে বিদ্রূপ করতেও ছাড়েন নি। তা সত্ত্বেও ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে জলপাইগুড়িতে যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় তাতে এই মর্মেই একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এই প্রস্তাব যাতে জনসাধারণ সমর্থন করে সেইজন্য কিছু প্রচারও চালানো হয়েছিল।

১৯৩৯-এর জানুয়ারির শেষাশেষি সেই বছরের কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি চরম দুঃসাহসিকতার কাজ করেছিলাম। কারণ বেশীর ভাগ কংগ্রেসকর্মীর ধারণা ছিল আমার সাফল্যের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। আমার নিজের দিক থেকে দাঁড়াবার যুক্তি ছিল এই বিশ্বাস যে, নির্বাচনদ্বন্দ্বের ফলাফল যাই হোক না কেন, তার দ্বারা আমি ফেডারেশন-বিরোধী আদর্শকে শক্তিশালী করতে পারব। সন্দেহ নেই, নির্বাচনের ফল যেমন দক্ষিণপন্থীদের নিরাশ করেছিল তেমনই তা দেশের সমস্ত বামপন্থীদের মনে আত্মবিশ্বাস ও আনন্দের শিহরণ জাগিয়েছিল। আমার পুনর্নির্বাচনে সবাই বলেছে, "ফেডারেশনের দফা রফা হয়ে গেল।" ওয়ার্ধা থেকে মন্তব্য করা হল, "কুড়ি বছরে যা গড়ে তোলা হয়েছিল, রাতারাতি তা নাকচ হয়ে গেল।"

কিন্তু গান্ধীবাদীদের[১] অত সহজে নিরস্ত করা যায় না। মহাত্মা গান্ধী সক্রিয় হয়ে উঠলেন, সারা দুনিয়ার কাছে তিনি ঘোষণা করলেন (এবং আমার বিনীত মতে, নিতান্ত ভ্রান্তভাবে), পট্টভির পরাজয় তাঁর নিজের পরাজয়। পার্টিযন্ত্র পুরোদমে কাজে লেগে গেল এবং গত

[১] কংগ্রেসকর্মীদের সম্পর্কে আমরা যখন কথা বলি তখন গান্ধীবাদী ও দক্ষিণপন্থী শব্দ দুটি সমার্থক বোঝায়।

মার্চ মাসে ত্রিপুরিতে কংগ্রেসের যে বার্ষিক অধিবেশন স্থির ছিল সেখানে খোলাখুলি লড়াইয়ের আয়োজন চলল।

ত্রিপুরিতে প্রেসিডেন্টের ভাষণে আমি দৃঢ় নীতি অবলম্বন করার কথা বলি, তাতে উল্লেখ করি, ব্রিটিশ সরকারের কাছে ভারতের জাতীয় দাবি পেশ করতে হবে, জবাবের জন্যে ছয় মাসের একটা সময় সীমা নির্দিষ্ট করতে হবে এবং অন্তর্বর্তী সময়ে সর্বপ্রকার সম্ভাবনার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমার প্রস্তাবগুলিকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হল না। স্বরাজের প্রশ্ন তোলা রইল এবং গান্ধীবাদীদের একমাত্র চিন্তা ও প্রচেষ্টা হয়ে দাঁড়াল, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাঁদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া। ইতিমধ্যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে তাঁদের দলভুক্ত করতে পারার ফলে তাঁরা আশান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা সাফল্যলাভ করেছিলেন ঠিকই তবে জাতীয় আদর্শের কতটা ক্ষতিসাধন করে আমরা আজ তা বুঝতে পারছি।

ত্রিপুরি কংগ্রেসের পর গত এপ্রিল মাসের শেষাশেষি কলকাতায় অল ইণ্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির বৈঠক বসে। সেই কমিটির প্রধান সমস্যা ছিল কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি (বা কেবিনেট) গঠন করা। সাধারণের কাছে এখন সুবিদিত, বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের দিয়ে তার সঙ্গে কিছু নতুন কর্মী অন্তর্ভুক্ত করে আমাকে যখন মিশ্র কেবিনেট গঠন করতে দেওয়া হল না, আমি তখন পদত্যাগ করি। তখনও পর্যন্ত দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে দেশের বামপন্থী আন্দোলন চালনা করা হচ্ছিল। কলকাতায় দক্ষিণপন্থীরা সুনির্দিষ্ট একটা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জোট বাঁধল, মিশ্র কেবিনেট অচল এবং বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে সহযোগিতা আর সম্ভব নয়। আমাদের সামনে দুটি পন্থা খোলা রইল—হয় দক্ষিণপন্থীদের কাছে আত্মসমর্পণ করা কিংবা নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে বামশক্তিকে সংগঠিত করা। শেষোক্ত পন্থা আমি গ্রহণ করলাম।

কিন্তু কেন? ত্রিপুরি কংগ্রেসের পর মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার যে পত্রালাপ হয় তাতে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে দক্ষিণপন্থীদের কাছে

জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্বের আশা করা দুরাশা। অতএব দক্ষিণ-পন্থীদের কাছে আত্মসমর্পণের অর্থ দাঁড়ায় নিয়মতান্ত্রিকতার কাছে আত্মসমর্পণ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করা। মহাত্মার কাছে আমার শেষ আরজি এই ছিল যে, তিনি যদি সংগ্রাম সমর্থন করেন, আমরা নিজেদের সব বিভেদ মিটিয়ে ফেলে তাঁর অনুগামী হব। তাঁর জবাব আমাদের নিরাশ করে এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের পত্তন অনিবার্য হয়।

ফরওয়ার্ড ব্লকের তিনদফা কর্তব্য ছিল: (১) বামপন্থী-সংহতি (২) কংগ্রেসের মধ্যে যথার্থ ফলপ্রসূ একতা প্রতিষ্ঠা এবং (৩) কংগ্রেসের নামে পুনরায় জাতীয় সংগ্রামের সূত্রপাত। দেশের সর্বত্র জনসাধারণের কাছে আমরা এই তিনদফা কর্মসূচী প্রচার করি। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে বিভেদ আনার ও ভাঙন ধরাবার অভিযোগ আনা হয়। আসলে সত্যকার বিভেদকারী ছিল দক্ষিণপন্থীরা—যারা বাম-পন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে এবং তার ফলে দক্ষিণপন্থীদের থেকে পৃথক হয়ে বামপন্থীরা বামপন্থী-সংহতি গড়ে তোলার প্রয়াস করতে বাধ্য হয়।

স্বাভাবিকভাবেই দক্ষিণপন্থী-সংহতির বিপরীত তত্ত্ব বামপন্থী সংহতি। গত দুবছর ধরে দক্ষিণপন্থী সংহতি জোট বাঁধছে। দক্ষিণপন্থীদের জোট বাঁধায় কোন আপত্তি হয়নি এবং গান্ধী সেবা সঙ্ঘকে যখন রাজনৈতিক একটা দলে পরিণত করা হল, কেউ একটা কথাও বলেনি। কিন্তু যখন ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করা হল এবং বামপন্থী সংহতি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হল, তখন বিভেদ ঘটানোর ভাঙন ধরানোর রব তোলা হল।

ফরওয়ার্ড ব্লকের মতে কংগ্রেসের বর্তমান কার্যক্রমের মধ্যে যতটুকু জাতীয় আদর্শের দিক থেকে হিতকর, সক্রিয় মনোভাব নিয়ে তাকে কার্যকর করে তুলতে হবে। তাছাড়া, দেশকে সমস্ত সম্ভাব্য অবস্থার জন্যে তৈরি করার জন্যে পরিপূরক একটি কার্যক্রম দরকার। এবং উভয়প্রকার কার্যক্রম অনুযায়ী কাজ করার জন্যে নিয়মতান্ত্রিক

মনোভাবের বদলে সংগ্রামী মনোভাব একান্তভাবে প্রয়োজন। সমস্ত কার্যকলাপের গতিশক্তি আসে মনোভাব থেকে।

ফরওয়ার্ড ব্লক এবং তার কার্যক্রম সম্পর্কে নানা প্রকার সমালোচনা করা হয়েছে। তার মধ্যে কিছু সত্য, কিছু অভিসন্ধি-প্রসূত। মানুষের তৈরি কোন প্রতিষ্ঠানই ত্রুটিহীন বলে দাবি করতে পারে না। অতএব ফরওয়ার্ড ব্লকও দোষত্রুটি মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু কথা এই—আরও ভালো এমন কিছু বিকল্প বা পরিবর্ত প্রস্তাব কি করা হয়েছে যার দ্বারা আমরা যথাসম্ভব কম স্বার্থত্যাগ করে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের জাতীয় লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি? যদি এইরকম বিকল্প কিছু প্রস্তাব করা হয় আমরা সানন্দে তা গ্রহণ করব। যাই হোক ফরওয়ার্ড ব্লক আদর্শের জন্য, ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্য আদর্শ নয়। কিন্তু দ্বিধার সঙ্গে বলতে হচ্ছে আরও ভালো কোন বিকল্প সম্ভব নয়।

অতীতের ঘটনাবলীর দিকে তাকিয়ে দেখলে একথা না বলে পারা যায় না, অতীতে আমরা যা বলেছি যথাসময়ে তা যদি মেনে নেওয়া হত এবং কার্যকর করা হত তাহলে আজ অবস্থা কত অন্যরকম হত। ত্রিপুরি কংগ্রেসের ছমাস পরে ইওরোপে যুদ্ধ বাধে এবং ভারতকে তাতে জড়িয়ে ফেলা হয়। যে সঙ্কটে আমরা জড়িয়ে পড়লাম তার জন্যে সারা দুনিয়া প্রস্তুত হয়েছিল, একমাত্র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রস্তুত ছিল না। এইরকম অযোগ্য নেতৃত্ব দুনিয়ার আর কোথাও পাওয়া দুর্লভ।

এমনকি যুদ্ধ বাধবার পরও নেতারা বসে বসে খালি ভাবছেন আর ভাবছেন। প্রতি পদক্ষেপে দ্বিধা, সংশয়, দুর্বলতা। হরিপুরা ও ত্রিপুরি কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলির কথা আর মনে নেই। যদি তা মনে থাকত, তাহলে আমরা দ্বিধা ও নিষ্ক্রিয়তা প্রত্যক্ষ করতাম না, তার জায়গায় দেখতাম স্থিরসিদ্ধান্ত ও কর্মোদ্যম।

আমাদের এখনও কি বুঝতে বাকি আছে, নতুন দিল্লীতে তীর্থযাত্রা করে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছব না? স্বরাজের চাবিকাঠি ওখানে পাওয়া যাবে না, তা পাওয়া যাবে আমাদের অন্তর্লোকে।•

সত্যিই যদি আপনারা চিন্তিত হন তাহলে মুহূর্তের জন্য একবার ভেবে দেখুন, প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গত বিঠলভাই প্যাটেলের সম্পত্তি যদি ঠিকমত কাজে লাগানো হত এবং পৃথিবীর সর্বত্র ভারত যদি বেসরকারী দূতাবাস খুলত তাহলে আজকের পরিস্থিতি কী দাঁড়াত। কিন্তু কিছু কিছু লোকের কাছে স্বরাজের থেকেও বোধহয় আরও বেশী প্রয়োজনীয় বামপন্থীদের বিরুদ্ধে জেহাদ চালানো এবং কয়েকজন লোকের উপর প্রতিহিংসা জীইয়ে রাখা।

হাইকমাণ্ড কোন পথে ?

সেপ্টেম্বর মাসের গোড়া থেকে সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারা কংগ্রেসের কাছে পথের দিশা ও আলো প্রত্যাশা করে থাকে তারা মানসিক বিভ্রান্তি ও বিহ্বলতার মধ্যে দিয়ে সময় কাটাচ্ছে। যুদ্ধের উপরে হরিপুরা কংগ্রেসের প্রস্তাবকে আগে অভ্রান্ত পথনির্দেশ বলে গণ্য করা হত এবং স্বভাবত সবাই আশা করেছিল, সঙ্কট দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে অবিলম্বে প্রস্তাবটি কার্যকর করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। কিন্তু তা হয়নি। প্রথমে দেরি হয়েছে। পরে দক্ষিণপন্থী মহলে অস্পষ্ট কানাঘুষা চলতে লাগল যে, পরিবর্তিত অবস্থায় ঐ প্রস্তাব অচল হয়ে গেছে। ফলে দেখা দিয়েছে দ্বিধা সংশয় এবং অধিকতর নিষ্ক্রিয়তা।

বিস্ময় ও বিভ্রান্তির জায়গায় দেখা দিল চরম হতবুদ্ধিতা। কংগ্রেসের কাছ থেকে পথচলার নির্দেশ নিতে যারা অভ্যস্ত তাদের মানসিক অবস্থা সহজেই কল্পনা করা যায়। তারা কী করবে? যে হরিপুরা প্রস্তাব প্রত্যক্ষ পথনির্দেশরূপে কাজ করতে পারত বিনা ভনিতায় সেটিকে ধামা চাপা দেওয়া হল এবং তার জায়গায় আর কিছু দেওয়াও হল না। একথা ঠিক, সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বাগাড়ম্বরে ঠাসা এক প্রস্তাব প্রসব করেছে যাকে আমাদের আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের (?) মধ্যে কেউ কেউ "সারা দুনিয়ার কাছে একটি দৃষ্টান্ত" অথবা "পরাধীন জাতিসমূহের স্বাধীনতার সনদ" বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন—কিন্তু প্রস্তাবটি খুঁটিয়ে দেখলে কেবলমাত্র কথা ছাড়া বিশেষ কিছুই তাতে খুঁজে পাওয়া যায় না। কথার আড়ম্বরের আড়ালে আসল বস্তুর অস্তিত্বই নেই। কংগ্রেস কী করবে ঠিক করেছে, যদি যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের জবাব মনঃপুত ও আশানুরূপ না হয়?

প্রস্তাবটির বীরত্বব্যঞ্জক ভাষা থেকে সরলমতি পাঠক স্বাভাবিকভাবে বীরোচিত কার্য আশা করেছিল। কিন্তু প্রস্তাব প্রণেতাদের

অভিপ্রায় কি সেইরকম বীরোচিত ছিল ? দক্ষিণপন্থী মহলে খুব আশা ছিল, সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া যাবে এবং তার ফলে সঙ্কট এড়ানো যাবে। এই ধরনের আশা পোষণ করার কী যুক্তি ছিল তা বোঝা ভার। রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞানের অধিকারী এমন কেউই নির্দিষ্ট অবস্থা সন্নিবেশে আশাবাদী হতে পারে না। তা সত্ত্বেও, ঘটনা এই যে, বেশ কিছু পরিমাণ আশাবাদ দেখা দিয়েছিল, যা অক্টোবর মাসে বড়লাটের ঘোষণায় ধূলিসাৎ হয়ে যায়। আমাদের মন্ত্রীদের মধ্যে কারও কারও বিবৃতিতে হাহুতাশের ভাব রয়ে গেছে এবং তা পড়তে অসহ্যবোধ হয়।

এই একবার কার্যক্ষেত্রে তৎপরতা দেখা গেল। বড়লাটের বিবৃতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছ থেকে সাড়া পাওয়া গেল এবং আমাদের মন্ত্রীদের কাছে পদত্যাগ করার নির্দেশ গেল। যে প্রণালীতে এই কাজটা করা উচিত ছিল সে সম্পর্কে যদিও আমরা ভিন্ন মত পোষণ করি, তবুও এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, যে-সংগঠনের উপর জাতির সম্মান রক্ষার দায়িত্ব রয়েছে মন্ত্রীদের পদত্যাগ করার নির্দেশ দিয়ে সেই সংগঠন যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। কংগ্রেসের পক্ষে এইটুকু যৎসামান্য যা না করলে নয়, কিন্তু তার যা করা উচিত ছিল, এইটুকুতেই তা শেষ হয়নি।

বড়লাটের বিবৃতি আমাদের দক্ষিণপন্থী বন্ধুদের নিরাশ ও অবাক করেছে। এবারে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগে ব্রিটিশ সরকারের এবং বড়লাটেরও অনুরূপ ভাববার পালা। সরকারী মহলে মন্ত্রীদের পদত্যাগ কেন নৈরাশ্য ও বিস্ময় উৎপাদন করেছে, বিপরীতপক্ষে কেন তা অনিবার্য বলে ধরে নেওয়া হয়নি, এটি একটি বিবেচ্য প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর যাই হোক না কেন, আসল ব্যাপারটি অত্যন্ত পরিষ্কার। তবে অনুমান করা যেতে পারে, কয়েকটি কারণের সমাবেশ থেকে ব্রিটিশ সরকার ভেবে নিয়েছিল যে, কংগ্রেস লড়াইয়ে নামবে না। সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ার দিকে সরকারের সঙ্গে বিনাশর্তে সহযোগিতা করার মনোভাব জ্ঞাপন করে মহাত্মা গান্ধীর বিবৃতি, দক্ষিণপন্থীদের

বিশেষ করে মন্ত্রীমহলের মনোভাব, দক্ষিণপন্থীদের আয়ত্তাধীন কংগ্রেস কমিটিগুলিতে প্রস্তুতির অভাব—এইগুলির এবং এদের সঙ্গে আরও অন্যান্য কারণের একটিমাত্র অর্থ ও তাৎপর্য থাকা সম্ভব, এবং দিল্লীর ও হোয়াইট হলের কর্তৃপক্ষের পক্ষে এই অনুমান করা স্বাভাবিক যে, কংগ্রেস ফ্রণ্টে সব কিছু শান্ত থাকবে। এই অনুমান যুক্তিসঙ্গত, তবে এতে একটি হিসাবের ভুল ছিল। কংগ্রেস স্থিতিধর্মী নয়, কিংবা সম্পূর্ণভাবে একমতাবলম্বীদের সংস্থাও নয়। অতএব কংগ্রেসের ভিতরে যারা আছে তাদের পক্ষে কংগ্রেসকে প্রভাবিত করা সম্ভব এবং এমন কাজ করানোও সম্ভব যা বাইরের লোকের কাছে কংগ্রেসের স্বীকৃত পন্থার ব্যতিক্রম বলে অথবা, কিছু না হোক, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা বলে মনে হতে পারে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রীদের পদত্যাগকে দেখলে সাধারণ লোকের কাছে বা বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা বলে গণ্য নাও হতে পারে। অতএব সে তার সাধারণ বুদ্ধি অনুযায়ী তার 'সাদামাটা' ন্যায়বুদ্ধি মতে আশা করবে, এই কাজ থেকে যুক্তিসঙ্গত পরিণামের দিকে এগিয়ে যেতে যা কিছু করা দরকার সবই করা হবে। তুরীয় ন্যায়বুদ্ধি—কথাটা যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি—তার ধারণা বদলাতে পারবে না, এবং এই সঙ্কটময় মুহূর্তে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যদি ভারতের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার অভিপ্রায় না থাকে তবে তাদের এই মৌলিক সত্যটি প্রণিধান করা কর্তব্য। বিচক্ষণতা ও সতর্কতার নামে, এমনকি সত্য ও অহিংসার দোহই দিয়ে যা কিছু ওজর আপত্তি, গুরুত্ব হ্রাস করার পক্ষে যা কিছু কৈফিয়ত এখন পেশ করা হচ্ছে, কিছুতেই সাধারণের এই দাবি বিন্দুমাত্রও শিথিল করতে পারবে না যে, আজ আমরা যতই দুরবস্থায় পতিত হই না কেন, আমাদের সম্মান ও স্বার্থের কথা বিবেচনা করে কংগ্রেসকে তার লক্ষ্য-পথে এগিয়ে যেতে হবে। জাতির আত্মার এই প্রাথমিক দাবিকে কেবলমাত্র আমাদের সমূহ সর্বনাশের' বিনিময়েই অগ্রাহ্য করা যেতে পারে।

জনসাধারণ একটি প্রগতিশীল নীতি ও পন্থা চাইছে অথচ মহাত্মা গান্ধী গত বারো মাস কিংবা তারও বেশীদিন ধরে দৃঢ়তার সঙ্গে তা বাধা দিয়ে আসছেন। তাঁর মতের সমর্থনে বাঁধাধরা যে যুক্তি পেশ করা হয়েছে সেই যুক্তি প্রধানত দুটি—প্রথমত, কংগ্রেসের মধ্যে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে এবং দ্বিতীয়ত, জাতীয় সংগ্রাম যদি শুরু করা হয় তাহলে হিংসার প্রাদুর্ভাব অনিবার্য। আমরা অতীতে অনেকবার বলেছি, এই সব যুক্তির অকাট্যতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে এবং কোন ক্ষেত্রেই আমাদের অগ্রগতিকে প্রতিহত করার কৈফিয়ত হিসেবে ঐ যুক্তিগুলি ব্যবহার করা যেতে পারে না।

সেপ্টেম্বর মাসের শুরু থেকে ওই যুক্তিগুলির সঙ্গে তৃতীয় একটি যুক্তি যোগ করা হল—যথা, আইন অমান্য শুরু করলে তার পরে পরেই হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা বেধে যাবে, ইত্যাদি। এর চেয়ে ভুল বা বাজে যুক্তি কিছু কল্পনা করা যায় না। যে হিন্দু মুসলমানদের এইরকম গুরুতর অপবাদের ভাগী করা হল, আমরা নিঃসন্দেহ যে, তারা দৃঢ়তার সঙ্গে এই অভিযোগ অস্বীকার করবে। আমাদের যা ধারণা ও সংবাদ তাতে মনে হয়, কংগ্রেসের তরফে তৎপর হয়ে এগিয়ে গেলে বর্তমান সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের রীতিমত উন্নতি হবে এবং এই দুটি সম্প্রদায় পরস্পরের এত কাছে আসবে যা পূর্বে কখনও সম্ভব হয়নি।

আপনারা যদি এগিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত না হন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় খোলাখুলিভাবে তা বললেই তো হয়! যে সব যুক্তিতর্ক ধোপে টেকে না তাই দিয়ে প্রসঙ্গটাকে অস্পষ্ট করার কারণ কী?

বামপন্থীদের পথ একেবারে সুস্পষ্ট এবং তা একাধিকবার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তৎপর হয়ে যদি এগিয়ে না যায়, আমরা যাব। মহাত্মা গান্ধী বা ওয়ার্কিং কমিটি যত ভয়ই দেখান না কেন, কিছুতেই আমাদের দমাতে পারবে না। এবং যদি তাঁরা বাধা দিতে আসেন, সাহসের সঙ্গে আমরা সেই বাধার সম্মুখীন হব।

কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি যদি সময় উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করে, আমরা অনুগত সৈনিকের মত তার সঙ্গে থাকব। মুহূর্তের মধ্যে যা কিছু মতবিরোধ বিলুপ্ত হবে এবং কংগ্রেসকর্মীরা সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংসগঠিত একটা ব্যূহে সন্নিবদ্ধ হবে।

তাদের সঙ্গে লড়াই কার ?

সকালে কাগজগুলো দেখতে দেখতে কতকগুলো পরস্পরবিরুদ্ধ ব্যাপার আমার চোখে পড়ল। প্রথম পৃষ্ঠায়—এবং সম্ভবত (সংবাদের) গুরুত্ব অনুযায়ী—রয়েছে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব সম্পর্কে প্রস্তাব। তারপরে আছে রামগড় কংগ্রেসের সময়সূচী। অতঃপর দেখা গেল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উপর দীর্ঘ এক প্রস্তাব।

প্রথম প্রস্তাবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যটি এই : "ওয়ার্কিং কমিটি সম্মানজনক আপসে উপনীত হইবার জন্য সর্বতোভাবে প্রয়াস চালাইয়া যাইবে, যদিও ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের মুখের উপর দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।" যা ব্যাখ্যা করে বললে দাঁড়ায় : "আমরা ব্রিটিশ সরকারের পদলেহন করিয়া যাইব যদ্যপি তাহারা আমাদিগকে পদাঘাত করিয়াছে।"

আমরা যে রাজনীতি বুঝি অথবা আধুনিক জগৎ যে রাজনীতি বোঝে এ তা নয়—তবে সম্ভবত এ রাজনীতি বাইবেলী বা বৈষ্ণব ঐতিহ্য-সম্মত। এই প্রকার নীতি একজনের বা জনকয়েকের মনোমত হতে পারে—কিন্তু তা কি সমগ্র জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য, যে-জাতির কাছে কয়েকজনের খামখেয়ালীর চেয়ে, যে-স্বাধীনতা তার জীবনমরণ প্রশ্ন, সেই স্বাধীনতা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ? যে নীতি বলে, যে-পদ-যুগল আমাদের পদাঘাত করছে সেই পদযুগল আমাদের লেহন করতে হবে, সেই নীতি ভারতীয় জনগণ প্রত্যাখ্যান করে কিনা তা দেখা এখনও বাকী আছে।

একই প্রস্তাবে নিম্নলিখিত অংশ আছে : "ওয়ার্কিং কমিটি ইহা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতে চায় যে, আইন অমান্যের জন্য সত্যকার প্রস্তুতির নিরিখ হইবে কংগ্রেসকর্মীদের নিজেদের চরকা চালানো, মিলের কাপড় পরিহার করিয়া খাদির আদর্শের পোষকতা করা

এবং নিজেদের সম্প্রদায়ের লোককে ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের লোককে ব্যক্তিগতভাবে সেবা করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করাকেই তাহাদের কর্তব্য বলিয়া মনে করা এবং কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে যাহারা হিন্দু তাহাদের দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে যত বেশী সম্ভব হরিজনদের সহিত ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা। অতএব কংগ্রেস সংগঠনগুলি এবং কংগ্রেসকর্মীরা এই কার্যক্রম অনুসরণ করিয়া ভবিষ্যৎ কর্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুত হইবে।...”

প্রস্তাবের এই অংশে এসে আমরা বারবার চোখ রগড়ালাম, আরেকবার ভালো করে কাগজের তারিখটা দেখলাম, নভেম্বর ২৪, ১৯৩৯। অতএব ১৯৩৯-এর এই শুভবর্ষে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মত সুপ্রতিষ্ঠিত ও গুরুত্বসম্পন্ন একটি রাজনৈতিক পার্টি দেশকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করতে এইপ্রকার অত্যাশ্চর্য এক পরিকল্পনা উপস্থাপিত করতে পারে। স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকাভুক্ত করার কথার উল্লেখ নেই—প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কার্যক্রমের জন্য কর্মীর কথা নেই। মহত্তর আত্মশক্তির কাছে কোন আবেদন নেই—যে আবেদনে প্রতিটি শিরায় রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং নিগ্রহ ও দুঃখভোগ করার জন্যে মানুষকে যা অসমসাহসিক করে তোলে। অর্থসংগ্রহের জন্যও একটি কথাও নেই, হিংস্র বা অহিংস যে কোন যুদ্ধের পক্ষে যা অপরিহার্য। অন্যান্য অনাবশ্যক ব্যাপার স্থগিত রেখে সংগ্রামের জন্য তৈরি থাকারও কোন নির্দেশ নেই। তার বদলে আমাদের বলা হল ডেলিগেট নির্বাচন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ইত্যাদি সহ রামগড় কংগ্রেসের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে হবে—যেন কিছুই ঘটেনি বা ঘটবে না। কিন্তু ভারতের জনসাধারণ কিছুদিন আগে পর্যন্ত রাজনীতি বিষয়ে যতটা সরল ও অজ্ঞ ছিল এমন আর তা নেই। আজকের দিনে একটা শিশুও কি এ কথা জানে না যে, যুদ্ধের জরুরী অবস্থায় যে কোন সরকার বা পার্টি প্রথম যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা হল অনির্দিষ্ট-কালের জন্য নির্বাচন মুলতুবী রাখা ?

এই পটভূমিকায় জাজ্বল্য হয়ে দেখা দেয় ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ সহ

ওয়ার্কিং কমিটির বিশিষ্ট সদস্যগণ কর্তৃক মাঝে মাঝে প্রদত্ত এই মর্মে বিবৃতি যে, তাঁরা বিশ্বাস করেন এবং আশা করেন কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পক্ষে শীঘ্রই সরকারী গদিতে অধিষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর হবে। এইরকম পরিবেশে এবং এইরকম জরুরী অবস্থার মধ্যেও কী প্রত্যাশা নিয়ে ছলছল চোখে শূন্য আসনগুলির জন্যে তাঁদের এখনও চিন্তাকুল থাকতে হচ্ছে। ভেবে অবাক হতে হয় তাঁদের কি জাতীয় আত্মমর্যাদা বোধ সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যাচ্ছে। ভারতের যে এককালীন বিপ্লবী, যে প্রাক্তন বামপন্থী নেতা এককালে গুণমুগ্ধ জগতের সামনে দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন, কোন অবস্থাতেই তিনি বাম বা দক্ষিণ একমতাবলম্বী কোন কেবিনেটেই আসন গ্রহণ করবেন না, এই মর্মান্তিক পরিবেশের মধ্যে তাঁর একক অবস্থানের কথা স্মরণ করে বিস্ময় ও বেদনার অবধি থাকে না। বর্তমানে যখন তিনি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম এবং দেশের বামপন্থী আন্দোলনের সম্পূর্ণ বিরোধী—তাঁর এই অবস্থার সঙ্গে ওই গুরুগম্ভীর ঘোষণাকে কী করে মেলানো যায় কে আমাদের তা বলে দেবে ?

অতএব অপরের বিরক্তিভাজন হবার বিপদ থাকা সত্ত্বেও আমাদের নির্মমভাবে স্পষ্টবাদী হতে হবে এবং যা উচিত তা খোলাখুলি বলতে হবে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই গুরুতর সময়ে অপরের মুখ রক্ষা করে চললে কোন লাভ হবে না। ওয়ার্কিং কমিটির এই সব প্রস্তাব নিছক বাগাড়ম্বর, এদের একমাত্র উদ্দেশ্য দেশের সরল মানুষদের ধোঁকা দেওয়া ও চোখে ধুলো দেওয়া। এক বছর কিংবা আরও বেশীদিন ধরে মহাত্মা গান্ধী আমাদের নিয়মিত বলে চলেছেন যে, জাতীয় কংগ্রেসের কথা উঠতেই পারে না এবং দেশ তার জন্যে তৈরি নয় ;—যদিও এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় নি, অপ্রস্তুত কে, দেশ, না ওয়ার্কিং কমিটির উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করা। মহাত্মা যদি শুরু থেকে সংগ্রামের পক্ষে থাকতেন আজকের বাম ও দক্ষিণের মধ্যে যে বাদবিবাদ তার অনেকটাই একেবারেই দেখা দিত না। অতএব, গত বারো মাস ধরে তিনি যা কিছু বলে আসছেন এবং সমর্থন করেছেন এত বিলম্বে তিনি

যে তার থেকে হটে আসবেন তা আশা করা দুরাশা। অবস্থার বিপাকে এবং জনমতের চাপে বাধ্য হয়ে তিনি অনেক কিছু করতে পারেন, কিন্তু তাঁকে দিয়ে দেশব্যাপী সংগ্রাম শুরু করানো যাবে না। সাঁতারে শক্তি পরীক্ষার জন্যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়া এক কথা, কিন্তু জল দেখে যখন হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে তখন পিছন থেকে ধাক্কা খেয়ে জলে পড়া একেবারে অন্য কথা। ১৯২১ সালের ইয়ং ইণ্ডিয়া-য় উদ্দীপনাময় প্রবন্ধগুলির সঙ্গে ইদানীং সাপ্তাহিক কাগজ হরিজন-এ যে পদার্থ প্রকাশ হচ্ছে তার তুলনা করে দেখুন, পার্থক্যটা সঙ্গে সঙ্গে আপনার নজরে পড়বে। আমরা যে জগতে বাস করছি তা নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং জগতের পরিবর্তনের সঙ্গে সেই জগতের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটছে।

আজকের সমস্যা কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করার সমস্যা নয়। সে সংগ্রাম সাফল্যের সঙ্গে চালাতে হবে—যদি একান্ত তা শুরু করতে হয়—অন্যথা তা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম হবে না, তা হবে বিশ্বাসঘাতকতা। সেই সংগ্রামকে চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাওয়ার এবং মধ্যপথে সংগ্রাম পরিহার না করার প্রশ্নও এই সঙ্গে জড়িত। আরেক-বার স্পষ্টভাষী হয়ে একথা আমরা বলে রাখতে চাই যে, বর্তমান ওয়ার্কিং কমিটি যদি প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরুও করে, বামপন্থীদের মনে এই আশঙ্কা থেকে যাবে যে, যে কোন সময়ে চৌরিচৌরা বা হরিজন আন্দোলন, অথবা তাদেরই কোন নব্যরূপ দেখা দিতে পারে এবং শক্তিতে ও ব্যাপকতায় আন্দোলন যখন গুরুতর আকার ধারণ করবে তখন তাকে বন্ধ করে দেবার প্রয়াস হতে পারে।

আমাদের প্রশ্ন করা হতে পারে, এই আশঙ্কা কি যুক্তিসঙ্গত? অবশ্যই, তা না হলে যুদ্ধ ঘোষণা হবার পরেও বামপন্থীদের বিরুদ্ধে হিংস্র জেহাদ পুরোমাত্রায় চালিয়ে যাওয়া হত না। সমস্ত প্রদেশ থেকে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে এই জেহাদের খবর নিয়ত আসছে এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের ক্ষেত্রে তা প্রতিহিংসায় পর্যবসিত হয়েছে। স্বভাবতঃ ওয়ার্কিং কমিটির যা কিছু আক্রোশ বাংলাদেশে কেন্দ্রীভূত এবং

বাংলাদেশের কার্যভার প্রেসিডেন্ট নিজে গ্রহণ করেছেন। প্রদেশের সর্বত্র জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যে কোন সুদূর প্রান্ত থেকে যে কেউ সরাসরি ওয়ার্কিং কমিটি বা প্রেসিডেন্টের কাছে একটা অভিযোগ পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে যে, তাতেই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে জবাবদিহির জন্যে তলব করা হবে। অতএব যারা নিরপেক্ষ দর্শক তারা সংবাদপত্রের দীর্ঘ বিবৃতিগুলিতে দেখে থাকে একতা ও নিয়মনিষ্ঠার আদর্শের প্রতি কেবলমাত্র মৌখিক বন্দনা, যখন কার্যক্ষেত্রে চলে কংগ্রেসের ভিতরকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের দমন এবং নির্যাতন। ব্রিটিশ সরকারের বেলায় আপনারা বড়লাটের বাড়িতে বারেবারে সেলাম জানাতে যেতে পারেন এবং যে পা আপনাকে লাথি মারে সেই পা লেহন করতে পারেন। অথচ আপনাদের বামপন্থী সহকর্মীদের বেলায় সবকিছু সত্ত্বেও আপনারা আপনাদের সত্য ও অহিংসা নীতি অনুযায়ী সঙ্গতভাবেই সর্বপ্রকার সহিষ্ণুতা, সদ্ভাব ও উদারতা প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকতে পারেন এবং পূর্ণ আক্রোশে ও হিংস্রতার সঙ্গে প্রতিহিংসা নীতি চালিয়ে যেতে পারেন।

এই জঘন্য কাহিনী কী নীতি শিক্ষা দেয়? তা এই যে, দক্ষিণ-পন্থীদের কাছে ভারতের বামপন্থী আদর্শের তুলনায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কম শত্রু। শেষেরটির সঙ্গে আপনারা আপসে আসতে পারেন, কিন্তু প্রথমের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যদি ভারতের বামপন্থীদের উপর আঘাত হানে, আমাদের দক্ষিণপন্থী বন্ধুরা সম্ভবতঃ তার জন্যে দুঃখবোধ করার কোন কারণ পাবেন না।

"ভারত যদি স্বাধীন হয় / আমরা তারে করব স্বাধীন / আমরা ছাড়া আর কেহ নয়" বাংলায় এই ধরনের একটা ছড়া আছে। আমাদের দক্ষিণপন্থীরা আজ এই মতই ভাবছে।

আমাদের ওয়ার্কিং কমিটি

২রা ডিসেম্বর, ১৯৩৯এ 'ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

২৪শে নভেম্বর এবং পরবর্তী কয়েকদিন কলিকাতায় ফরওয়ার্ড ব্লকের সারা ভারত ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক বসে। সারা ভারত কিসানসভা এবং ন্যাশনাল ফ্রন্ট গ্রুপের মত বামপন্থী সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা নিমন্ত্রিত হয়ে তাতে যোগ দেন এবং তাঁদের উপস্থিতি ও পরামর্শ খুবই সহায়ক হয়। স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী যিনি একাই একশো, সারা ভারত কিসান সভার সাধারণ সম্পাদক হওয়া ছাড়াও তিনি ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের প্রকাণ্ড এক ভরসাস্থল। এক পক্ষকালের মধ্যে তিনি অনুগ্রহ করে দুবার কলিকাতায় এসেছেন, দ্বিতীয়বার তিনি আসেন আমাদের সারা ভারত ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং উপলক্ষ্যে। কমিটি অনেক চিন্তা করে অনেক বিচার-বিবেচনা করে কম বেশী গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়ের উপর ষোলটি প্রস্তাব অনুমোদন করে। দৈনিক পত্রিকায় এই প্রস্তাবগুলি ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, তবু এই সঙ্গে এই সংখ্যায় সেগুলি প্রকাশ করা হচ্ছে।

প্রধান প্রস্তাবটি ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির উপরে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যুদ্ধনীতি এবং ভারতের জাতীয় দাবির প্রধান প্রধান বিষয়গুলি সম্পর্কে যে মনোভাব গ্রহণ করেছে এই প্রস্তাবে তা অত্যন্ত বিশদভাবে পরীক্ষা করা হয় এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে কমিটির বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হয়। এই প্রস্তাবটির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। এর মুখ্য বক্তব্য এই যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কী করতে চায় ও তার কী মনোভাব এখনও পর্যন্ত প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে বলা হয়নি, যার ফলে সাধারণ মানুষ যথেষ্ট সংশয়ের মধ্যে রয়েছে। এই কমিটির সদস্যদের এবং মহাত্মা গান্ধীরও কোন কোন উক্তি ও বিবৃতি থেকে মনে হয় তাঁরা সংগ্রাম চাইছেন। অপরগুলি থেকে বিপরীত ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে—যেমন, মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্য যে, আইন

অমান্য যদি শুরু করা হয় তবে তিনি তাতে বাধা দেবেন এবং মাদ্রাজের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারির উক্তি যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীরা তিন মাসের ছুটি ভোগ করছে। এইসব মন্তব্য ছাড়াও মাঝে মাঝে যে সব খবর এসে পৌঁছচ্ছে তাতে এই ধারণাই দৃঢ় হয় যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি শেষ পর্যন্ত সংগ্রামের পথে যাবে না। যেমন বিহার থেকে খবর পাওয়া যাচ্ছে, সম্প্রতি মন্ত্রীদের গদিত্যাগের পর থেকে যে উপদেষ্টারা প্রশাসন চালিয়ে যাচ্ছে তারা কোন কোন ক্ষেত্রে আদেশ দিচ্ছে যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীরা আবার ক্ষমতায় ফিরে আসলে ফাইলপত্র যেন তাঁদের কাছে পেশ করা হয়।

ফরওয়ার্ড ব্লক একাধিকবার সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, যদি এমন হয় যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছ থেকে যে নির্দেশ প্রত্যাশিত, সেই নির্দেশ তাঁরা না দেন, তাহলে ব্লকই তা দেবার প্রয়াস করবে—যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে ডাক দেবার পক্ষে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে ভালো হয় কংগ্রেসের নামে সেই ডাক পাঠানো। এখন বিবেচ্য বিষয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি শেষপর্যন্ত কী সিদ্ধান্ত নেবে। এমন কোন অভিযোগের যেন অবকাশ না থাকে যে তাঁরা ডাক দেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, আর কেউ তাঁদের তা দিতে দেয়নি। এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বলে আসছে আর সবাইকে অপেক্ষা করতে এবং সাধারণের দাবি যাতে তাঁরা পূরণ করতে পারেন সেইজন্যে তাঁদের সুযোগ দিতে। কিন্তু আমাদের ধৈর্যের একটা সীমা থাকা উচিত। অতএব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যত শীঘ্র সম্ভব এস্‌পার-ওস্‌পার যাহোক একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে জানিয়ে দিলে, সংশ্লিষ্ট সবার পক্ষেই মঙ্গল।

অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের মত আমাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা এখন আমাদের বিরুদ্ধে দুমুখো রটনা চালিয়ে যাচ্ছে। মহাত্মা গান্ধী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করার হুমকি দেওয়ার জন্যে আমাদের উপর দোষারোপ করা হচ্ছে। আবার ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করার দরুনও আমাদের বিরুদ্ধ

সমালোচনা শুনতে হচ্ছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা জনসভায় নাকি প্রকাশ্যভাবে আমাদের চ্যালেঞ্জ করেছেন আমরা যেন এগিয়ে গিয়ে সংগ্রাম শুরু করে দিই। দু ধরনের আক্রমণেই আমরা অবিচলিত, কারণ, আমাদের সমালোচকরা যতই ভুরু কোঁচকান বা মুচকি হাসুন, কোন কর্মপন্থা আমাদের জাতীয় কল্যাণের পক্ষে সবচেয়ে হিতকর হবে আগে আমাদের তা ভেবে ঠিক করে নিতে হবে।

ফরওয়ার্ড ব্লকের বিঘোষিত মনোভাবকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রতি হুমকি বা চ্যালেঞ্জ বলে প্রতিপন্ন করা ঠিক নয়—কারণ তার মনোভাব তা নয়। সেই কারণেই বারেবারে একথা বলা হয়েছে যে, সব দিক রক্ষা হয় যদি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এগিয়ে আসে এবং তার পিছনে থাকে অবিভক্ত কংগ্রেস। তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব কংগ্রেস ওর্য়াকিং কমিটিকে ঠিক পথে চলতে বাধ্য করেছে এবং করবেও। কে এখন বলতে পারে, ওয়ার্কিং কমিটি সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ বাধবার পর কী সিদ্ধান্ত নিত কিংবা কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলি এর মধ্যে পদত্যাগ করত কিনা, যদি বামপন্থীরা যুদ্ধনীতি ও জাতীয় দাবির উপর দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ না করত।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর প্রস্তাবটিও গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু তাতে সুস্পষ্টভাবে বিশ্বের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাদের মনোভাব বিবৃত হয়েছে। ইওরোপে আমরা যে গোলযোগ এখন দেখতে পাচ্ছি তার জন্যে মূলতঃ যে গ্রেটব্রিটেন ও ফ্রান্স দায়ী, এটি সাধারণত স্বীকার করা হয় না। এই দুটি দেশই সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি অদম্য ঘৃণার বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন প্রকারে ফ্যাসিজমকে ইন্ধন জুগিয়েছে এবং ইওরোপের রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে সোভিয়েত রাশিয়াকে উৎখাত করার চেষ্টা করে এসেছে। এছাড়াও জার্মানীকে বেষ্টনীবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স প্রধানত এম. লাভাল-এর প্রচেষ্টায় ইওরোপীয় ভূখণ্ডে বহু যত্নসাধ্য বিস্তারিত যে মৈত্রীচুক্তির ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল গোপনে তার বিরোধিতা এবং শেষ পর্যন্ত তা বিনষ্ট করার

জন্যে গ্রেটব্রিটেনই দায়ী। সুতরাং ফ্রান্স নির্বীর্য হয়ে গেল এবং স্বভাবত ব্রিটেনের শরণাপন্ন হল। তার ফলে রাশিয়া, জার্মানী এবং ইটালীর বাইরে যে ইওরোপ, আজ তা ব্রিটিশ বৈদেশিক নীতির দ্বারা শাসিত হচ্ছে। রাশিয়া একাগ্রভাবে বরাবর চেষ্টা করে এসেছে যাতে গ্রেট-ব্রিটেন, ফ্রান্স এমনকি পোল্যাণ্ডের সঙ্গেও একটা বোঝাপড়ায় আসা যায়। এই প্রয়াসের চরম ব্যর্থতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হবার পরই রাশিয়া জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করে। বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে সাম্প্রতিক কয়েক মাসে সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে এম. মলোটোভ-এর বিবৃতিগুলি প্রাঞ্জলতা ও বক্তব্যের সুস্পষ্টতার জন্যে প্রণিধানযোগ্য এবং সমস্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের কাছে দৃষ্টান্ত হওয়া উচিত।

ফরওয়ার্ড ব্লকের সারাভারত কমিটির সম্পাদক এবং প্রাদেশিক কমিটির প্রেসিডেন্ট ভি. ডি. ত্রিপাঠির সাম্প্রতিক গ্রেপ্তার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা আগে থেকে যা জানতাম তা সাধারণের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল—যথা—ফরওয়ার্ড ব্লকের বিরুদ্ধে দমননীতি পুরোদমে চলেছে। ত্রিপাঠীজীকে উত্তরপ্রদেশে তাঁর নিজের জেলা উনাও-এর মুকুটহীন রাজা বললে আখ্যাটি শোভন না হলেও অত্যন্ত সঙ্গত হয়। ফরওয়ার্ড ব্লকে তাঁর প্রতিষ্ঠা ছাড়াও তিনি উনাও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, উত্তরপ্রদেশ বিধানসভার সদস্য। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একসিকিউটিভ কমিটির সদস্য, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির, উত্তরপ্রদেশ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ওয়ার কাউন্সিলের সদস্য। এই রকম অসামান্য প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন নেতাকে গ্রেপ্তার করার মর্মার্থ এই ঘটনাতেই নিহিত।

ফরওয়ার্ড ব্লকের সারাভারত 'ওয়ার্কিং কমিটি আর যে-সব প্রস্তাব গ্রহণ করেছে তাতে বোঝান হয়েছে আমাদের উপর নানাদিক থেকে আক্রমণ চলেছে। একদিকে সরকারী নিপীড়ন, অন্যদিকে কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের অপ্রসম্য প্রতিহিংসা। ঠিক এই মুহূর্তে প্রথমের থেকে শেষেরটিই বেশীমাত্রায় বিড়ম্বনার কারণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু উভয়ের আক্রমণই আমরা কাটিয়ে উঠব।

বাংলার রাজনৈতিক বন্দীদের উপর প্রস্তাবটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রচিত হয়েছে। এতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লকও একই অঙ্গীকারে আবদ্ধ! সেই অঙ্গীকার পালন করা হবে না এমন আশঙ্কা করার কোন কারণ নেই। পৃথক প্রশ্ন হিসেবে হোক, অথবা সর্বভারতীয় প্রশ্নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবেই হোক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবে এবং এই কাজে তা ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করবে।

বিভিন্ন প্রসঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্কে প্রস্তাবগুলি বিশেষত মুসল-মানদের মনোযোগ ও প্রণিধান দাবি করে। হিন্দুমুসলমান সমস্যাকে আমরা কীভাবে দেখছি তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মজলিস্-ই-অহ্‌রর সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রস্তাব একান্ত দরকার ছিল, কারণ অহররদের প্রতি যতখানি দৃষ্টি দেওয়া বাস্তবিক উচিত ছিল দুর্ভাগ্যক্রমে তা দেওয়া হয়নি।

পরিশেষে, এখন থেকে সংশ্লিষ্ট সকলে যেন খেয়াল রাখেন যে, ১৯৭০ সালের ২৬শে জানুয়ারি পরবর্তী স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ একটি তাৎপর্য থাকবে। আমাদের ওয়ার্কিং কমিটি এই ব্যাপারেরও উল্লেখ করেছে।

আবার গর্জন

৯ই ডিসেম্বর ১৯৩৯-এ 'ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' তার প্রথাসিদ্ধ ভূমিকা থেকে কিছুদিন সরে দাঁড়াবার পর, পুনরায় তার নিজ মূর্তি ধারণ করেছে। সাময়িক এই স্বধর্মচ্যুতির সময় দেশের ভিতরকার ও বাইরেকার ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনায় সে সামঞ্জস্য, মর্যাদা ও সুষম বোধের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু নিজের স্বধর্মে ফিরে আসার পরই সে যেন পাগলা কুকুরের মত ক্ষেপে উঠেছে। একটি ব্যাপারে কিন্তু 'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' বরাবর নিয়মনিষ্ঠ, বর্তমান লেখক সম্পর্কে তার গভীর বিদ্বেষ ও ঘৃণার ভাব পোষণে। অধিকাংশ ইংরেজদের সঙ্গে তার এক বিষয়ে গরমিল, 'ফ্রেণ্ড' রাজনীতিতে সোজাসুজি স্পষ্টোক্তি বরদাস্ত করতে পারে না, যারা তোষামোদ করে, পদলেহন করে, তারাই তার প্রিয়।

এইটুকু শুধু আশা করা যেতে পারে, ভারতে সরকারী বা বেসরকারী যে সব ইংরেজ আছে তাদের যথার্থ মনোভাব 'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'য় প্রতিফলিত হয় না। যদি তা হয়, তাহলে তাদের সম্পর্কে বাস্তবিক হেয় ধারণা পোষণ করতে হবে। তারা এত অস্থির-মতি, এত খামখেয়ালী, রাজনৈতিক হাওয়া যেই বদলাচ্ছে অমনি তাদের মতও পাল্টিয়ে যাচ্ছে—কল্পনা করতেও কষ্ট হয়। মাসের পর মাস ধরে আমাদের 'ফ্রেণ্ড' ভারত সম্পর্কে উদার ও প্রগতিশীল নীতি গ্রহণ করার সপক্ষে বলে আসছিল। কিন্তু অক্টোবর মাসে বড়লাটের বিবৃতি বার হবার প্রাক্কালে হঠাৎ তাকে দেখা গেল গোঁড়া রক্ষণশীল হয়ে উঠেছে। তার পর থেকে তার মেজাজ কখনও গরম কখনও নরম।

যুদ্ধ বাধবার আগে 'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' বৈদেশিক ব্যাপারে ছিল আশ্চর্য ওয়াকিবহাল, যদিও তার বৈদেশিক নীতি সব মহলের যে অনুমোদন লাভ করত তা নয়। আগেকার দিনে 'ফ্রেণ্ড' ছিল হাড়ে-

মজ্জায় সোভিয়েত-বিরোধী। কিন্তু নাৎসীদের ক্ষমতা লাভের পরে রাশিয়ার প্রতি এবং রাশিয়া সংক্রান্ত সব কিছুর প্রতি তার বিদ্বেষ বেশ হ্রাস পায়। ক্রমশ সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি কিছুটা দরদ সবার নজরে পড়তে থাকে এবং পত্রিকাটির আক্রোশের লক্ষ্য হয়ে ওঠে নাৎসী জার্মানী। ইওরোপে যুদ্ধ বাধবার পরেও, এমনকি পূর্ব পোল্যাণ্ড সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হবার পরেও এই প্রবণতা বজায় থাকে। কিন্তু ফিনল্যাণ্ড ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে লড়াই বাধবার পর থেকে, আমাদের 'ফ্রেণ্ড'এর মাথা খারাপ হয়ে গেছে এবং সে যা লিখে চলেছে তা দায়িত্বশীল স্থিতধী সাংবাদিকতার যুক্তি না হয়ে, পাগলের প্রলাপ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সম্ভবত এই পাগলামির ছিটটা আছে বলেই, তা অসৎ সাংবাদিকতার পথে নেমে আসছে। ২৪শে নভেম্বর ও তার পরের দিনগুলিতে কলিকাতায় যখন ফরওয়ার্ড ব্লকের সারা ভারত ওয়ার্কিং কমিটি আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিল, সব পত্রিকা তার প্রস্তাবগুলি ছাপিয়েছে, এবং আমাদের সাংগঠনিক মুখপত্র 'ফরওয়ার্ড ব্লকে' যে সম্পাদকীয়গুলি প্রকাশিত হয়েছিল, তা পুনর্মুদ্রণ করেছে, কিন্তু 'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া' করেনি। তা না করলেও, ৪ঠা ডিসেম্বর কিন্তু "আপনাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে" এই শিরোনামে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক প্রবন্ধের সূত্রে উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করা হয়েছে।

'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়ার' আমাদের জন্যে যে একটা বিশেষ দরদ আছে—ভারতে তা কে না জানে? এবং এই দরদ আরও গভীর হয়েছে যেহেতু তাকে আদালতে হাজির হয়ে জবাবদিহি দিতে হয়েছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও, সাংবাদিকতায় সাধুতা বলে কি কিছু থাকবে না? আগেকার দিনে যে সকল ভারতীয় জাতীয়তাবাদীকে প্রকাশ্যে হেয় প্রতিপন্ন করা দরকার হত তাদের মস্কোর দালাল বলে লাল ছাপ দেগে দেওয়া হত। কমিউনিজম্ ছিল একটা জুজু, যখন তখন সেই জুজুর ভয় দেখানো হত এবং কমিউনিস্টদের সোনায় ভারত ভরে যাচ্ছে এই ছবি সাধারণের চোখের সামনে তুলে ধরা হত।

কিছুদিন পরে রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষ মস্কোকে হটিয়ে দেয় এবং স্বল্পকালের জন্যে রাশিয়া খাতির পায়। এই খাতিরের মূলে ছিল জেনেভার সঙ্গে সোভিয়েতের যোগ, না, ট্রট্স্কিকে স্তালিন-পন্থীদের অস্বীকার, না, 'ফ্রেণ্ড'-এর দিক থেকে বার্লিনের উপর অধিকতর আক্রোশ, বলা ভার। কিন্তু বার্লিনকে চটাবার জন্যে মস্কোর সঙ্গে আমাদের 'ফ্রেণ্ড'-এর দোস্তি দেখতে মজা লাগত। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীকে মস্কোর বন্ধু বললে আর বিপজ্জনক বলে গণ্য করা হত না। আসল বিপদ হয়ে দাঁড়াল নাৎসীদের প্রতি বা রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষের অংশীদারদের প্রতি সহানুভূতি থাকা। আমাদের 'ফ্রেণ্ড'এর দৃষ্টিতে ভারতে কমিউনিস্ট মার্কা সোনার আমদানী বন্ধ হয়ে গেছে এবং এখন থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের মনকে যা বিষিয়ে দিতে শুরু করেছে তা অক্ষশক্তির সোনা। লেখকের বই 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগ্‌ল্ ১৯২০-১৯৩৪' থেকে কয়েকটি বাক্য প্রসঙ্গচ্যুত করে তুলে নিয়ে নিজেদের সুবিধা-মাফিক ব্যবহার করা হয়েছে এবং 'দি স্টেট্‌স্‌ম্যানের' স্তম্ভে ধারাবাহিকভাবে পরপর কতকগুলি নিন্দাসূচক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এই নিন্দাবাদ দেখে মনে পড়ে প্রায় বছর আটেক আগে ১৮১৮ সালের ৩ নম্বর রেগুলেশনে বিনাবিচারে লেখককে আটক রাখার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্যে তার বিরুদ্ধে এই প্রকারই অপপ্রচারের অভিযান চালানো হয়েছিল।

স্বল্পকাল বন্ধ থাকার পর আবার আক্রমণ শুরু হয়েছে, তার সূচীমুখ ৪ঠা ডিসেম্বরের প্রধান সম্পাদকীয়। এবারে আমাদের বন্ধুর একটা অসুবিধা রয়ে গেছে। কোন জুজুর ভয় দেখানো হবে ? মস্কো, না, সন্ত্রাসবাদ, না, বার্লিন, বিপ্লব, না, আর কিছু ? এই সুস্পষ্ট মুশকিলের আসানের জন্যে যে দৈত্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে তা হিটলার-স্টালিনের একটা মিশ্রণ। এবং এ দেশে এই আতঙ্ক জাগিয়ে তুলতে প্রয়োজনীয় যে পটভূমি প্রস্তুত করা দরকার তার জন্যে ওই-পত্রিকার ৬ই ও ৭ই ডিসেম্বর সংখ্যায় "ভারতে কমিউনিজম" নামে দুটি প্রবন্ধে সম্ভবমত সব রকমের শয়তানকে আমদানী করা হয়েছে।

সেই বিচিত্র ভিড়ের মধ্যে শয়তানের সেরা আর হিটলার নয়—এবারে স্টালিন।

সম্ভবত আমাদের 'ফ্রেণ্ড'-এর দিক থেকে হিসাবের একটা গোলমাল হয়ে গেছে। ভারতীয় জনসাধারণ কয়েক বছর আগে পর্যন্ত যেমন সরলমতি ছিল এখন আর তা নেই। এখন তারা 'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'র চালের এবং তার স্তম্ভে সরকারী তরফ থেকে বিস্তারিত যে রটনা চালানো হচ্ছে তার মতলব তারা বুঝতে পারে। আমরা শুধু জানতে চাই, সাধারণে সততা বলে যা জানে, এতে সেই সততাটুকু বজায় আছে কি না।

আসন্ন ঘটনা পূর্বেই ছায়াপাত করে। এই প্রবন্ধগুলিও তাই। আমরা জানি কী আসছে। কিন্তু তার জন্যে আমরা বিচলিত নই। সবকিছুরই মূল্য ধার্য থাকে, তেমনই স্বাধীনতারও আছে। স্বাধীনতার মূল্য আমাদের দিতে হবে, কিন্তু ব্রিটিশদেরও জেনে রাখা ভালো, যুক্তিতর্কের সাহায্য নিয়ে বা না নিয়ে চোখ রাঙিয়ে বা তর্জনগর্জন করে আর চলবে না। যে ভারতে আমরা বাস করছি সে ভারত পরিবর্তিত ভারত।

এবং আজ ভারতের সামনে যে ইওরোপ রয়েছে সেই ইওরোপও পরিবর্তিত ইওরোপ।

একটি স্মারক

১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯এ 'ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত প্রবন্ধ।

স্মরণে থাকতে পারে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠিত হবার পরে পরেই আমরা ঘোষণা করেছিলাম, ব্লক যে বিস্তারিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা কার্যকর করা ছাড়াও ব্লক অনতিবিলম্বে তিন দফা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভবিষ্যতে প্রয়াসী হবে—প্রথমত বামপন্থী সংহতি; দ্বিতীয়ত ফ্রন্টের স্বমতে কংগ্রেসকে নিয়ে আসা এবং কংগ্রেসের মধ্যে যথার্থ একতার প্রতিষ্ঠা ; এবং তৃতীয়ত কংগ্রেসের নামে জাতীয় সংগ্রাম শুরু করা। পরবর্তী ঘটনাবলীর দিক থেকে, এবং বিশেষ করে, গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে যা ঘটে চলেছে সেই দিক থেকে অব্যবহিত এই উদ্দেশ্যকে পরিবর্তন করার মত কোন কারণ দেখা দেয়নি। কিন্তু সামান্য একটু সংশোধন আবশ্যক হয়ে উঠেছে। ঘটনা সন্নিবেশের চাপে আমাদের আন্দোলন দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। অতএব যতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের অধিকাংশকে আমাদের স্বমতে আনতে না পারছি এবং কংগ্রেসের নামে অগ্রগমন সম্ভব না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করে থাকতে পারি না। একদিকে দ্রুত কাজ করে যাওয়া যেমন একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি অন্যদিকে বাম-পন্থীদের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী-নেতাদের নিয়মিত জেহাদ চালানোর জন্য এবং নানাপ্রকার নিয়মতান্ত্রিক কারসাজি ও ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে কংগ্রেসের অধিকাংশের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন করা আরও দুরূহ হয়ে উঠেছে। কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যের দৃষ্টিভঙ্গী বদল করার চেষ্টা নিঃসন্দেহে চালিয়ে যেতে হবে এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেস যাতে আন্দোলন শুরু করতে উদ্যোগী হয় সেই প্রচেষ্টাও থাকবে। কিন্তু এই সব প্রচেষ্টা এখনই যদি সফল না হয় তাহলে কী করণীয়? কাল ও জলস্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না এবং আজকের জগৎ দুর্বার জলপ্রপাতের মত ধেয়ে চলেছে। বর্তমান সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যদি হাত গুটিয়ে থাকে বা রাশ টেনে ধরে

তাহলে ফরওয়ার্ড ব্লককে আন্দোলন শুরু করার জন্যে এবং সচলভাবে সক্রিয় হবার জন্যে উদ্যোগী হতে হবে। কবে সেদিন আসবে যখন কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্য আমাদের মতে মত দেবে অথবা কংগ্রেসকে আন্দোলন শুরু করার সংকল্প গ্রহণ করাতে আমরা সমর্থ হব, তারজন্যে কালের দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করে বসে থাকবার অবসর আমাদের নেই। ইতিহাসে মাঝে মাঝে এমন ঘটনা ঘটে যখন অগ্রবর্তী দলকে আর সবার আগে এবং সম্ভবত সাময়িকভাবে তাদের থেকে আলাদা হয়েই কাজ করতে হয়। পরিস্থিতি যখন মরিয়া হবার মত, সময় সময় মরিয়াভাবেই তার প্রতিবিধান করতে হয়।

এই রকম নীতির বিপক্ষে দুটি যুক্তি দেখানো হবে। নিয়মশৃঙ্খলার ব্যাপারে যারা মতান্ধ তাদের যুক্তি হবে, যদি বামপন্থীরা অথবা অগ্রবর্তী দল এইভাবে কাজ করে তাহলে নিয়মশৃঙ্খলা ভঙ্গ হবে এবং সাংগঠনিক ঐক্য লোপ পাবে। ঝুটো বাস্তববাদীরা যুক্তি দেখাবে, অগ্রবর্তী দল এইভাবে কাজ করলে তারা নিজেদের আলাদা করে ফেলবে এবং তার ফলে নিজেদের শক্তিহীন করবে—আসলে তার পক্ষে উচিত হবে সাধারণ কর্মীদের থেকে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে পৃথক করার চেষ্টা করা।

প্রথম যুক্তি সম্পর্কে আমাদের জবাব, একতা ও নিয়মনিষ্ঠা নিজেরাই লক্ষ্য নয়, তারা লক্ষ্যে পৌছনোর উপায়। তাদের মূল্য ততখানি যতখানি তারা কর্ম ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে আমাদের শক্তিশালী করে। তারা যদি আমাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখে তবে তারা নিরর্থক। দ্বিতীয় যুক্তি সম্পর্কে আমাদের জবাব, সচল কোন নীতি গ্রহণ করার ফলে অগ্রবর্তী দলের পক্ষে সাধারণ কর্মীদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার যেমন সম্ভাবনা থাকে, তেমনই সমানভাবে এও সম্ভব যে, সঙ্কটের মুখে দ্বিধাগ্রস্ত রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাবে যখন সমস্ত কর্মোদ্যম বিবশ হয়ে গেছে, বামপন্থীদের তরফ থেকে দুঃসাহসিক কোন কর্মপ্রয়াস সেই অচলাবস্থার অবসান ঘটাতে পারে, আগ্রহী ও উৎসাহী কর্মীদের কর্মের আবর্তে টেনে এনে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে তার

আগেকার অনুগামীদের থেকে পৃথক করে দিতে পারে। নিয়মিত শুধু প্রচার চালিয়ে অথবা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় সংগ্রাম চালনা করে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে পৃথক করা যাবে এই রকম ধারণা করা ভুল। একই রকম ভুল হবে এই ধারণা করা যে, জাতীয় ভিত্তিতে আন্দোলন আরম্ভ করার জন্যে বামপন্থীদের মুখাপেক্ষী হবার আগে আমাদের দক্ষিণপন্থীদের আলাদা করে ফেলতে হবে। আমাদের একথা কখনোই ভোলা উচিত হবে না যে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বামপন্থীরা সচল কোন নীতিকে রূপ দেবার জন্যে প্রায় অন্ধকারে যদি ঝাঁপ দেয় তবেই দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে সবচেয়ে ভালোভাবে পৃথক করা যেতে পারে! এতে কিছু পরিমাণে অসমসাহসিকতা থাকতে পারে, তাই বলে তা যে গোঁয়ারতমি হবে এমন কথা নয়।

কিন্তু আমরা কি করে বুঝতে পারব এই ধরনের দুঃসাহসিকতার ফলে দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থী পৃথক হয়ে যাচ্ছে কি না? এই প্রকার প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। এটি প্রধানত রাজনৈতিক সজ্ঞান, প্রজ্ঞার বিষয়।

আজ আমাদের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব, ১৯১৭ সালে লেনিনের অসমসাহসিকতা ব্যর্থ হলে তার পরিণামে কী ঘটত? আমরা এ প্রশ্নও করতে পারি, ১৯১৬ সালের আইরিশ দুঃসাহসীরা তাদের বেপরোয়া হঠকারিতার ফলে রেড্‌মনড্‌হাইট্‌ পার্টিকে বিধ্বস্ত করার বদলে যদি নিজেদের রাজনৈতিক মৃত্যু ঘটাত তাহলেই বা কী হত?

এই সঙ্গে বিবেচনা করুন, ১৯১৯ সালে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ, তা শুধু ব্যর্থ প্রয়াসই হয়নি, তা দেশকে জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মান্তিক ঘটনার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। এবং ১৯২৩ সালের হিটলারের মিউনিক অভিযান, সারা জগতের কাছে এমনকি জার্মানদের নিজেদের কাছেও যা হাস্যকর বলে মনে হয়েছিল?

মস্কো, ডাব্‌লিন, দিল্লী এবং মিউনিকের বিচিত্র দৃশ্যাবলীর মধ্যে কোনই মিল নেই, কিন্তু এদের অন্তর্নিহিত নীতিকথাটি এক। গতায়ু নেতৃত্বকে পৃথক করার কোন বাঁধাধরা রাস্তা নেই। প্রায়শই অগ্রবর্তী

দলের দিক থেকে দুঃসাহসিক পদক্ষেপ এই চরম অবস্থাকে ত্বরান্বিত করার পক্ষে অনিবার্য। এবং জীর্ণ নেতৃত্বকে আলাদা না করা গেলে প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

নবজাত ফরওয়ার্ড ব্লকের কাছে নয়ই জুলাই ছিল প্রকাণ্ড একটা বাধা। ব্লক যখন তার যাত্রা শুরু করার মুখে এইরকম বাধার সম্মুখীন হল তখন অনেকেই ব্লকের অকাল মৃত্যু আশঙ্কা করেছিল। কিন্তু আমরা ছিলাম আশাবাদী কারণ সাধারণের নাড়ির সঙ্গে আমাদের যোগ আছে। আমরা যা ভেবেছিলাম তাই সত্য বলে প্রমাণিত হল। সেই সঙ্কট উত্তীর্ণ হয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক আরও বেশী শক্তি ও মর্যাদা নিয়ে বেরিয়ে এল। আমাদের সদস্যদের উপর পরবর্তী নিগ্রহ আমাদের অগ্রগতিকে আরও ত্বরান্বিত করেছে। ব্লক পাকাপাকিভাবে রয়ে গেল এবং এরই মধ্যে ভারতের গণজীবনে তা একটি প্রভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই প্রভাবকে আর অগ্রাহ্য করা চলবে না—এমনকি 'দি ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া'ও পারবে না

প্রথমেই আমরা ঘোষণা করেছি যে, ফরওয়ার্ড ব্লক ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতজনিত আবশ্যকতার ফল। বাস্তবিকই তা তাই। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লক ভবিষ্যতেও যদি তার অস্তিত্বের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে চায় তবে নীতি ও কাজের দিক থেকে তাকে অগ্রণী হতে হবে। এবং ফরওয়ার্ড ব্লক যদি অগ্রণী থাকতে পারে, তবেই দেশের পক্ষে এবং তার পক্ষে মঙ্গল হবে।

সঠিক পন্থা

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯এ 'ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

জীবনে এবং বিশেষ করে রাজনীতিতে দ্বিধার মনোভাবের মত অনিষ্টকর ও বিপজ্জনক আর কিছু নেই। এই অস্থিরচিত্ততা যখন ধারকরা ভেখ নিয়ে বড়াই করে তখন সেই সম্ভাবনা আরও বেশি। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মনোভাবের কথা বিবেচনা করা যাক। যুদ্ধনীতি সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীর প্রাথমিক মনোভাব সুস্পষ্টভাবে বোধগম্য, যদিও দেশের জনমতের সঙ্গে তা মেলে না। তিনি যুদ্ধের প্রশ্নে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে বিনাশর্তে সহযোগিতা করার সুপারিশ করেন; কিন্তু কংগ্রেসের বারেবারে গৃহীত প্রস্তাব এবং বিশেষত ১৯৩৮এর হরিপুরা কংগ্রেসের প্রস্তাব এই সুপারিশের একেবারে বিরোধী। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি, যা একান্তভাবে মহাত্মার নির্দেশ মেনে চলে, বর্তমান সঙ্কটে কিন্তু তা করতে সাহস করল না। তার বদলে, সুন্দর সুন্দর কথায় মোড়া দীর্ঘ এক প্রস্তাব গ্রহণ করে, যা পড়ে সাধারণ লোকের মনে এই ধারণা হয় যে কংগ্রেস যুদ্ধের জন্যে তৈরি হচ্ছে। অথচ তা এমন একটা মনকে কথার জালে আড়াল করে রেখেছে যে মন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চিত। এক মিটিং থেকে আরেক মিটিংয়ে কমিটি একটা না একটা অছিলায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ পিছিয়ে রাখছে। প্রথমে অর্থাৎ সেপ্টেম্বরে যখন সিদ্ধান্ত মুলতবী রাখে, তখন তারা ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাদের যুদ্ধের কী উদ্দেশ্য সেই সঙ্গে ভারত সম্পর্কে তাদের নীতি কী তা জানতে চায়। কিন্তু বড়লাটের জবাব পাওয়ার পর, যে জবাবকে বলা যেতে পারে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মুখে সরাসরি চপেটাঘাতের চেয়ে কম কিছু নয়, এই দীর্ঘসূত্রতা বা দ্বিধার সঙ্গত কোন কারণ নেই।

গান্ধীবাদী অনেক নেতাই, তাঁদের মধ্যে প্রধান মাদ্রাজের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, বড়লাটের ঘোষণায় গভীর হতাশা প্রকাশ করেছেন।

তাঁদের গভীর হতাশা থেকে বোঝা যায় প্রথমে তাঁদের আশার মনোভাব ছিল। কিন্তু আমাদের ভাবতে অবাক লাগে, কিসের ভরসায় তাঁরা সরকারের কাছ থেকে অন্যরকম কিছু প্রত্যাশা করেছিলেন। কী যে আসছে সে সম্পর্কে আমাদের দিক থেকে আমরা সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম ; অতএব ব্রিটিশ সরকারের জবাব যখন জানা গেল তখন বিস্ময় বা নৈরাশ্য কিছুতেই আমরা মুহ্যমান হইনি।

অপ্রত্যাশিত আঘাতের যন্ত্রণায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তৎপরতার সঙ্গে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস কেবিনেটগুলিকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেয়। সেই সময়কার পরিবেশে সিদ্ধান্তটি যতদূর সম্ভব ভালই হয়েছিল, কিন্তু আমরা যাকে বিচক্ষণ কূটকৌশল বলে মনে করি এই সিদ্ধান্ত সেইমত হয়নি। পদত্যাগ না করে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের উচিত ছিল নিজ নিজ পদাধিকারে অধিষ্ঠিত থাকা, উচিত ছিল কংগ্রেস কার্যক্রমকে রূপায়িত করে চলা এবং তাদের যা ন্যায্য কর্তব্য সেই কর্তব্য পালন করতে করতে পদচ্যুতি যেচে আনা। এই নীতি যদি অনুসরণ করা হত, তাহলে যে সময়ের মধ্যে শেষ মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করা হত সেই সময়ে জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা ফেটে পড়ার অবস্থায় পৌঁছত।

এসব সত্ত্বেও আমরা কংগ্রেস কেবিনেটগুলির পদত্যাগকে স্বাগত জানিয়েছিলাম, আশা করেছিলাম এই পদত্যাগ অগ্রণী এক নীতির পথে প্রথম পদক্ষেপ বলে প্রতিপন্ন হবে। রাজনীতির বাস্তবক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাঁয়তারা কষা বলে কিছু নেই। হয় এগিয়ে যেতে হবে কিংবা পিছিয়ে পড়তে হবে। স্বভাবত আমরা আশা করেছিলাম, মন্ত্রীরা আমাদের পথ থেকে একবার সরে গেলে নীচের থেকে চাপে পড়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সচল ও সবল এক নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হবে।

জনগণের চাপ আছে ঠিকই, কিন্তু কমিটি, তার মধ্যে প্রাক্তন বামপন্থী নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও আছেন, মহাত্মার নেতৃত্বে সেই চাপকে এযাবৎ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছে। আজ আর

কমিটির নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নেই—তা এখন মহাত্মা গান্ধীর ছায়ামাত্র, তাঁর কাছে তা স্বেচ্ছায় সব অধিকার সঁপে দিয়েছে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী আর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একচ্ছত্র নায়ক নন। এই মহান প্রতিষ্ঠানের কেবলমাত্র দক্ষিণপন্থীদের এবং কিছু কিছু প্রাক্তন বামপন্থী নেতার তিনি একচ্ছত্র নায়ক—কারণ একথা সুনিশ্চিত যে বামপন্থীরা কখনও অন্ধের মত তাঁর আদেশ মাথা পেতে নেবে না।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এযাবৎ কী করে জনগণের চাপ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখলে বাস্তবিক অনেক কিছু জানা যায়। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই মুলতবী রেখে তারা বাম-শক্তির বিরুদ্ধে, বিশেষ করে ফরওয়ার্ড ব্লকের বিরুদ্ধে, নির্মম ও অবিরাম জেহাদ চালিয়ে চলেছে। আমাদের সামনে যে পথ ও কর্তব্য নির্দিষ্ট আছে, এই উপায়ে সেদিক থেকে জনসাধারণের দৃষ্টিকে সরিয়ে আনা যায়। জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে এবং তারপরে সংগ্রামের পথ থেকে তাদের ভয় দেখিয়ে হটিয়ে দিতে, সময় সময় নানারকম জুজু সৃষ্টি করা হয়েছে। যুদ্ধের আগে আমাদের বলা হয়েছিল অগ্রণী হয়ে কিছু করা অসম্ভব, যেহেতু কংগ্রেসের ভিতরে দুর্নীতি রয়েছে এবং যেহেতু অগ্রণী হয়ে কোন আন্দোলন শুরু করলে তার ফলে হিংসার প্রাদুর্ভাব ঘটবে। গত সেপ্টেম্বর থেকে তাঁরা নতুন করে ধুয়া ধরেছেন। এখন আমাদের বলা হচ্ছে, কংগ্রেস যদি "সত্যাগ্রহ" অভিযান শুরু করে, তার অনিবার্য পরিণতি হবে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা। সচল নীতি থেকে বিরত করবার জন্যে আরও কী নতুন যুক্তি আবিষ্কার করা হয় আমরা তার প্রতীক্ষা করছি। কংগ্রেস-নেতৃত্বের উপর-মহলে যে মর্মান্তিক অবস্থা দেখা দিয়েছে তার জন্যে প্রধানত দায়ী সরকারী ক্ষমতা গ্রহণের অনুফল হিসেবে নৈতিক অধঃপতন। এই নৈতিক অধঃপতন একেবারেই প্রত্যাশিত ছিল না। কে ভেবেছিল যে, যাঁরা ভারতের স্বাধীনতার জন্যে বছরের পর বছর লড়াই করে এসেছেন, যাঁরা কারাজীবনের দারুণ কষ্ট অকাতরে সহ্য করে এসেছেন তাঁরাও আমাদের ইতিহাসের এই সঙ্গীন সময়ে এইভাবে আমাদের নিরাশ করবেন ?

বামপন্থী শক্তির বিরুদ্ধে যখন জেহাদ চালানো হচ্ছে, ঐ ধরনের নানা আতঙ্ক যখন তৈরি করা হচ্ছে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তখনও পর্যন্ত নিজেদের মুখরক্ষা করতে কিন্তু ছাড়েনি। বামপন্থী বুলির যোগান দিতে কখনও কার্পণ্য করেনি এবং সর্বদা আশার বাণী শোনানো হয়েছে যে, কংগ্রেস শীঘ্রই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কয়েকটি প্রদেশ থেকে এবং বিশেষ করে প্রাক্তন মন্ত্রীদের মহল থেকে আমরা যে খবর পাচ্ছি তাতে এই সব আশার কোন ভিত্তি পাওয়া যাচ্ছে না। চতুর্দিক থেকে কানাঘুষা শোনা যাচ্ছে কংগ্রেসী কেবিনেটগুলি আবার গদিতে বহাল হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে পর্দার আড়ালে কথাবার্তাও চালানো হচ্ছে। দেশের যাঁরা প্রগতিশীল, যাঁরা বৈপ্লবিক তাঁদের সঙ্গে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এবং মহাত্মা গান্ধীর কোনই যোগ নেই—এই অভিযোগ করা খুবই কঠিন, তবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের তা করতে হচ্ছে।

ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবে এদেশে দক্ষিণ ও বামশক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিরোধ গুরুত্বপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক। আমাদের নেতৃত্বের উপরকার মহলে ক্ষমতার লোভ ভর করেছে—যে ক্ষমতা স্বাধীনতা থেকে আসে এ সে-ক্ষমতা নয়, এ সেই ক্ষমতা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করার ফলে যে ক্ষমতা লাভ করা যায়। সুতরাং সুযোগ দেখা দিলে দক্ষিণ-পন্থীরা আপস করতে দ্বিধা করবেন না, কিন্তু জাতীয় সঙ্কট থাকা সত্ত্বেও এবং সেই সঙ্কটে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও বামশক্তির সঙ্গে বোঝাপড়া করার কথা তাঁরা মনেও স্থান দেবেন না। এ হচ্ছে জঘন্যতম ক্ষমতার রাজনীতি বা কূটরাজনীতি। আমাদের সন্দেহ নেই, কংগ্রেসের ভিতরে দলগত দ্বন্দ্বকে সামনে রেখে তার আড়ালে বরাবর সত্যিকার শ্রেণীসংগ্রাম চলে আসছে।

সংগ্রাম এড়িয়ে যাবার জন্যে সর্বশেষ যে ধোঁকাটি বানানো হয়েছে এবং যা যথাকালে ভারতীয় জনগণের উপরে তাদের নিজেদের নেতাদের সবচেয়ে বড় প্রতারণা বলে প্রমাণিত হবে, তা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের ছত্রতলে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্ব্লির

(সাংবিধানিক পরিষদ) প্রস্তাব। ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ে আমরা কিছুটা মন দিয়ে পড়াশুনা করেছি এবং আমাদের মতে সাংবিধানিক পরিষদ, অবশ্য এই নাম যদি যথার্থ হয়, কেবলমাত্র ক্ষমতা দখলের পরেই জন্ম নিতে পারে। যেমন, কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয় সমস্যা নিয়ে যদি সংগ্রামে লিপ্ত হয়, কংগ্রেসকে সর্বপ্রথমে জয়লাভ করতে হবে এবং ক্ষমতা আয়ত্তে আনার জন্য অস্থায়ী একটি সরকার গঠন করতে হবে। কেবলমাত্র এই রকম অস্থায়ী জাতীয় সরকারই ভারতের বিস্তারিত সংবিধান রচনা করার জন্যে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্ব্লি (সাংবিধানিক পরিষদ) আহ্বান করতে পারে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আপাতত যে এসেম্ব্লির প্রস্তাব করছে তা সর্বদলীয় সম্মেলনের কিছুটা অভিজাত সংস্করণ হতে পারে কিন্তু কখনই তা কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্ব্লি (সাংবিধানিক পরিষদ) নয়। এর পরিণাম হবে আইরিশ কন্‌ভেন্‌শনের মত। সেই কন্‌ভেন্‌শন ছিল লয়েড জর্জের মস্তিষ্কপ্রসূত। এই ধরনের এসেম্ব্লির সঙ্গে ভারতীয় জনগণের কোনই সম্পর্ক থাকা উচিত নয়, যখন তার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আসল কর্তব্য থেকে আমাদের বিপথে চালিত করা, যেমন ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে হরিজন আন্দোলন করেছিল।

আমাদের নিজেদের পথ সুস্পষ্ট। আমরা এখন আমাদের আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি আমাদের পরবর্তী ধাপের জন্য যারা মনেপ্রাণে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী তাদের সবাইকে জড়ো করতে হবে। আজকের সমস্যা শুধু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে আন্দোলনের ক্ষেত্রে নামতে বাধ্য করা নয়। তা আমাদের করতেই হবে। ওই ব্যাপারে আমরা যদি সফল হই তাহলেও মহাত্মা গান্ধী যতদিন আমাদের কর্ণধার, ততদিন সব সময়ে আরেক চৌরিচৌরা অথবা আরেক হরিজন আন্দোলন কিংবা আরেক গান্ধী-আরউইন চুক্তির আশঙ্কা থাকবেই। এই বিপদের জন্যে আমাদের আগে থাকতে তৈরি থাকতে হবে, যাতে যখন সে সময় আসবে আমরা যেন তা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করতে পারি।

সব সময়ের জন্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করুক—তাতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু নেতা হলে তাঁকে নেতৃত্ব দিতে হবে। নৈরাশ্যের মধ্যেও আমরা এখনও আশা করছি কমিটি শীঘ্রই আন্দোলনের পথে পা বাড়াবে। যদি তাঁরা তা না করেন, আমাদের করতে হবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যিনিই নেতৃত্ব দিন, জনসাধারণ তাঁকে অনুসরণ করবে।

সাম্রাজ্যবাদের অবসানে আমাদের আন্দোলনের সমাজতান্ত্রিক পর্ব শুরু হবে। যারা ক্ষমতা জিনে নিয়ে আসবে তাদেরই সংগ্রাম-পরবর্তী পুনর্গঠনের কাজের দায়িত্ব নিতে হবে।

নেতাদের ভুল নেতৃত্ব

৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৩৯এ 'ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

সাধারণ সরল লোক যারা রাজনীতি বিশেষ বোঝে না, সাধারণত বিশ্বাস করে, যে-বীর অনেক যুদ্ধ জয় করেছে শেষ পর্যন্ত সে জয় করেই যাবে। কদাচিৎ সে মনে রাখে আউস্টারলিট্স্-এর বিজয় ওয়াটারলুর বিপর্যয়ে শেষ হতে পারে। এই রকম মর্মান্তিক পরিণতি সত্যি যখন ঘটে, বিস্ময়ে সে হতবাক হয়ে যায়। যাকে ঈশ্বর বলে জেনে এসেছি আসলে সে যে কাদার ঢেলা ছাড়া কিছু নয়—এই আবিষ্কার সর্বদাই বেদনাদায়ক। এই আবিষ্কার একবার করা হলে, জনচিত্ত রাগে হতাশায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং প্রাক্তন ঈশ্বরকে নির্মমভাবে অস্বীকার করে। এইভাবে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে —এককালে যিনি "সারেণ্ডার-নট্ ব্যানার্জী" (অর্থাৎ যে ব্যানার্জী মাথা নত করেন না।) বলে পরিচিত ছিলেন এবং যিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম জনক ছিলেন—তাঁর প্রাক্তন ভক্তরা—তাঁর নিজের দেশবাসীরা তাঁকে বর্জন করে।

এই থেকে যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে জনসাধারণ অকৃতজ্ঞ বা সাধারণের স্মৃতি স্বল্পস্থায়ী, তা সঙ্গতও হবে না, তাতে ন্যায়বিচারও ক্ষুণ্ণ হবে। এতে শুধু এইটুকু বোঝায়, কোন নেতার অতীতের দেশ-সেবার জন্য কোন জাতি যেমন তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে এবং সেই কারণে তাকে ভালও বাসতে পারে, তেমনই সেই জাতি কেবলমাত্র ততদিনই তাকে অনুসরণ করে যতদিন সে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে দেশবাসীর পুরোভাগে এগিয়ে চলে। অতীতের দুঃখভোগ ও আত্মত্যাগ কখনওই সকল অবস্থায় ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের ছাড়পত্র হতে পারে না।

যে সকল জাতি জীবন্ত ও প্রগতিশীল তাদের মধ্যে পুরনোর সঙ্গে নতুনের যোগসূত্র থাকে। যারা নতুন আসছে তারা কোন বাধার

সম্মুখীন না হয়ে প্রাচীনদের অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার শরিক হতে পারে। অপরপক্ষে যারা তরুণ এবং তরুণ বলেই স্বভাবত প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক তারা তাদের গতিস্ফূর্তি জলাঞ্জলি না দিয়ে পককেশ বৃদ্ধদের কাছ থেকে উপদেশ ও পথনির্দেশ নিয়ে থাকে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লর্ড বল্ডউইন যখন যশ ও ক্ষমতার সর্বোচ্চশিখরে তখনই তিনি পদত্যাগ করেন এবং সেই থেকে বেশ কিছুটা নির্জনতায় জীবনযাপন করছেন। তিনি আর প্রতিবন্ধী নন, কিন্তু প্রবীণ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ হিসাবে এখনও তাঁর প্রচণ্ড প্রভাব, এমনকি, রাজসিংহাসনের পিছনকার শক্তি হিসাবেও তাঁকে গণ্য করা যেতে পারে।

যে জাতিকে গোলামিদশায় রাখা হয়েছে কিংবা যে জাতির মনোবৃত্তিতে গোলামি রয়ে গেছে, তাদের কথা আলাদা। নেতারা একবার মঞ্চে উঠলে হল, স্বেচ্ছায় অবসর নিতে তাঁদের আর মন চায় না। তাঁদের টেনে নামাতে হয় যেমন স্যার সুরেন্দ্রনাথকে নামাতে হয়েছিল, এবং এই কাজটা সত্যিই বেদনাদায়ক। এই সব দেশে লোকেরা অন্ধভাবে বীরপূজা করতে একটু বেশীমাত্রায় উদ্‌গ্রীব এবং তাদের মোহভঙ্গ হতে অন্য দেশের থেকে কিছু বেশী সময় লাগে। কিন্তু কোথাও দুঃসময়কে অনির্দিষ্টভাবে পিছিয়ে রাখা যায় না। কাল পূর্ণ হলে উলঙ্গ সত্য মুখোস খসিয়ে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসে।

বর্তমান ক্ষেত্রে বিমুগ্ধ, কৃতজ্ঞ ও আবেগপ্রবণ এক জাতির পক্ষে বিশ্বাস করা সত্যি খুবই কঠিন যে, দুই যুগ ধরে যাঁদের হাতে নেতৃত্ব রয়েছে, কম-বেশি সাফল্যের সঙ্গে যাঁরা অনেক লড়াই লড়ে এসেছেন এবং জীবনপথে অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা নিঃশঙ্কভাবে অতিক্রম করেছেন, চরম মুহূর্ত যখন সমাগত তাঁরা তখন আমাদের নিরাশ করবেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্য কোন সিদ্ধান্ত কি আমাদের পক্ষে নেওয়া সম্ভব? গত বছর থেকে বারেবারে সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও আমাদের এই নেতৃমণ্ডলী আসন্ন ঘটনা সন্নিবেশের জন্য প্রস্তুত হতে বিন্দুমাত্র সচেষ্ট হননি। তার বদলে তাঁরা আমাদের বিদ্রূপ করেছেন। ত্রিপুরি কংগ্রেসে তাঁরা দেশের স্বার্থের দিকে দৃকপাত করার চেয়ে আমাদের

উপর প্রতিশোধ নিতে এবং লুপ্ত মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে অনেক বেশি উৎসুক ছিলেন। তাঁদেরই কীর্তি বলতে হবে যে আজকের জগতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস একমাত্র মুখ্য রাজনৈতিক সংগঠন যাঁরা সমাসন্ন আন্তর্জাতিক সঙ্কটে প্রস্তুত হওয়া থেকে স্বেচ্ছায় বিরত থেকেছেন।

এ তো মাত্র অভিযোগের শুরু। সেপ্টেম্বর মাসে সত্যিই যখন দুর্যোগ দেখা দিল তখন তাঁরা কিরকম আচরণ করেন ? ১৯৩৮-এর হরিপুরা কংগ্রেসের এবং ১৯৩৯-এর ত্রিপুরি কংগ্রেসের অস্বস্তিকর প্রস্তাবগুলিকে নীরবে এবং বিনা ভণিতায় ধামাচাপা দেওয়া হয়। আমাদের বলা হয় কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্মকর্তারা ভেবে দেখতে শুরু করেছেন। কিন্তু ভেবে দেখার ছিল কি ? ১৯২৭ সাল থেকে যুদ্ধসঙ্কট নিয়ে কংগ্রেস অনেক চিন্তা করেছে এবং পর পর নানা প্রস্তাবে তার সিদ্ধান্ত বিধৃত হয়েছে। নতুন করে ভেবে দেখার কিছুই ছিল না— যা বাকি ছিল তা হচ্ছে, ইতিপূর্বে গৃহীত এবং বারেবারে বিঘোষিত প্রস্তাবকে কার্যকর করা। কিন্তু আসল প্রশ্নকে এড়াবার জন্য সব রকমের ফিকির-ফন্দির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

অগ্রণী নীতি গ্রহণের বিপক্ষে অনবদ্য দুটি যুক্তির সঙ্গে গত সেপ্টেম্বর থেকে তৃতীয় আরও একটি যুক্তি যোগ করা হয়েছে, যথা : সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ফলে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা দেখা দেবে। এটা শুধু ফন্দি নয়, রীতিমত অসৎ ফন্দি। সেপ্টেম্বরে পাঞ্জাবের মজ্‌লিস্‌-ই-অহরর তাদের আন্দোলন শুরু করার পর থেকে কী ঘটেছে ? তাছাড়া দুষ্কৃতকারীরা এখানে-সেখানে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ যদি সৃষ্টিই করে, তাতে কী আসে যায় ? এইরকম বিক্ষিপ্ত দাঙ্গা কি ১৯২১-এ, ১৯৩০-এ এবং ১৯৩২-এ হয়নি ? এই যুক্তিকে যদি চ্যালেঞ্জ না করা হয়, তাহলে অগ্রণী যে কোন আন্দোলনকে পণ্ড করার জন্যে তা সব সময় আমাদের উপর প্রয়োগ করা হবে।

সেপ্টেম্বর থেকে সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার যা ঘটেছে তা হচ্ছে স্বরাজের দাবিকে কার্যত বর্জন এবং তার জায়গায় গোপনে তথাকথিত কন্‌স্টিটিউয়েন্ট এসেম্‌ব্লির দাবি আমদানি করা। নীচে থেকে জন-

সাধারণের চাপকে প্রতিহত করার জন্য কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড স্বরাজের মুখ্য প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়ে ঝুটো একটা বিষয় আমদানি করেছে।

গত সংখ্যায় আমরা কন্স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্লির এই প্রস্তাব পরীক্ষা করে দেখিয়েছি যে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এখন যা দাবি করছে তা মোটেই কন্স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্লি নয়। সাম্রাজ্যবাদী সরকারের আওতায় এই ধরনের এসেম্ব্লি মিলিত হতে পারে না। লড়াইয়ের সাফল্যের পর জাতীয় সরকারের বা সাময়িক কোন জাতীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলে তখনই কেবল এই রকম এসেম্ব্লি তলব করা যেতে পারে। কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড জাতীয় দাবিকে ছেঁটে দিয়েছে যেহেতু তার ফলে সংগ্রাম এড়ানো যায় এবং যেহেতু গ্রেটব্রিটেনে তাদের উপদেষ্টারা বলেছে যে, এই প্রকার দাবি পূরণ হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

আমরা কেবল কামনা ও প্রার্থনা করতে পারি যে, এই দাবি যেন ব্রিটিশ সরকার পূরণ না করে,—কারণ যদি তা করে তাহলে কংগ্রেস নিজের সর্বনাশে পা বাড়াবে। ভাগ্য ভাল যে, ওয়ার্কিং কমিটি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী মেনে নিয়েছে। এর ফলে প্রস্তাবিত কন্স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্লির গঠন এমনই হবে যে তা সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হতে দেরি লাগবে না। শেষ পর্যন্ত বিশৃঙ্খলার মধ্যে তা ভেঙে যাবে এবং ভারতের যারা শত্রু তারা এই বিয়োগান্ত নাটকের আসল প্রণেতা কংগ্রেসকে আঙুল দিয়ে দেখাবে।

উক্ত কন্স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্লি যদি সংবিধান রচনা করতে সমর্থও হয় তাহলে ভারতকে সেই সংবিধান না দেবার পক্ষে ব্রিটিশ সরকার কোন-না-কোন অছিলা বা যুক্তির আশ্রয় সব সময়েই নিতে পারে। তাই-ই হবে যদি ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ কেটে যায়। আমরা ভেবে অবাক হচ্ছি, আমাদের প্রবীণ নেতাদের এটুকু খেয়ালে আসছে না যে, সংবিধান রচনা করতে বসার আগে তা করবার অধিকার প্রথমে তাঁদের অর্জন করা দরকার। আমাদের জিজ্ঞাস্য তাঁরা কি সেই অধিকার অর্জন করেছেন? না, করেননি। সেই জন্যই আমরা

বলছি, যথার্থ কন্‌স্টিটিউয়েন্ট এসেম্ব্লি একমাত্র জাতীয় সরকার বা সাময়িক জাতীয় সরকারই তলব করতে পারে।

একটি ব্যাপার আমরা বুঝতে পারছি না। যদি আমাদের নেতারা আন্দোলনে নামতে না চান, বড় বড় কথা তাঁরা বলে চলেছেন কেন? তাঁদের দিক থেকে অনেক বেশী সততা প্রকাশ পেত যদি তাঁরা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব, যতই তা ভুল হোক, মেনে চলতেন। লম্বা লম্বা প্রস্তাব, বামপন্থার আমেজ আসে এইরকম গালভরা কথার তুবড়ি, শূন্যগর্ভ বাক্যজাল, মাঝে মাঝে মারমুখো আস্ফালন, নতুন এক জাগতিক ব্যবস্থার ঘন ঘন উল্লেখ, যে ব্যবস্থাকে লড়াই করে আনার দরকার নেই, যা আকাশ থেকে পড়বে—বাইরে থেকে বিনা আঘাতেই সাম্রাজ্যবাদ তার নিজের ভারে আপনি ভেঙে পড়বে—আমরা যাকে কেরেন্সকি-কৌশল বলে জানি এই সব তার সঙ্গে সুন্দর খাপ খায়—কিন্তু বাস্তব রাজনীতির যে দাবি এতে তা মেটানো যায় না। কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করার পর পরই কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের নিজস্ব মুখপত্র ঘোষণা করে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবার সময় এসেছে। তারপর এই রকম অনেক সময়ই এল গেল কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই ঘটতে দেখা গেল না। সাংগঠনিক মুখপত্র যখন যুদ্ধের জন্য তোড়জোড় চালাচ্ছে তখন কোন কোন প্রদেশে "যুদ্ধ পরিষদ" গঠিত হয়েছে। আমাদের খবর এই যে, এই যুদ্ধপরিষদগুলি তাদের কমাণ্ডারদের নিয়ে এখন সুতো কাটতে ব্যস্ত। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের সুতো কাটতে হবে এবং সুতো কাটতে কাটতে আমাদের স্বরাজে পৌঁছতে হবে। আমাদের হাতে এরকম একটা অমোঘ অস্ত্র থাকতে কন্‌স্টিটিউয়েন্ট এসেম্ব্লি একেবারে অবান্তর বলে মনে হয়।

কিন্তু এইসব ছলচাতুরি, কথার কারচুপি কিসের জন্য? কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের সত্যাগ্রহের জেনারেলিসিমোর সত্যি-সত্যি কী হয়েছে? স্বরাজে পৌঁছবার সোজা রাস্তাটা এড়াবার জন্য কেন তাঁরা আকাশ-পাতাল তোলপাড় করছেন?

তাঁদের ভয়, যদি সংগ্রাম শুরু করা হয় এবং যখন তা হবে, সেই সংগ্রামের নেতৃত্ব তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। নতুন নতুন শক্তির, নতুন সব কর্মীর আবির্ভাব ঘটবে এবং তারা কংগ্রেসের সংগঠন ও নেতৃত্ব দুই-ই দখল করে নিতে পারে। সেই জন্য যেনতেনপ্রকারেণ সংগ্রাম এড়িয়ে চল—যতটুকু ক্ষমতা ইতিমধ্যে অর্জন করা গেছে সেই-টুকুই বজায় রাখার চেষ্টা কর এবং গোপন সলাপরামর্শ ও দরকষাকষি করে পার তো আরও কিছু আদায় করে নাও। ইতিমধ্যে বাম-পন্থীদের দমন করতে তোমার সাধ্যে যা পার তাই করে যাও। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একদিন না একদিন আপসে আসা যেতে পারে। কিন্তু বামপন্থীর সঙ্গে লড়াই শেষ পর্যন্ত চালিয়ে যেতেই হবে।

এই আপাত অসঙ্গতির—বামপন্থীর বিরুদ্ধে, বিশেষ করে ফরওয়ার্ড ব্লকের বিরুদ্ধে এই প্রতিহিংসার, কী ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যখন আমরা প্রথম পর্যায়ের এক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছি এবং নেতারা নিজেরাই জাতীয় ঐক্যের জন্যে বারেবারে আবেদন করে চলেছেন? বামপন্থীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে অসংখ্য আবেদন, এবং বিশেষ করে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত ব্যক্তির কাছ থেকে আবেদনও বিনা ভণিতায় প্রত্যাখ্যান করার কী কারণ থাকতে পারে? হয়তো এর কারণ কী, আমরা বলতে পারি। এই হচ্ছে কূটরাজনীতি, এখানে আবেগ বা মানবতার কোন স্থান নেই। কংগ্রেসের ভিতরকার আপাত দলীয় দ্বন্দ্বের অন্তরালে ভিতরে ভিতরে সব সময় শ্রেণীসংগ্রাম চলেছে। এবং যেখানেই শ্রেণী-সংগ্রাম সেখানেই নির্মমতা—সত্য ও অহিংসা সত্ত্বেও।

আমাদের দেশবাসীর বিরাট এক অংশ এখনও মনে করে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এবং মহাত্মা গান্ধী নিরাশ করবেন না। তাদের সঙ্গে আমাদেরও বলতে ইচ্ছা করে—তথাস্তু। কিন্তু এই ভাবনা কি নিতান্তই আমাদের মনের ইচ্ছা নয়? আমাদের বলা হচ্ছে মহাত্মাজী ওয়ার্কিং কমিটির পরবর্তী বৈঠকে একটা ফরমুলা তৈরি করবেন (সম্ভবত লবণ সত্যাগ্রহের মত একটা ম্যাজিক ফরমুলা) এবং মার্চ মাসে রামগড়ে

কংগ্রেসের পরবর্তী যে অধিবেশন বসবে সেখানে তিনি এই ফরমুলা পেশ করবেন। ইতিমধ্যে রামগড় কংগ্রেসের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে কংগ্রেসী নির্বাচন চলতে থাকবে। অতএব, মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত হাইকম্যাণ্ডের কার্যক্রম স্থির হয়ে আছে। অন্তর্বর্তী এই সময়ে জনগণকে কষে সুতো কেটে যেতে হবে এবং কংগ্রেস নির্বাচনের প্রাক্কালে যথারীতি ঝগড়াবিবাদ চালাতে হবে। সংগ্রামী আন্দোলনের পক্ষে চমৎকার প্রস্তুতি।

আমাদের বক্তব্য শেষ করার আগে একটি কথা বলতে চাই। প্রবীণ নেতারা যদি মনে করেন, সংগ্রাম না করে তাঁরা তাঁদের বর্তমান প্রতিষ্ঠা বজায় রাখবেন, তাঁরা তবে ভুল করবেন। আসলে, বর্তমান সঙ্কটে সাহসের সঙ্গে তাঁরা এগিয়ে গেলে তাঁদের প্রতিষ্ঠার যতটা না ক্ষতি হবে, তার চেয়ে অনেক বেশী ক্ষতি হবে তা না করলে। আমাদের কথা বলতে গেলে, আমাদের পথ ঠিক আছে—যাই হোক না কেন, আমাদের সে পথে যেতেই হবে। স্বাধীনতার পথ পুষ্প বিছানো নয়। এ পথ কণ্টকাকীর্ণ, কিন্তু পথের শেষে ক্লান্ত পথিকের জন্য প্রতীক্ষা করছে পূর্ণবিকশিত স্বাধীনতার গোলাপ। অতএব এগিয়ে চল, নিরবধি এগিয়ে চল।

পর্ব ঃ ৩য়

১৯৪০

ভারতের ছাত্রসমাজের প্রতি

১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সারাভারত ছাত্র সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ।

কমরেডগণ,

কোন কনফারেন্সের প্রেসিডেন্টের পক্ষে এ একটা রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তাঁর বক্তৃতার ভূমিকা হিসেবে বলতে হবে, কনফারেন্স অত্যন্ত সঙ্কটময় এক পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু আজ যদি আমি ওই কথা ব্যবহার করি, রীতির দিকে তাকিয়ে আমি সেই ভাষা ব্যবহার করব না। লঘু মন নিয়ে যদি তোমরা আমাকে তলব না করে থাক—আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমরা তা করনি—তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা আমাকে বিরাট এক সম্মানে ভূষিত করেছ। সম্মানের কথা ছাড়াও, এই উপলক্ষে আমার প্রতি তোমাদের যে আস্থা যে ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে তা আমি গভীরভাবে অনুভব করছি। তোমাদের ডাকে সাড়া দিতে আজ আমি তোমাদের মধ্যে এসেছি এবং তোমাদের প্রেসিডেন্ট হবার জন্য আমাকে নির্বাচন করে আমাকে যে সম্মান দেখিয়েছ তার জন্য তোমাদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নববর্ষের প্রারম্ভে উৎকণ্ঠিত প্রত্যাশায় আমরা সকলে দুরুদুরু বক্ষে মিলিত হয়েছি। আজ সব সমস্যার চরম সমস্যা, ভারতীয় জনগণের উপর আজ যে সঙ্কট এসে পড়েছে, কীভাবে তারা তার সম্মুখীন হবে। সাধারণ যে ছাত্র স্বাভাবিক অবস্থায় তার শিক্ষায়তনের চার দেয়ালের বাইরে না তাকালেও পারে, তাকেও তার বইপত্র, তার নিজস্ব সব সমস্যা আপাতত সরিয়ে রেখে সেই সঙ্কট এবং সেই সঙ্কটের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক তাই নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। তোমরা জান, বিদেশে এইরকম আপৎকালীন জরুরী অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে

বন্ধ করে দিয়ে সমগ্র ছাত্রসমাজকে কুচকাওয়াজ করতে পাঠানোর রীতি আছে এবং সেই রীতি পালনও করা হয়। ভারতে আমাদের ছাত্রদের এখন করণীয় কী ?

১৯২৭ সাল থেকে দিগন্তে আসন্ন যুদ্ধের ঘনঘটা সমানে রয়েছে। বছরের পর বছর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এ সম্পর্কে ইতিকর্তব্য কী তা ভেবেছে এবং তাদের সিদ্ধান্ত পর পর প্রস্তাবে বিধৃত হয়েছে। শেষ প্রস্তাবটি, যেটি এখন ঐতিহাসিক প্রস্তাব হয়ে দাঁড়িয়েছে, ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারিতে হরিপুরা কংগ্রেসে গৃহীত হয়। সাধারণের মনে স্বাভাবিক প্রত্যাশা ছিল যে, আশঙ্কিত সঙ্কট যখনই দেখা দেবে তখনই হরিপুরা প্রস্তাবটি কার্যকর করা হবে।

কিন্তু তা হয়নি। গত চার মাস ধরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি চিন্তা করে চলেছে। আসলে কিন্তু চিন্তা করার কিছুই নেই। এবং আরও ভাবনা-চিন্তা করার প্রয়োজন যদি থাকত, তবে গত সেপ্টেম্বর মাসে আসন্ন পরিস্থিতির জন্যে কংগ্রেসকে পূর্বাহ্নে তৈরি হবার কথা বলে বলে আমাদের যখন গলা ভেঙে যাচ্ছিল, তার আগেই ভাবনা-চিন্তা শুরু করে শেষ করে দেওয়া যেত। আজ এই কংগ্রেসই দুনিয়ার একমাত্র মুখ্য রাজনৈতিক সংগঠন যা সঙ্কটের সম্মুখীন হবার মত প্রয়োজনীয় কোন আয়োজন করেনি, এবং এ তো প্রবীণ নেতাদেরই দয়ায়, এর থেকে কি প্রমাণ হয় না, রাষ্ট্রনীতিজ্ঞানে প্রবীণ নেতারা দেউলিয়া হয়ে গেছে ?

আজকের ঘনঘটায় আশার আলো এই যে, কংগ্রেস নেতারা যখন কী করবেন না করবেন ভাবছেন, পাঞ্জাবের মজ্‌লিস্‌-ই-অহরর তখন কাজের কাজ করে চলেছে। তা সত্ত্বেও এমন লোক আছে—এবং তাঁরা সবাই বাড়িতে বসে আরাম করেন—যাঁরা ভারতীয় মুসলমান সমাজের স্বাজাত্যবোধ সম্বন্ধে বক্রোক্তি-করতে কোনরকম দ্বিধা করেন না।

গত বারো মাস ধরে কিংবা তারও বেশি সময় আসন্ন সঙ্কট সম্পর্কে আমরা যা কিছু বলেছি সবই অবান্তর বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা চরমপত্র দেওয়ার কথা বলেছি, বলেছিলাম পূর্বাহ্নে প্রস্তুত থাকতে। ১৯৩৯-এর মার্চ মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ত্রিপুরি

অধিবেশনে আমাদের কথাকে তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপ করা হয়েছে। আমাদের জ্যেষ্ঠরা জরুরী জাতীয় সমস্যাগুলি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার চেয়ে তাঁদের কাছে যা হৃত গৌরব তা পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁরা বেশীমাত্রায় ব্যাকুল হয়েছিলেন। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, তাদের কাছ থেকে যা প্রত্যাশিত ছিল সেইমত তাঁরা ত্রিপুরিতে দেশের স্বার্থ ঠিকমত দেখতে পারেননি অথবা অবস্থা অনুযায়ী সমুচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। দেশের মর্যাদা ও স্বার্থের উপরে তাঁরা নিজেদের স্বার্থ ও মর্যাদাকে স্থান দিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত যাঁরা ত্রিপুরিতে আমাদের লক্ষ্য করে হেসেছিলেন তাঁদের আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব পাস করেছিল কার্যত তা চরমপত্র ছিল কি না। তবে আমাদের পক্ষে কীই বা পার্থক্য হত যদি গত মার্চ মাসে চরমপত্রটি দেওয়া হত।

গত সেপ্টেম্বর মাসের আগে, জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার দাবি প্রতিহত করার জন্য মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর অনুগামীরা দুটি অনবদ্য যুক্তির দোহাই দিতেন। প্রথমত, কংগ্রেসের সাধারণ কর্মীদের পর্যায়ে দুর্নীতি দেখা দিয়েছে এবং দ্বিতীয়ত, সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করলে তার পরিণামে হিংসার প্রাদুর্ভাব হবে। সেপ্টেম্বর মাস থেকে তাঁদের মাথায় একটা নতুন যুক্তি খেলেছে এবং আগের দুটির সঙ্গে এটিও যোগ করা হয়েছে। এটি হল হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে গোলযোগ বাধবার আশঙ্কা। আগে আগে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ এখানে-সেখানে হয়েছে, ঠিকই, কিন্তু লক্ষ্যপথে আমাদের যাত্রা থেকে আমাদের বিরত করার অছিলারূপে কখনও তা ব্যবহার করা হয়নি। ভবিষ্যতে আমাদের জ্যেষ্ঠরা আর কী যুক্তি আবিষ্কার করেন দেখা যাক।

নিশ্চয় একথা বলা যেতে পারে যে, সেপ্টেম্বর মাস থেকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি চুপচাপ বসে নেই। গরম গরম কথার লম্বা লম্বা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং তার চেয়েও বড় কথা, আটটি প্রদেশ থেকে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা তুলে নেওয়া হয়েছে। কয়েকটি প্রদেশে যুদ্ধপরিষদ গঠন করা

হয়েছে এবং স্বেচ্ছাসেবকদের ক্যাম্প ও স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠনের কথাও চলেছে। এ সবই ঠিক। কিন্তু একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মুখ থেকে তিন মাসের ছুটি সম্পর্কে এ সব কী কথা শোনা যাচ্ছে? চারদিকে এরকম কানাঘুষা কেন যে, কংগ্রেসী মন্ত্রীরা শীঘ্রই আবার সরকারী দপ্তরে ফিরে আসছে? সাধারণ লোক সভাবতই বিমূঢ় এবং কী করবে ঠিক পাচ্ছে না। এবং এই বিমূঢ়তাকে চরম বিভ্রান্তিকর করতে 'যুদ্ধ পরিষদ'গুলিকে সুতো কাটবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমাদের কাছ থেকে এখন আশা করা হচ্ছে, সুতো কাটতে কাটতে আমরা স্বরাজে পৌঁছিয়ে যাব, কিন্তু কী করে আমরা মহাত্মা গান্ধীর এই 'যাদুমন্ত্রে'র অব্যর্থ শক্তি সম্পর্কে সুনিশ্চিত হই যখন আমরা জানি, এক শতাব্দী পূর্বে ভারতের জনসাধারণ যখন খাদি ও চরকা ছাড়া আর কিছু জানত না, তখনই তারা বিদেশী শক্তির পদানত হয়েছিল। না, এবারে সোজাসুজি কথা বলার সময় এসেছে। সময় এসেছে জনসাধারণকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়ার যে, সুতো কেটে স্বরাজ অর্জন করার ধারণা অসার কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে চরকার একটা স্থান আছে, কিন্তু তাকে আমাদের জাতীয় সংগ্রামের একটা পদ্ধতি হিসাবে উন্নীত করা ঠিক নয়। এবং স্বাধীনতা-দিবসের শপথের মধ্যে চরকা কাটা ইত্যাদি সম্পর্কে উক্তি অন্তর্ভুক্ত করে সেই শপথকে যেন হেয় করা না হয়।

খোলাখুলি বলতে কি, যুদ্ধে গ্রেটব্রিটেনকে বিনা শর্তে সমর্থন করার জন্য মহাত্মা গান্ধী যে সুস্পষ্ট নেতৃত্ব দিচ্ছেন, নীতির দিক থেকে তা যতই ভুল হোক, সেই নেতৃত্বকে অনুসরণ করা, বিভ্রান্তিকর চিন্তার আশ্রয় নেওয়া অথবা লক্ষ্যহীন আঁকাবাঁকা পথে ঘুরে মরার চেয়ে অনেক বেশী সততাসম্মত।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছ থেকে যে কার্যক্রম জানা গেছে তা থেকে এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে রামগড়ে কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশন অনুষ্ঠিত না হওয়া অবধি, অর্থাৎ, ১৯৪০-এর মার্চ মাসের শেষাশেষি পর্যন্ত কোন আন্দোলনের কথা চিন্তা করা হচ্ছে না। আমরা জানি,

যেখানেই আপৎকালীন জরুরী অবস্থা দেখা দিয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসের ক্ষেত্রে তা হয়নি, শান্তির সময়ে যে কার্যক্রম অনুসরণ করা হয়ে থাকে কংগ্রেস কার্যত' তাই অনুসরণ করছে। এবং ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি, ওয়ার্কিং কমিটি বামপন্থীর বিরুদ্ধে জেহাদ চালিয়ে যাবার অভূতপূর্ব এক কৃতিত্ব অর্জন করেছে, যদিও অন্যান্য দেশে অনুরূপ সঙ্কটে দলীয় রাজনীতিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতবী রাখা হয়ে থাকে।

কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের এই অদ্ভুত আচরণের কারণ কী? ফ্যাসিস্ট ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপসের কথা তাঁরা চিন্তা করতে পারেন অথচ যেখানে বামপন্থীরা বা ফরওয়ার্ড ব্লক জড়িত সেখানে চরম নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। তোমাদের কাছে এই ঘটনা ব্যাখ্যা করার ভার ছেড়ে দিচ্ছি—তবে প্রসঙ্গক্রমে আমি শুধু এইটুকু বলে রাখতে চাই যে, কংগ্রেসের ভিতরে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে যে লড়াই চলেছে তার লক্ষ্য আজকের দিনে ততটা নয় যতটা আগামী কাল এবং দলীয় লড়াইয়ের অন্তরালে সব সময় যা চলেছে আসলে তা শ্রেণীসংগ্রাম—হয়তো তা নির্জ্ঞাত শ্রেণীসংগ্রাম। আমাদের হাইকম্যাণ্ডের নিরাবেগ, নির্মম, স্থিরপ্রতিজ্ঞ মনোভাব অহিংসার সম্পূর্ণ অভাবের নিদর্শন এবং ভারতীয় অবস্থাসঞ্জাত কূট-রাজনীতির বহিঃপ্রকাশ।

সমস্যা এই—"আমাদের হাইকম্যাণ্ডের সামনে, তাঁদের কূট ও অনির্দিষ্ট নীতির সামনে আমরা কী করতে পারি?" অতীত অভিজ্ঞতা থেকে, বিশেষ করে ১৯৩৯-এর জানুয়ারি মাসের অভিজ্ঞতা থেকে বিচার করলে আমার কোন সন্দেহ থাকে না যে, তাঁদের নিজেদের লোকদের সঙ্গে ব্যবহারে রাজনৈতিক কূটকৌশল প্রয়োগে তাঁরা ধুরন্ধর। তাঁরা তাঁদের নিজেদের স্বরূপ ব্যক্ত করতে অথবা তাঁদের ভুল নীতিকে প্রকাশ করতে দিতে সহজে রাজী হবেন না, তাঁদের পৃথক করতে গেলেও সহজে তাঁরা নিজেদের পৃথক হতে দেবেন না। তাঁদের সর্বশেষ ধাপ্পা, অর্থাৎ মেকী কন্‌স্টিটিউয়েন্ট এসেম্‌ব্লির জন্য তাঁদের দাবি, এই

কথার প্রমাণ। অত্যন্ত কৌশলে এবং প্রায় সবার নজর এড়িয়ে তাঁরা আমাদের যা জাতীয় দাবি, সেই পূর্ণস্বরাজের দাবির জায়গায় কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্‌ব্লির দাবি আমদানি করেছেন। হয়তো তাঁরা মনে করেন, এই মেকী কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্‌ব্লি পেয়ে যাওয়ার কিছুটা সম্ভাবনা আছে এবং যদি এতে তাঁরা সফল হন, তাহলে সংঘর্ষকে তাঁরা এড়িয়ে যেতে পারবেন। মনে হচ্ছে, যে কোন ফন্দিফিকির গ্রহণ করতে তাঁরা পিছপা নন যদি তার দ্বারা শুধু লড়াইটাকে মুলতবী রাখা যায়।

কিন্তু কিসের জন্য তাঁরা সংগ্রাম এড়িয়ে যেতে চাইছেন? সমস্ত ব্যাপারটার পিছনে আসল সত্য কী? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন —তবে আমার অনুমান, তাঁরা ভয় পাচ্ছেন। একবার যদি দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিচালন ও নেতৃত্ব তাঁদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। অতএব তাঁদের মতলব এই, প্রদেশ-গুলিতে ইতিমধ্যে তাঁরা যে ক্ষমতা অর্জন করেছেন তা বজায় রাখা এবং ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে কেন্দ্রে কিছুটা ক্ষমতা আদায়ের জন্য চেষ্টা করা। এই কারণে গুজব রটেছে যে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা আবার ফিরে আসার তোড়জোড় করছেন। এই কারণেই কংগ্রেসকে বামপন্থীমুক্ত করার প্রয়াস। এই কারণেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উপর প্রতিশোধ চলেছে। এবং এই কারণেই অধিক সংখ্যায় সদস্য হওয়ার মধ্যে দিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে জনতার অনুপ্রবেশকে যাতে প্রতিহত করা যায় এবং কংগ্রেসকে যাতে দক্ষিণপন্থীদের সুরক্ষিত ঘাঁটিতে পরিণত করা যায় সেইজন্য বিস্তৃতভাবে চেষ্টা চলেছে।

উপরে যে আশঙ্কার কথা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন নয়। নতুন নতুন যেসব শক্তি ও কর্মী গত কয়েক বছরে দেখা দিয়েছে তাদের সঙ্গে দক্ষিণপন্থীদের কোন সংস্পর্শ নেই। আমাদের জিজ্ঞাস্য, কিষাণ আন্দোলনের সঙ্গে, শ্রমিকশ্রেণী আন্দোলনের সঙ্গে, ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে, যুব আন্দোলনের সঙ্গে এবং দেশের নানা স্থানের বৈপ্লবিক ও প্রগতিশীল আন্দোলনগুলির সঙ্গে তাঁদের কতটুকু যোগা-যোগ আছে? এ ছাড়া তাঁরা আমাদের মুসলিম দেশপ্রেমিকদের ও

দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের আস্থা হারিয়েছেন। অতএব এই আশঙ্কা তাঁদের মনে গেঁথে আছে যে, যদি সংগ্রাম শুরু হয়, আন্দোলনের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব থাকবে না এবং শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের উপর কর্তৃত্বও খোয়াতে হতে পারে।

কিন্তু এই যুক্তিতে এমন একটা ভুল আছে যা দক্ষিণপন্থীদের পক্ষে মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই ভয় ও আশঙ্কার দরুন যদি তাঁরা লড়াই থেকে পিছিয়ে পড়েন তবে সেই পিছিয়ে-পড়া থেকেই প্রমাণ হবে তাঁরা চলার শক্তি হারিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দক্ষিণপন্থী কৌশল কী তা বিবেচনা করে দেখতে হয়। চাপে পড়ে হয়তো তাঁরা তাঁদের ব্যাপক প্রয়োগকৌশল বদলাতে পারেন এবং সত্যিই সংগ্রাম শুরু করতে পারেন। কিন্তু তাতে আমাদের সমস্যার যে সমাধান হয়ে যাবে তা ভাবা ঠিক হবে না। যদি ওইরকম অবস্থার চাপে সংগ্রাম শুরু হয়, তাহলে দক্ষিণপন্থীদের মতলব থাকবে কোন-না-কোন উপায়ে মাঝপথে সেই সংগ্রামকে বন্ধ করে দেওয়া। অতএব সেক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং যাতে ১৯২২ সালের চৌরিচৌরা ঘটনার মত আরেকটি ঘটনা না ঘটে, ১৯৩২ সালের হরিজন আন্দোলনের মত আরেকবার বিপথযাত্রা যাতে না করতে হয়, অথবা ১৯৩১-এর গান্ধী-আরউইন চুক্তির মত আরেকটি চুক্তি যাতে না হয় সেইদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। সতর্ক দৃষ্টির অভাবে দক্ষিণপন্থীরা যে সংগ্রাম শুরু করবে তার পরিণতি হবে চরম বিপর্যয়ে। অতএব বামপন্থীদের পক্ষে সবচেয়ে সেরা পন্থা হবে সুস্পষ্ট-ভাবে আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া, কী উদ্দেশ্য এবং কোন্ মানসিক্ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তারা সংগ্রামে যোগদান করবে, সেই সংগ্রাম বাম-পন্থীরাই শুরু করুক বা দক্ষিণপন্থীরাই শুরু করুক।

কন্‌স্টিটিউয়েন্ট এসেম্‌ব্লি সম্পর্কে এখানে কিছু বলা দরকার। ক্ষমতার হস্তান্তর হবার পর সরকার যে কন্‌স্টিটিউয়েন্ট এসেম্‌ব্লি আহ্বান করে তাই যথার্থ কন্‌স্টিটিউয়েন্ট ন্যাশনাল এসেম্‌ব্লি। যে এসেম্‌ব্লি সাম্রাজ্যবাদী সরকার ও সাম্রাজ্যবাদী নির্বাচকমণ্ডলীর আহ্বানে এবং

তাদের আওতায় মিলিত হচ্ছে তা নিশ্চিতভাবে কংগ্রেসের ও ভারতীয় জনগণের সর্বনাশ ডেকে আনবে। সময় থাকতে তার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠুক এবং ব্রিটিশ সরকার তাদের নিজেদের স্বার্থে যদি এই দাবি পূরণ করে তাহলে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে পূর্বাহ্নে আমাদের দেশবাসীকে সাবধান করে দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের সমস্যা জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার সমস্যা। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কি তা শুরু করবে? তাই আমরা সকলেই চাই এবং তার দ্বারাই ঐক্যবদ্ধ এক কংগ্রেসকে আন্দোলনের মধ্যে নামিয়ে আনা যাবে। কিন্তু তাঁরা যদি পিছিয়ে থাকেন ? আমরা কি তাহলে পিছিয়ে থাকব ? দেশ তাঁদেরও যেমন আমাদেরও তেমনই। আমাদের সবার মাতৃভূমির প্রতি নারী পুরুষ নির্বিশেষে আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য পালন করার দায়িত্ব আছে। অতএব আমাদের ইতিহাসের এই সঙ্কটকালে আমরা পিছিয়ে থাকতে পারি না। নেতারা যদি আমাদের নিরাশ করেন, আমাদের নিজেদের যতটুকু শক্তি ও সামর্থ্য আছে তাই সম্বল করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।

এমন কি যদি বামপন্থীরাও সংগ্রাম শুরু করে, তাতেই যে সংগ্রাম বামপন্থী সংগ্রাম হবে এমন কোন কথা নেই। দক্ষিণপন্থী বা বামপন্থী যেই সংগ্রামের ডাক দিক না কেন, সেই সংগ্রাম হবে জাতীয় সংগ্রাম। কী ভাবে ডাক এল তার সঙ্গে সংগ্রামের প্রকৃতিকে এক করে দেখলে মারাত্মক ভুল হবে।

এই প্রসঙ্গে অখণ্ডনীয় তথ্যের ভিত্তিতে আমি না বলে পারছি না যে, ১৯২৯ বা ১৯৩০ বা ১৯৩২ সালের কংগ্রেসের থেকে কংগ্রেস আজ অনেক শক্তিশালী। যদি অনেক কম শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে আমরা তিনবার লড়াই চালিয়ে আসতে পারি, বর্তমান সঙ্কটে কি আমরা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাব ?

অতএব তোমাদের কাছে আমার আবেদন, আসন্ন সংগ্রামের জন্য তোমরা কোমর বাঁধো, তৈরি হও। সংগ্রাম সমাগত—কে ডাক দিয়েছে তাতে কী এসে যায়।

আজ এক জটিল পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তোমরা যে কিছুকালের জন্য বিভ্রান্ত বোধ করবে, তা খুবই সম্ভব। কংগ্রেসের দ্বিধাগ্রস্ত, অনির্দিষ্ট নীতি এই বিমূঢ়তা বৃদ্ধি করছে। কোন কোন সাম্প্রদায়িক সংগঠনের বিপজ্জনক দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্থিতি দুরূহতর করে তুলছে। বামপন্থীদের নিজেদের ভিতরেও যখন একতার অভাব, তখন যে কোন সাধারণ মানুষের মনোবল প্রায় ভেঙে পড়াই স্বাভাবিক। যদিও তোমরা কোণঠাসা হয়ে দাঁড়িয়ে আছ, তবু এক মুহূর্তের জন্য সাহস বা আত্মবিশ্বাস হারিও না। কমরেডগণ. মনে রেখো, বামপন্থী আন্দোলন আজ চরম পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে চলেছে। তুমি ও আমি এই সঙ্কট কী ভাবে অতিক্রম করি তার উপরে এর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। আরও মনে রেখো, ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করার পরম সুযোগ এখন আমাদের সামনে সমুপস্থিত। আমরা কেবল আমাদের সবনাশের বিনিময়ে এরকম দুর্লভ সুযোগ হারাতে পারি। যদি আমরা অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অপারগ হই, ভবিষ্যৎ বংশধরেরা কখনই আমাদের ক্ষমা করবে না।

আমি স্বীকার করছি আমি তাদের দলে নই যারা হীনতাভাবে ভোগে। আমি বিশ্বাস করি যে, যদি বামপন্থীদের কাছ থেকেও ডাক আসে, জনসাধারণ স্বতঃই সে ডাকে সাড়া দেবে। যদিও নিছক সাংগঠনিক দিক থেকে আমরা তুলনায় অনেক দুর্বল, তবু সম্মিলিত দক্ষিণপন্থীদের থেকে সম্মিলিত বামপন্থীদের গণসমর্থন অনেক বেশি। মহাত্মা গান্ধী বা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছ থেকে যে নেতৃত্ব পাবার জন্য দেশ প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষা করছে, তাঁরা যদি তা না দেন, তাহলে আমরা কিসের জন্য দ্বিধা করব? জাতীয় আন্দোলনের সূচীমুখ হবার জন্য ইতিহাস দেবতা যদি বামশক্তিকে ডাক দেয়, তার জন্য আমরা যেন দুঃখিত না হই। অপরপক্ষে, আমাদের আন্দোলনের নেতৃত্ব করার ভূমিকা যদি আমাদের উপরেই বর্তায়, সে সুযোগ আমরা যেন সাদরে গ্রহণ করি। তার দ্বারা স্বরাজ অর্জন করতে, দক্ষিণপন্থীদের পৃথক

করতে এবং দেশবাসীর চিত্তে বামপন্থী আন্দোলনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে আমরা সাহায্য করব।

দক্ষিণপন্থীদের অবিরাম আক্রমণে এবং বিপথে চালিত তাঁদের যে কূটকৌশলে জাতীয় দাবি মেকী কন্‌স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্‌ব্লির দাবিতে পরিণত হয়েছে তাতে যদি তোমরা বিচলিত বোধ কর, তাহলে তোমাদের কাছে আমার আবেদন, সাহসে ও বিশ্বাসে অটল থেকে জাতীয় সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিআক্রমণ শুরু কর। একমাত্র এই উপায়েই আশা করা যেতে পারে আমাদের দক্ষিণপন্থী বন্ধুদের কূটকৌশল ব্যর্থ হবে।

এককালীন অন্যতম বামপন্থী নেতা 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় একবার একটি বাণী দিয়েছিলেন। এই গুরুতর মুহূর্তে সেই বাণীর কথা আমার মনে পড়ছে। তিনি বলেছিলেন, "স্বাধীনতা তারাই লাভ করে যারা সাহসে ভর করে কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে।" সাহসে ভর করে কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় আমাদের সবার কাছেই এসেছে এবং সঙ্কটসঙ্কুল এই সন্ধিক্ষণে আমাদের মধ্যে কেউ যেন পিছিয়ে না পড়ি। বিখ্যাত এক ইটালিয়ান জেনারেল, তাঁর দেশে যখন বিপ্লব চলেছে তখন তাঁর অসংখ্য অনুগামীদের উদ্দেশে উদ্দীপনাপূর্ণ যে কটি কথা বলেন, আজ আমার তা মনে পড়ছে। তিনি বলেন, "তোমরা যদি আমাকে অনুসরণ কর, আমি তোমাদের দেব ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অভাব, অনিবার্য পথ চলা এবং মৃত্যু।" এই কথাগুলি আমাদের কানে এখন ধ্বনিত হতে থাক এবং সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে ও সাহসে ভর করে কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে আমাদের অনুপ্রাণিত করুক। একমাত্র তখনই আমরা স্বরাজ ও জয় লাভ করতে পারব।

সম্মুখে বিপদ

৬ই জানুয়ারি ১৯৪০-এর 'ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়

আমাদের আগের সংখ্যায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সাম্প্রতিকতম চাল, অর্থাৎ, কন্‌স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্লি সম্পর্কে তাঁদের দাবি সম্পর্কে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কন্‌স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্লির ধারণা বা তার দাবি নতুন কিছু নয়। কংগ্রেস বারে বারে তার নানা প্রস্তাবে এর উল্লেখ করেছে। কিন্তু বর্তমান দাবির যে রূপ এবং যে প্রণালীতে ও যে অবস্থায় তা পেশ করা হচ্ছে তা সত্যিই অভিনব এবং সে দিক থেকে অবাঞ্ছিতভাবেই অভিনব। এবং এর ভিতরে সবচেয়ে মারাত্মক দিক হচ্ছে এই যে, এই দাবিটিকে সবার অলক্ষ্যে পূর্ণ স্বরাজের জন্য আমাদের জাতীয় দাবির বদলে কার্যত চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক কূটকৌশলের দিক থেকে চালটা নিঃসন্দেহে তোখড় এবং বামপন্থী সমেত বহুসংখ্যক কংগ্রেসকর্মী যারা যথেষ্ট সতর্ক নয় তারা হতবুদ্ধি হয়ে যাবে।

ওই চালটির বিপজ্জনক তাৎপর্য পুরোপুরি বুঝতে গেলে কন্‌স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্লি বলতে বাস্তবিক কী বোঝায় সে সম্পর্কে আমাদের মনে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। তা বলতে নিঃসন্দেহে এমন একটি এসেম্ব্লি বা সভা বোঝায় যা কন্‌স্টিটিউশন বা সংবিধান রচনা করার সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যে নির্বাচিত। কিন্তু এই সভা আহ্বান করে কে? কখন এবং কোন্ কোন্ অবস্থায় সভা আহ্বান করা হয়ে থাকে এবং তা সত্যই সম্মিলিত হয়? এর সিদ্ধান্তগুলিকে কিভাবে কার্যকর করা হয় এবং কেই বা তা করে থাকে? কন্‌স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্লি সংক্রান্ত এই প্রশ্নগুলি প্রাসঙ্গিক এবং এইগুলির জবাব দেওয়া দরকার।

কংগ্রেস থেকে কন্‌স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্লির কথা যখন প্রথম তোলা হয় তখন যাদের ইতিহাস ও রাজনীতি সম্পর্কে কিছু জ্ঞান ছিল তারা ভেবেছিল জাতীয় সংগ্রামের শেষে ক্ষমতা দখল করা হলে পর ওই এসেম্ব্লি বা সভা আহ্বান করা হবে। লড়াইয়ে জেতবার পর জনগণের

প্রতিনিধিদের কাছে যখন ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে, তারা তখন জাতীয় সরকার কিংবা অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন করবে। এই সরকার জনগণের জন্য সংবিধান রচনা করতে একটি কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্লি আহ্বান করবে। সার্থক সংগ্রামের পর যথার্থ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত এইরকম সরকারের উপর যখন দেশের শাসনভার থাকবে, দুষ্কৃতকারী ভারতীয় বা বিদেশী দালালদের পক্ষে তখন যে কোন ভাবে সভার উদ্দেশ্যকে পণ্ড করা অসম্ভব না হলেও সহজ হবে না। কিন্তু কী হবে যদি বর্তমান দাবি ব্রিটিশ সরকার এখন পূরণ করে দেয়? তাহলে ব্রিটিশ সরকার কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্লি আহ্বান করবে। পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে তা নির্বাচিত হবে। বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী সরকারের আওতায় সেই সভা বসবে। কোনই নিশ্চয়তা থাকবে না, ওই এসেম্ব্লির বা সভার সিদ্ধান্তগুলিকে ব্রিটিশ সরকার কার্যকর করবে কিনা। এবং এটি হয়ে দাঁড়াবে সম্মানিত এক বিতর্ক-সভা। তাছাড়া এসেম্ব্লি কক্ষটি দেশের যাবতীয় সাম্প্রদায়িক শক্তির যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যবসিত হবে। বর্তমান সরকার যাতে নেপথ্য থেকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুতুল-নাচের দড়ি ইচ্ছামত টানতে পারে তার ব্যবস্থা রাখবে। কোন একটা অঘটন যদি না ঘটে তাহলে এসেম্ব্লির ভিতরকার কলহ-বিবাদের পরিণতি হবে পুরোপুরি অচলাবস্থা এবং এসেম্ব্লি নিষ্ফল বলে প্রমাণিত হবে। ব্রিটিশ সরকার তখন এই বিয়োগান্ত নাটকের রচয়িতা হিসেবে কংগ্রেসকে দেখাবে। এবং তারা তখন বড়াই করবে যে, তারা বিনাশর্তে কংগ্রেসের দাবি মেনে নিয়েছিল। এইরকম বিপাকে পড়ে কংগ্রেস কী জবাব দিতে সক্ষম হবে?

এই পথে পদক্ষেপ অত্যন্ত বিপজ্জনক হবে এবং আমরা এইটুকু আশা করতে পারি যে সরকার, তাদের নিজেদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে, এতে সম্মত হবে না। যদি তারা তা করে, তবে কংগ্রেস নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনবে।

এই সঙ্কট সময়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কী করে এই ধরনের দাবি পেশ করতে পারল সাধারণ লোকের পক্ষে তা বোঝা দুষ্কর।

পৃথক নির্বাচনমণ্ডলীতে তাঁরা সম্মত আছেন জানিয়েছেন, যদিও তার পরিণাম কী তা তাঁরা জানেন। তাঁরা দাবি করেননি যে, পূর্বাহ্নে এইমত ঘোষণা করতে হবে যে, এসেম্ব্লিতে গৃহীত সব সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ সরকার অতি অবশ্য কার্যকর করবে। সুতরাং এসেম্ব্লি যদিও বা সর্বসম্মত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছয়, তাহলেও ব্রিটিশ সরকারের বা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের পক্ষে তা পুনঃপরীক্ষা করা, সংশোধন করা বা অদলবদল করার পথ খোলা থাকবে—যেমন ছিল ভারত সম্পর্কে গোলটেবিল বৈঠকের ক্ষেত্রে।

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক এই দাবি মেনে নেওয়ার সম্ভাবনা যে ভালোমতই আছে, এরকম লক্ষণের অভাব নেই। তা থাকবেই বা না কেন? এতে তাদের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই, বরঞ্চ এ থেকে তাদের লাভই হবে। গ্রেটব্রিটেন থেকে যে দূতেরা সম্প্রতি ভারত সফরে এসেছিল তারা সংগ্রাম স্থগিত রাখার জন্য কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে গেছে। তারা এমন আশার কথাও বলেছে যে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ভারতের ব্যাপারটা নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে একটা মীমাংসায় আসার মত অবস্থা দেখা দেবে, এবং সংরক্ষণশীলদের মতও নাকি এই দিকে এখন ভিড়ছে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এই ধরনের প্রলোভন কোন জাতীয় নেতার মনে কোনই রেখাপাত করে না, কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটির কথা আলাদা। তাঁরা অনির্দিষ্টকালের জন্য যাতে সংগ্রাম স্থগিত রাখা যায় সেইজন্য যে কোন অছিলা, যে কোন যুক্তি খুঁজে বার করার জন্য উদ্‌গ্রীব। ভবিষ্যতে গ্রেটব্রিটেন থেকে খুব সম্ভব আরও দূতকে নিয়মিতভাবে ও ঘন ঘন আমরা আসতে দেখব।

আরও একটি বাস্তব দিক ভেবে দেখার আছে, যা, আমাদের সামনে যে বিপদ রয়েছে সে সম্পর্কে আরও বেশি করে আমাদের চোখ খুলে দেবে। সংগ্রামে জয়লাভ করার পর জাতির যাঁরা নেতা তাঁরা সর্বদা প্রচণ্ড প্রভাব ও মর্যাদা নিয়ে আবির্ভূত হন এবং সেই কারণে তাঁরা জনগণকে চালিত করতে ও জনমত গঠন করতে সক্ষম হন। জনসাধারণেরও নেতাদের উপর আস্থা এত বৃদ্ধি পায় যে তা

প্রায় অন্ধবিশ্বাসে দাঁড়িয়ে যায়। এইরকম অবস্থায় একমাত্র এই নেতারাই কন্‌স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্‌ব্লির আলাপ-আলোচনাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন এবং তখনই দুষ্কৃতকারীদের বা প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে ওই সংস্থার উদ্দেশ্যকে পণ্ড করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কংগ্রেস যে রকম চাইছে সেইমত কন্‌স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্‌ব্লি গঠিত হলে সুনিশ্চিতভাবে তা নানারকম ষড়যন্ত্র ও ছলচাতুরির ঘাঁটিতে পরিণত হবে। এমন কোন ব্যক্তি বা সংগঠন থাকবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহ আছে, যা এখানকার আলাপ-আলোচনাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করার মত যথেষ্ট প্রভাব ও মর্যাদার অধিকারী। কংগ্রেসকর্মীদের নিজেদের কথা বলতে গেলে, আজকের কংগ্রেস সংগঠন দক্ষিণপন্থীদের করায়ত্ত, বামপন্থীদের তুলনায় তাঁরাই বিপুল সংখ্যায় নির্বাচিত হবেন। কপালগুণে যদি কোন মীমাংসায় পৌছনো যায় তাহলে মতৈক্যের ব্যাপকতম অংশটি সবচেয়ে প্রগতিশীল অভিমত দ্বারা নির্ণীত হবে না, নির্ণীত হবে সবচেয়ে মধ্যপন্থী অভিমত দ্বারা। অতএব, সব দিক থেকে বিবেচনা করে দেখলে, মেকী কন্‌স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্‌ব্লির দাবিকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের একটি দৃশ্যের কথা মনে পড়ছে। দৃশ্যটি ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর রাশিয়ায় কন্‌স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্‌ব্লি যখন মিলিত হয় তখনকার। বিরাট এক সমাবেশ, জারতন্ত্রী শাসনের বিরুদ্ধে সবরকম মতের লোক সেখানে রয়েছে। সবচেয়ে প্রগতিশীল দলের বলশেভিকরা সেখানে সংখ্যায় নগণ্য। নানা মত ও পথের ওই এসেম্‌ব্লি কেরেন্‌স্কি-মার্কা পেশাদার বক্তা ও ফাঁকা বুলির বিপ্লববাদীদের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হচ্ছিল। বলশেভিকরা এইসব দেখে স্থির বুঝল যে এতে কোনই ফল হবে না। তারা তখন এসেম্‌ব্লি থেকে বেরিয়ে এসে তা ভেঙে দেবার আদেশ জারি করল। তার পরে যা হয়েছে তা এখন ইতিহাসে পর্যবসিত। কন্‌স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্‌ব্লির মৃত্যু ঘটল কিন্তু বিপ্লব বেঁচে রইল। বলশেভিকরা যদি কন্‌স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্‌ব্লিকে ধরে থাকত তাহলে কী হত এখন তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে।

রাশিয়ান কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্লির ক্ষেত্রে বিদেশী দালালদের কাছ থেকে কোন বিপদের সম্ভাবনা ছিল না। থাকলেও তা সামান্য। বলশেভিকদের একমাত্র আশঙ্কা ছিল, মেনশেভিকরা, মধ্যপন্থীরা এবং প্রতিক্রিয়াশীলরা এসেম্ব্লির উপর আধিপত্য বিস্তার করবে এবং নিজেদের সুবিধামাফিক আলাপ-আলোচনাকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। এই কারণে তা ভেঙে দেবার তাগিদ তারা বোধ করেছিল।

রাশিয়ানদের থেকে আইরিশ দৃষ্টান্ত আরও প্রাসঙ্গিক ও আকর্ষণীয়। মহাযুদ্ধের পর যখন আইরিশ জনগণ—বিশেষ করে সিন্ ফীন্ পার্টি—সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল, গ্রেটব্রিটেনের তখনকার প্রধানমন্ত্রী মিস্টার লয়েড জর্জ একই প্রকার এক পরীক্ষা চালান। তিনি আইরিশ জনগণকে ডেকে বললেন তারা একটি আইরিশ কনভেনশন মারফত নিজেদের সংবিধান যেন নিজেরা রচনা করে। এই আইরিশ কনভেনশন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এখন যে কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্লি দাবি করছে তারই আইরিশ সংস্করণ। সিন্ ফীন্ নেতারা ছিল আমাদের নেতাদের থেকে অনেক বেশি চতুর ও দূরদর্শী। তাই তারা আইরিশ কনভেনশনকে নিদারুভাবে ফাঁকা রেখে বাইরে থেকে তাদের কাজ চালিয়ে চলল। কনভেনশন কিছুদিন বসল, কিছু আলাপ-আলোচনা হল, কিন্তু সিন্ ফীন্ পার্টির অনুপস্থিতিতে সব ব্যাপারটাই অর্থহীন হয়ে দাঁড়াল। কনভেনশন ভেঙে গেল; সিন্ ফীন্ পার্টির লোকেরা তাদের লড়াই চালিয়ে চলল এবং যা কিছু স্বাধীনতা আয়ার্লাণ্ড অর্জন করেছে তা তাদেরই প্রয়াসের ফল।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এই বিপজ্জনক চালের প্রতিবাদে সোচ্চার হতে আমরা যেন কালক্ষেপ না করি এবং বাধা দেবার সময় থাকতে আগেভাগে প্রস্তাবিত কনস্টিটিউয়েণ্ট এসেম্ব্লিকে আমরা যেন প্রত্যাখ্যান করি। এবং সোজা কথায় আমরা যেন কমিটিকে জানিয়ে দিই, সংগ্রামের পথে তাঁরা যদি দেশকে চালিয়ে নিয়ে যেতে না পারেন, অন্ততপক্ষে তাঁরা এইরকম অনিষ্টকর ও বিপজ্জনক কৌশল অবলম্বন করা থেকে যেন বিরত থাকেন।

রামগড়

১৩ই জানুয়ারি, ১৯৪০—'ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

ফরওয়ার্ড ব্লক-এর সামনে ঘোরতর দুঃসময়। জন্মক্ষণ থেকে ব্লককে দু-মুখী সংগ্রাম চালাতে হচ্ছে, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং ভারতীয় প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে। তা যে পথ গ্রহণ করেছিল তা সহজ ছিল না, কিন্তু ভারতীয় প্রতিবিপ্লব যে এত নির্মম, এত প্রতিহিংসাপরায়ণ, এত অনমনীয় হতে পারে, বাস্তবক্ষেত্রে যা সম্ভব বলে দেখা যাচ্ছে, কেউ তা ভেবেছিল কিনা সন্দেহ। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি, বেশীর ভাগ সময় বাইরে থেকে চাপানো সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই করার থেকে অনেক বেশী কষ্টকর স্বদেশের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যোঝা। সম্প্রতি কয়েক মাসের মধ্যে আমরা দেখেছি, কত নিকট বন্ধু যারা বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাহসের সঙ্গে লড়তে পারত, দক্ষিণপন্থার আক্রমণে তারা নতি স্বীকার করেছে।

সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ চোখে, ইতিহাসের ছাত্র যে চোখে দেখে সেইভাবে, এই দৃশ্যটির দিকে মুহূর্তের জন্য যদি দৃষ্টিক্ষেপ করা যায় তাহলে দক্ষিণপন্থীদের তারিফ না করে পারা যায় না। তারা মুখে যতই অহিংসা ও সহিষ্ণুতার কথা বলুক না কেন, এই রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে তারা সর্বস্বপণ করে উঠে-পড়ে লেগেছে। এরই নাম কূট-রাজনীতি, ইতিহাসে যা সুবিদিত। এই দ্বন্দ্ব সব রাজনৈতিক যোদ্ধাদের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে বাধ্য—এমন কি তাদেরও মনে যারা বর্তমানে নিগৃহীত হচ্ছে।

ফরওয়ার্ড ব্লক-এর অন্যতম প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসে এবং দেশের ভিতরে যারা বামপন্থী আছে তাদের সুসংহত করা। ব্লক-এর আওতায় যখন তা সম্ভব হল না, বামপন্থী সংহতি কমিটি গঠন করা হল। কমিটি তার পর থেকে উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে চলেছে।

১৯৩৯-এর জুন মাসে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় যে মুহূর্তে তার শক্তি প্রকাশ পেল, সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-পন্থীদের আক্রমণ শুরু হল—৯ই জুলাইয়ের প্রতিবাদ আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য হল। সেই থেকে বামপন্থী সংহতি কমিটি থেকে কিছু কিছু বামপন্থী কর্মী নিয়মিতভাবে খসে যাচ্ছে। বামপন্থীদের আয়ত্তে আনার জন্য ঝানু দক্ষিণপন্থী নেতারা দ্বৈত নীতি অনুসরণ করে চলেছে। যাদের নরম মনোভাব, যাদের 'যুক্তি' দিয়ে বোঝানো যায়, তাদের নিয়মিতভাবে তোষামোদ করা হচ্ছে। যারা কড়া ধাতের তাদের উপর নৃশংস ব্যবহার করা হচ্ছে। এর ফলে বামপন্থীদের দলগুলি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। বামপন্থীদের অবস্থা আরও শোচনীয় করে তোলার জন্য কয়েকটি প্রদেশে অব্যাহতভাবে সরকারী নির্যাতন চালানো হচ্ছে এবং কংগ্রেসী আমলেই প্রথমে তা চালানো হয়। বামপন্থী সংহতি একান্ত আর সম্ভব কিনা সে সম্পর্কে আজ সন্দেহ জাগছে।

বামপন্থী সংহতি এই দুটির যে কোন একটি উপায়ে সম্ভব। প্রথম উপায় আমরা ইতিমধ্যে যা গ্রহণ করেছি, যথা, ন্যূনতম সাধারণ এক কর্মপন্থার ভিত্তিতে বামপন্থীদের এক সাধারণ মঞ্চে সমবেত করা। এই উপায় যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে আরও একটি উপায় এখনও আমাদের সামনে খোলা রয়েছে। গত কয়েক মাসের ঘটনাবলী বামপন্থীদের কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছে—নিদারুণ দুর্যোগ তাদের অতিক্রম করতে হয়েছে। এর ফলে কিছু বাদ গেলেও, সবাই যায়নি। সাহসের সঙ্গে যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, তারা প্রমাণ করেছে যে তারা খাঁটি বামপন্থী, এখন বামপন্থী সংহতি বলতে তাদের সংহতি বোঝাবে। প্রাকৃতিক জগতে প্রায়ই বন্যার আগে সব নদী মজে যায়। দলের শক্তি হ্রাস পাওয়া অনেক সময় অভাবিত শক্তিবৃদ্ধির পূর্বাভাস। এদেশে বামপন্থী আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তাই হবে। বিগত সংগ্রামে যারা বিশ্বাস হারায়নি তারা আমাদের সঙ্গে একমত হবে যে, সামনের অমানিশার অন্ধকার পার হলেই দেখা দেবে অরুণ উষার আলো।

ভারতের ইতিহাসে ফরওয়ার্ড ব্লক-এর ভূমিকা সংসদীয় বিরোধী-পক্ষের ভূমিকা নয়। কংগ্রেসের বর্তমান নীতি ও কার্যক্রমকে কেবলমাত্র জোরদার করে তোলাই ফরওয়ার্ড ব্লক-এর লক্ষ্য এরকম মন্তব্য আমাদের নজরে পড়েছে। এর চেয়ে বড় ভুল কিছু হতে পারে না। ব্লক-এর লক্ষ্য এমন কিছু যা নিশ্চিত ও গতিশীল। ইতিহাসের দ্বন্দ্বসমন্বয়ে বিপরীত তত্ত্বের ভূমিকা নঞর্থক নয়। তা নিশ্চিত ও গতিশীল এমন কিছু যা আমাদের প্রগতির পথে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমরা দুঃসময়ের যত নিকটবর্তী হব, ফরওরার্ড ব্লক-এর কিছু কিছু অংশ যে সে-সঙ্কটে-দমে যেতে পারে এমন সম্ভাবনা যে নেই তা নয়। কিন্তু পিছু হটলে আমাদের চলবে না—এমন কি পাঁয়তারা কষারও সময় নেই। ফরওয়ার্ড ব্লককে এগিয়ে যেতে হবে, ক্লান্তি নেই, বিরতি নেই। এই তার ঐতিহাসিক ভূমিকা। দৃঢ়তার সামনে দাঁড়াতে হবে অধিকতর দৃঢ়তা নিয়ে এবং নির্যাতনকে তুচ্ছ করতে হবে অবিচল বীরত্ব দিয়ে। একমাত্র তখনই আমরা দুর্যোগকে অতিক্রম করতে পারব—একমাত্র তখনই আমরা দুই ফ্রন্টের লড়াইয়ে সাফল্যলাভ করতে পারব। আমাদের আদর্শ ন্যায়সঙ্গত এবং আমাদের ভূমিকা ঐতিহাসিক। অতএব, সূচিভেদ্য অন্ধকার কিছুকালের জন্য আমাদের ঘিরে ফেললেও, আমরা যেন বিশ্বাস ও সাহস না হারাই।

এমন সময় আসে যখন যুক্তির আলোয় ভবিষ্যতের অন্ধকার ভেদ করা যায় না এবং এই সময়েই বিশ্বাস যাদের দৃঢ় নয় তারা কখনও কখনও সাহস ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যুক্তি যেখানে হার মানে, প্রজ্ঞা সেখানে এগিয়ে আসে! প্রজ্ঞার অন্তর্দৃষ্টি দুর্ভেদ্য অন্ধকারকে ভেদ করে আসন্ন ভবিষ্যৎকে আমাদের গোচরে আনে। আজ প্রজ্ঞার কাছ থেকে আমরা জানতে পারছি পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যা আমাদের আদর্শকে এবং আমাদের দমিয়ে রাখতে পারে। আমাদের ডাকে সর্বত্র যে অভূতপূর্ব সাড়া জাগে তার একটিমাত্র অর্থ হতে পারে। দ্বিমুখী নির্য্যাতন সত্ত্বেও, জনসাধারণ অনুভব করে আমরাই

সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলেছি—আমরাই তাদের ভাবনা ভাবছি, তাদের সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করছি।

সরকারের সঙ্গে একটা আপস হবার জোর গুজব আকাশে-বাতাসে ছড়িয়েছে। কেউ কেউ মনে করছে পরের মার্চে রামগড়ে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন বসবার আগেই একটা মীমাংসায় পৌঁছবার প্রয়াস করা হবে। অন্যেরা বলছে রামগড় কংগ্রেস কংগ্রেসের কার্যকরী সংস্থার উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত করবে এবং আপসের চূড়ান্ত চেষ্টা করা হবে মার্চের পরে। ভারতের তথাকথিত ইংরেজ বন্ধুরা দক্ষিণপন্থী নেতাদের পরামর্শ দিয়ে চলেছে যেন তারা পরের মার্চ পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তখন একটা চুক্তি সম্ভব হতে পারে। দক্ষিণপন্থীদের মতলবে রামগড় কংগ্রেস যে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাছাড়া বাংলাকে, সত্যিকার বাংলাকে রামগড় কংগ্রেস থেকে বাদ দেবার জন্য যে দৃঢ় সংকল্প নির্মম প্রয়াস চলেছে তার আর কী অর্থ করা যেতে পারে? দক্ষিণপন্থীরা যে পরিকল্পনা স্থির করেছে রামগড়ে তা অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে এবং ৫৪৪ জন ডেলিগেটের এক বাহিনী-সমন্বিত বাংলা কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের কাছে অসুবিধাজনক হয়ে উঠতে পারে। অতএব যেনতেন-প্রকারেণ বাংলাকে বাদ দিতেই হবে।

কিন্তু তা অত সহজ নয়। রামগড় কংগ্রেস থেকে বাংলাকে বাদ দিতে পার, কিন্তু ভারতের গণজীবন থেকে তাকে বাদ দিতে পারবে না।

বামপন্থীদের দিক থেকে রামগড়ের তেমন কিছু গুরুত্ব নাও থাকতে পারে—তবে ভারতের ইতিহাসে মার্চ মাসটার গুরুত্ব থেকে যাবে। অতএব এই মাসে বামপন্থীরা একত্রিত হয়ে দক্ষিণপন্থী নেতাদের বিপ্লববিরোধী ও আপসমূলক কলাকৌশলকে বাধা দেবার জন্য যেন প্রস্তুত হয়। এই প্রসঙ্গে বিহারের কোন জায়গায় রামগড় কংগ্রেস যখন হবে সেই সময়েই সারা ভারতে একটা কনফারেন্স করা দরকার। যারা এই কনফারেন্সে যোগ দিয়ে তা সাফল্যমণ্ডিত করবে তাদের মধ্যে এমন বামপন্থীরাও থাকবে যারা কংগ্রেস থেকে

রাজনৈতিক মতবাদের দরুন বিতাড়িত অথবা যাদের বিরুদ্ধে একই কারণে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী এবং ব্রিটিশ সরকার, দুয়েরই উপর এই ধরনের কনফারেন্সের সৎপ্রভাব কিছুটা পড়বে। দেশের সংগ্রামরত বামপন্থীদের এই কনফারেন্স উৎসাহিত করবে। রামগড় কংগ্রেসে যোগদানের জন্য ফরওয়ার্ড ব্লক-এর সদস্যদের চিন্তা না করলেও চলবে। বেশ কিছু বামপন্থীর উপর যখন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং রামগড় কংগ্রেসে যখন সত্যিকার বাংলা নেই, তখন কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার সুযোগ কমই পাওয়া যাবে। ব্লক-এর সদস্যরা বরং যত শীঘ্র সম্ভব পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করার জন্য তাদের সর্বশক্তি সংহত করুক

আমাদের সমস্যা

২৩শে জানুয়ারি, ১৯৪০, 'ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

১৯৩৯-এর ২২শে জুন বোম্বাইয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক-এর নিখিল ভারত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ব্লক-এর গঠনতন্ত্র ও কার্যক্রম গৃহীত হয়। সারা দেশে আমাদের নিজেদের সংগঠিত করতে ছয় মাসের কিছু বেশি সময় পেয়েছি। এই সময়ের মধ্যে আমরা কী করে উঠতে পেরেছি ?

সূচনাতেই বলে রাখা দরকার যে গত জুলাই থেকে আমরা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রচণ্ড আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে উঠেছি। তারা আমাদের নিশ্বাস ফেলবারও অবকাশ দেয়নি এবং গত ছয় বা সাত মাস ধরে আমরা কার্যত দুটো ফ্রণ্টে লড়াই চালিয়ে চলেছি।

অনেক সময় দেখা যায় ভারতীয় প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে লড়াই করার তুলনায় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই করা সহজ। সম্ভবত এখন সেইরকম সময়ই চলেছে।

এসব সত্ত্বেও আমরা সঙ্গতভাবে দাবি করতে পারি যে আজ "ফরওয়ার্ড ব্লক জিন্দাবাদ" স্লোগান জনগণের স্লোগান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ডাক সুদূর গ্রামে-গ্রামান্তরে পৌঁছিয়ে গেছে এবং সর্বত্র জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করেছে। উপরন্তু আজ ফরওয়ার্ড ব্লক-এর পশ্চাতে সর্বভারতীয় এক সংগঠন রয়েছে।

ফরওয়ার্ড ব্লক তার সূত্রপাত থেকে যে গণসমর্থন পেয়ে আসছে তা বাস্তবিক চমকপ্রদ এবং আমাদের সব প্রত্যাশাকে তা অতিক্রম করেছে। কী করে তা সম্ভব হল ভেবে অবাক হতে হয়, বিশেষ করে যখন স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল থেকে নিয়মিত ও ব্যাপক বিরোধিতার কথা মনে রাখা যায়। তার একমাত্র ব্যাখ্যা যা পাওয়া যায় তা এই যে, জনগণ স্বতঃই অনুভব করেছে যে ফরওয়ার্ড ব্লক এমন কিছুর প্রতীক যা দুর্জয় ও বেগবান—যা অগ্রণী ও প্রগতিশীল।

নিয়মতান্ত্রিকতা ও আপসের দিকে কংগ্রেসের যে ঝোঁক দেখা দিয়েছিল ব্লক তা বন্ধ করেছে এবং যে পচন শুরু হয়েছিল তার ফলে তা রোধ করা গেছে। অতএব, ফরওয়ার্ড ব্লক না থাকলে কংগ্রেস যা হত তার থেকে কংগ্রেস আজ অনেক বেশী শক্তিশালী। এর চেয়ে বড় কথা, ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক আজ বলতে পারে, বর্তমান সঙ্কটে প্রবীণ নেতারা যদি ব্যর্থ হয়, ফরওয়ার্ড ব্লক শেষ অবধি নিজেরাই এগিয়ে যাবে এবং সংগ্রাম শুরু করবে।

কিন্তু আমাদের আসল সমস্যা সাংগঠনিক সমস্যা। আমাদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার সঙ্গে তাল রেখে আমাদের সাংগঠনিক বিকাশ হয়নি।

একটা সংগঠনকে ত্রুটিহীন করা, সেইসঙ্গে নতুন কর্মীদল গড়ে তোলা অর্থ ও সময়সাপেক্ষ—সম্ভবত অর্থের থেকে সময়ই বেশি দরকার। আমাদের হাতে ছিল খুবই কম সময় এবং আমাদের যাত্রা আরম্ভ হতে না হতে আন্তর্জাতিক সঙ্কট আমাদের আচ্ছন্ন করে। কিন্তু যতদিন আমাদের সংগঠনকে ত্রুটিহীন না করছি ততদিন পর্যন্ত সাহসের সঙ্গে সেই সঙ্কটের সম্মুখীন হওয়াকে আমরা পিছিয়ে রাখতে পারি না। আপাতত আমাদের যতটুকু সহায়সম্বল আছে তাই নিয়েই সঙ্কটের মোকাবিলা করতে হবে। জাতীয় সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে সাংগঠনিক বিকাশও চলতে থাকবে। এ ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই।

ইতিমধ্যে, আমরা যেন সর্বদা মনে রাখি, আমাদের প্রধান সমস্যা সাংগঠনিক সমস্যা। সাহসের সঙ্গে আমাদের আসল সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হবে এবং একই সঙ্গে সাংগঠনিক বিকাশ সাধনের কাজ, আমরা যতদূর পারি, আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। ভাগ্য যদি প্রসন্ন হয়, সংগ্রামশেষে হয়ত আমরা ত্রুটিহীন সংগঠন নিয়ে আত্মপ্রকাশ করব।

পচন রোধ কর

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০-এর 'ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের মধ্যে আপসের প্রচণ্ড চেষ্টা চলেছে এরকম একটা গুজব সর্বত্র শোনা যাচ্ছে। আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রীদের সঙ্গে যারা ঘনিষ্ঠ এরকম মহল কংগ্রেস মন্ত্রীদের অবিলম্বে পুনরাগমন সম্পর্কে আশান্বিত এবং অত্যন্ত আগ্রহী। এই মুহূর্তে দুটো ব্যাপার অনুমান করা হচ্ছে। কেউ কেউ মনে করছে রামগড় কংগ্রেসে আগেই নিষ্পন্ন হয়ে গেছে এমন একটা ঘটনা পেশ করা হবে। আর সবার মতে রামগড় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বা মহাত্মা গান্ধীর উপর সম্পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত করবে এবং আপস কংগ্রেস অধিবেশনের পরে হবে, আগে হবে না। প্রথম অনুমানটা আমাদের কাছে সম্ভাব্য বলে বোধ হয় না। দ্বিতীয়টি সম্ভব কিনা যথাসময়ে দেখা যাবে। তবে একথা ঠিক যে মহাত্মা গান্ধী এবং ব্রিটিশ সরকার আপসের জন্য উদ্‌গ্রীব। গান্ধীজী লড়াই না করে স্বরাজ অর্জন করতে চান। পশ্চিম ফ্রন্টে বসন্তকালীন আক্রমণ শুরু হবার আগে সরকারও আপস চাইছে। এই লেখাটি লেখার সময় পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে আপসের জন্য গান্ধীজীর যা ন্যূনতম দাবি, ব্রিটিশ সরকার তাও মেনে নেবে বলে মনে হয় না। আমরা শুধুমাত্র গান্ধীজির কথাই উল্লেখ করছি কারণ ওয়ার্কিং কমিটি তাঁকেই অদ্বিতীয় ডিক্টেটর দাঁড় করিয়েছে।

কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে নামবে না, ইংরেজ সরকারের এই ধারণা। ইংরেজ সরকার এই কথাই ভাবছে এবং তার এই ধারণাই ভারতীয় দাবি মেনে নেবার জন্য বেশীদূর অগ্রসর হতে তাকে নিরস্ত করছে। ইওরোপীয় যুদ্ধজনিত নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া সত্ত্বেও, প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম ও অত্যন্ত দেরিতে দাবি পূরণের বহু দিনকার অভ্যাস ইংরেজ সরকার কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, তারা যখন দাবি পূরণও করে, তা

করে অনিচ্ছাসত্ত্বে, এবং সেইজন্য তাতে ঔদার্য ও শালীনতার অভাব থাকে। অতএব, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে উভয় পক্ষের আগ্রহ সত্ত্বেও প্রস্তাবিত আপস নাও হতে পারে।

আপসের পথে আরেক অন্তরায় ভারতীয় সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে ইংরেজ সরকারের মনোভাব। ইংরেজ সরকার সংখ্যালঘুদের দাবার ঘুটি হিসেবে ব্যবহার করবার বা কংগ্রেসের প্রতিপক্ষরূপে তাদের দাঁড় করাবার প্রয়াস থেকে বিরত থাকতে এখনও প্রস্তুত নয়। কিন্তু একেবারে হালের খবর থেকে জানা যাচ্ছে, কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সঙ্গে একটা আপসে আসার মত অবস্থা যদি সম্ভব হয়, সরকার মুসলিম লীগকে পথে বসাতেও প্রস্তুত। লণ্ডন টাইম্‌স্‌-এর সাম্প্রতিক সম্পাদকীয় মন্তব্য এবং অন্যান্য ব্রিটিশ পত্রিকা এই অভিমত সমর্থন করে। ইংরেজ সরকার মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে গান্ধীজির সঙ্গে যদি একটা বোঝা-পড়ায় আসে, তাহলে আমাদের মনে হয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ দুয়ের মধ্যেই ভাঙন অনিবার্য হবে। কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধীজি এবং যারা তাঁর পক্ষে, সকলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে থাকবে। অপর-দিকে, মুসলিম লীগে যারা কর্তাভজা তারা যেহেতু ইংরেজ সরকারের তাঁবেদার, আজকে লীগ কাউন্সিলে যারা প্রভাবশালী অর্থাৎ মিস্টার জিন্না ও প্রগতিশীল অংশ, তাদের ছেড়ে বেরিয়ে আসবে।

কংগ্রেস হাই কমাণ্ড যদি সরকারের সঙ্গে আপসে আসে তাহলে কী ঘটবে সে বিষয়ে গভীরভাবে আমাদের চিন্তা করার সময় এসেছে। একতা ও নিয়মনিষ্ঠার নামে দক্ষিণপন্থীরা এই আপসবিরোধী সদস্যদের জোর করে গিলিয়ে দিতে চেষ্টা করবে তা খুবই স্বাভাবিক। দক্ষিণপন্থীরা আশা করছে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত বিরোধীদের মুখ বন্ধ করে দেবে, ঠিক যেমন প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিত্বের গদি দখল করার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যেই সরকারী ক্ষমতা গ্রহণের সপক্ষে সিদ্ধান্ত নিল, অমনি থেমে গেল। কিন্তু এইবার বিরুদ্ধ-মতবাদী বামপন্থীরা কী করবে?

সম্পূর্ণ বামপক্ষের তরফ থেকে এই মুহূর্তে ভবিষ্যদ্বাণী করা

বিপজ্জনক। আপাততঃ কেবলমাত্র ফরওয়ার্ড ব্লক সম্পর্কে আমরা বলব। ব্লক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোনরকম আপস মেনে নিতে পারে না। আপসের সঙ্গে আমাদের পূর্ণ স্বরাজের লক্ষ্যের কোন সঙ্গতি নেই। অতএব আমরা ঘোষণা করতে বাধ্য হব, আপস মানতে আমরা বাধ্য নই এবং আমরা স্বাধীনতার লড়াই চালিয়ে যাব। আমাদের মতে আপসওয়ালারা দুটো অপরাধে অপরাধী—প্রথমত স্বাধীনতার লক্ষ্যকে পরিত্যাগ করা, দ্বিতীয়ত অহিংস অসহযোগের পদ্ধতিকে বরবাদ করা অতএব আমরা যদি ঘোষণা করি যে, আপসওয়ালারা যেহেতু কংগ্রেসের মূলনীতি ত্যাগ করেছে, তারা আর কংগ্রেসকর্মী থাকছে না, তাহলে আমরা মোটেই অন্যায় করব না। যদি তারা তাদের দুষ্কর্ম থেকে বিরত না হয় অথবা কংগ্রেসকে আঁকড়ে থাকে, কংগ্রেস থেকে তাদের বিতাড়িত করে আমরা আরও বেশি ন্যায়সঙ্গত কাজ করব।

কারণ, কংগ্রেস মূলত ও প্রথমত এমন একটি সংগঠন যার লক্ষ্য পূর্ণ স্বাধীনতা এবং যে পদ্ধতি তা গ্রহণ করেছে তা অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ। যদি কোন কংগ্রেসকর্মী এই মূল ও প্রাথমিক নীতিকে পরিহার করে, স্বতঃই সে আর কংগ্রেসকর্মী থাকছে না। এবং কাল যদি কংগ্রেস তার মূল লক্ষ্য ও পদ্ধতিকে ত্যাগ করে, তবে ১৯২০ সাল থেকে আমরা যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে পরিচিত তা সেই কংগ্রেস আর থাকবে না। আপসওয়ালারা যদি স্বেচ্ছায় কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসে অথবা কংগ্রেস থেকে তাদের যদি বহিষ্কার করা হয় তার ফলে, কংগ্রেস আবার আগেকার অবস্থা ফিরে পাবে এবং যে বৈপ্লবিক সংগঠন কংগ্রেসের বরাবর হওয়া উচিত, কংগ্রেস আবার তাই হয়ে উঠবে। কেন আমরা কংগ্রেস ছেড়ে গিয়ে স্বার্থান্বেষী আদর্শচ্যুতদের সেই সংস্থার সুনাম ও ঐতিহ্যের অধিকারী হতে দেব? তাদের বিতাড়িত করতে হবে এবং তারা যদি চায় তবে তারা নিজেদের জন্য আলাদা সংগঠন গড়ুক। কংগ্রেস কেবলমাত্র তাদের সংগঠন থাকবে স্বাধীনতা যাদের লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে যারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

আমরা বুঝতে পারছি আপসওয়ালারা স্বেচ্ছায় কংগ্রেস ছেড়ে নাও যেতে পারে এবং দলবদ্ধ সংখ্যাধিক্যের জোরে ঐ সংস্থার সুনাম নিজেদের স্বার্থে তারা ব্যবহার করতেও পারে। সেরকম অবস্থায় মনে হয় দুটো কংগ্রেস হবে। তখন সাধারণ মানুষকে, জনসাধারণকে ঠিক করতে হবে, ঠিক করে বলতে হবে কোন্ কংগ্রেস তাদের কংগ্রেস। তারা কী উত্তর দেবে, সে বিষয়ে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নেই—কারণ জনসাধারণ আমাদের দিকে। মহাত্মা গান্ধীর নামের প্রভাব সত্ত্বেও সম্মিলিত দক্ষিণপন্থীদের থেকে সম্মিলিত বামপন্থীদের অনুগামী সংখ্যা অনেকগুণ বেশী। বস্তুতপক্ষে বামপন্থীদের সমর্থন না থাকলে বর্তমান কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অনুগামী বলতে কে আর আছে? সংগঠিত কৃষকশ্রেণীর, সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর, সংগঠিত যুবসমাজের, সংগঠিত ছাত্রসমাজের এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির কোন আস্থা এদের উপর নেই। অতএব, এত অল্প লোকবল নিয়ে তারা কি ভারতের জনগণের হয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারবে? এ প্রশ্নের উত্তর বলার দরকার হয় না।

দক্ষিণপন্থীরা কবে আপস নিষ্পত্তি করতে সমর্থ হবে সেইদিনের জন্য অপেক্ষা না করে আমাদের এখন থেকেই উচিত সেই দিকের সব রকম প্রয়াস ব্যর্থ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা। সেই উদ্দেশ্যেই কংগ্রেসের যখন অধিবেশন হবে তখন রামগড়ে একটি আপস-বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। দেশের বামপন্থী সবাই এবং বামপন্থী সব সংগঠন ১৮ই ও ১৯শে মার্চ আপসবিরোধী সম্মেলনকে সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত করতে রামগড়ে যেন দলে দলে যোগদান করে। আমাদের মনে কোনই সন্দেহ নেই যে, এই সম্মেলন যদি সাফল্যমণ্ডিত হয়, তাহলে আপসের সব চেষ্টা আপনিই বন্ধ হয়ে যাবে এবং তার ফলে কংগ্রেসকে এবং দেশকে জাতীয় দুর্দৈবের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে।

বিহার প্রাদেশিক কিষাণ সভা রামগড়ে এক কিষাণ সমাবেশের আয়োজন করছে। তাতে দু লক্ষ কিষাণ যোগ দেবে। রামগড়

কংগ্রেস অধিবেশন যখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তখন বা তার কাছাকাছি সময়ে সেখানে নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক-এর কনফারেন্স যাতে হয় সেই প্রস্তাব আমি করছি। এই উপলক্ষ্য তাই নিখিল ভারত আপসবিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠানের পক্ষে উপযুক্ত হতে পারে। আমরা আশা করি এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে এবং এই সম্মেলন যাতে সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয় সেই উদ্দেশ্যে বামপন্থীরা এবং বিভিন্ন বামপন্থী সংগঠন দলে দলে তাতে যোগ দেবে। এই সম্মেলন আপসের সব আলোচনার সমাপ্তি ঘটাবে এবং যে পচন শুরু হয়েছে তা রোধ করবে।

ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধীর কাছে আমাদের আবেদন, বড়লাটের বাড়িতে দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর এই যাত্রা ক্ষান্ত করে তিনি এগিয়ে এসে ১৯২০ সালের মত তাঁর দেশবাসীকে নেতৃত্ব দান করুন।

বাংলার জট

১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০-এর 'ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

যে সকল বন্ধুবান্ধব কংগ্রেসের কার্যকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নয় তারা কংগ্রেসের ভিতরকার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে প্রায়শই বিভ্রান্ত বোধ করছে। দেশের সুদূর প্রান্তে যে সকল কর্মী আছে তাদের সম্পর্কে একথা বিশেষভাবে প্রযুজ্য। সাধারণ বুদ্ধিতে বলে: "কংগ্রেসের লক্ষ্য তো স্বাধীনতা। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্যরা সকলেই জনসেবক এবং তাঁরা সকলেই তাঁদের দেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে কৃতসংকল্প। তাহলে কেন এই গৃহবিবাদ?"

অপরেরা নিতান্ত আনাড়ীর মত এইভাবে আবেদন জানায়: "কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সঙ্গে আপনাদের সব মতবিরোধ দয়া করে মিটিয়ে ফেলে সম্মিলিত ফ্রণ্টে শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়ান।" যেন আমরাই ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে বিবাদ বাধিয়েছি!

সাধারণের স্মৃতি যে স্বল্পস্থায়ী—তা সুবিদিত। তাই, অতীতে যা ঘটেছে অল্প কথায় তা একবার বলে নেওয়া দরকার।

১৯৩৯-এর এপ্রিল মাসে কলিকাতায় আমার সভাপতিত্বে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যখন বৈঠক বসে এবং সেখানে নতুন ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তখন সমমতাবলম্বী কেবিনেটের গান্ধীবাদী তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের বিরোধ বাধে। আমাদের মোদ্দা কথা বলে দেওয়া হয় যে, ভবিষ্যতে দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থীদের সহযোগিতায় কাজ করতে পারবে না। প্রকৃতপক্ষে এই অসহযোগিতা শুরু হয় ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারি মাস থেকে, যখন কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট পদে আমি পুনর্নির্বাচিত হই, তখনই ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা তাঁদের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন।

কেবলমাত্র আমাদের অসহযোগিতারই সম্মুখীন হতে হয় না, মহাত্মা গান্ধীর মত কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তির কাছ থেকেও আমাদের এ-কথা শুনতে হয় যে, নিকট ভবিষ্যতে জাতীয় সংগ্রামের কথা উঠতেই পারে না।

এইরকম জটিল অবস্থায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বোঝাতে চাইলেন, যেহেতু আন্তর্জাতিক সঙ্কট ঘনীভূত হয়ে আসছে আভ্যন্তরিক মতবিরোধ সত্ত্বেও আমার পক্ষে কংগ্রেসের ভিতরে একটা নতুন সংগঠন গড়ে তোলা কিংবা পদত্যাগ করা—কিছুই উচিত হবে না। আমার যুক্তি ছিল, যেহেতু নিকট ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক সঙ্কট অনিবার্য এবং সেই সঙ্কটের উপযোগী কোন ব্যবস্থা কংগ্রেস হাই কমাণ্ড গ্রহণ করবে এরকম আশা করাই দুরাশা, অতএব সময় নষ্ট না করে আমাদের নিজস্ব সংগঠন আমাদের গড়ে তোলাই বিধেয়। ওয়ার্কিং কমিটি যদি ব্যর্থ হয় তবুও এই সংগঠনের দরুন দৃঢ়তার সঙ্গে আমরা আন্তর্জাতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হতে সমর্থ হব।

ফরওয়ার্ড ব্লক ও বামপন্থী সংহতি কমিটি এইভাবেই সৃষ্টি হল।

এবারে ১৯৩৯-এর ৯ই জুলাই প্রতিবাদ জ্ঞাপনের কথা উল্লেখ করছি। বোম্বাইয়ে ১৯৩৯ সালের জুন মাসের বৈঠকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির যে দুটি আপত্তিকর প্রস্তাব গৃহীত হয়, তার প্রতিবাদে ভারতের সর্বত্র বামপন্থী সংহতি কমিটির উদ্যোগে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রস্তাব দুটির একটিতে আইন অমান্য করার ব্যক্তিগত অধিকার কংগ্রেস কর্মীদের কাছ থেকে কার্যত কেড়ে নেওয়া হয়। অপর প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি থেকে সংশ্লিষ্ট প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী করে তোলা। আমার নেতৃত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ৯ই জুলাইয়ের প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করে।

বি. পি. সি. সি.-র (বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির) উপর আক্রমণের এই হল সূত্রপাত। ওয়ার্কিং কমিটির এক হুকুমে বি. পি. সি. সি.-র প্রেসিডেন্ট পদ থেকে আমাকে অপসারিত করা

হল। বি. পি. সি. সি. এই হুকুম মাথা পেতে নেয়নি, তার ফলে দীর্ঘ বাগবিতণ্ডা শুরু হল। এই বিতর্ক চলাকালে স্পষ্ট বোঝা গেল, বি. পি. সি. সি.-র সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা অংশ হাই কমাণ্ডের ভ্রূকুটি সত্ত্বেও আমার সঙ্গেই থাকবে। এবং এই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বামপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠ।

১৯৩৯-এর জুন থেকে উল্লিখিত ঘটনাবলী দেখিয়ে দিল, এ. আই. সি. সি.-তে অধিকাংশ সদস্যের সম্মতিক্রমেও যদি এমন প্রস্তাব গৃহীত হয় যা নীতির দিক থেকে আপত্তিকর, সংখ্যালঘু তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে দ্বিধা করবে না। অর্থাৎ প্রদেশে সরকারী দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের জোরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যেই সরকারী ক্ষমতা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল অমনি সংখ্যালঘু বিরুদ্ধবাদীদের মুখ বন্ধ হয়ে গেল, এইরকম অবাধে যথেচ্ছাচার চালিয়ে যাওয়া দক্ষিণপন্থীদের পক্ষে আর সম্ভব হবে না।

দক্ষিণপন্থী নেতারা সুদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নিল, এখন থেকে সংখ্যালঘুদের বশ্যতা ও নিয়মশৃঙ্খলা স্বীকার করতে বাধ্য করা হবে, যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠের জোরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত যখন আপসে আসা যাবে তখন যেন বিরুদ্ধমতাবলম্বী বামপন্থীদের কোন বেসুরো কণ্ঠস্বর না শোনা যায়। প্রকৃতপক্ষে এই কারণেই প্রেসিডেন্টের পদে আমার পুনর্নির্বাচনকে প্রচণ্ডভাবে বাধা দেওয়া হয়েছিল।

দক্ষিণপন্থীদের উদ্বেগের আরও একটা কারণ ছিল। বিহারের রামগড়ে পরবর্তী কংগ্রেসটা তারা নির্ঝঞ্ঝাটে কাটাতে চেয়েছিল এবং ১৯৩৯-এর মার্চে ত্রিপুরি কংগ্রেসের অনিশ্চিত পরিবেশ যাতে দেখা না দেয় সেইজন্য তারা উদ্‌গ্রীব ছিল। তারা স্পষ্টই বুঝেছিল যে বাংলা থেকে রামগড় কংগ্রেসে বামপন্থী ডেলিগেটের বেশ বড় একটা দল, সম্ভবত ৪৫০ জনকে, পাঠানো হবে। যে কোন উপায়ে তা পণ্ড করতে হবে।

অন্যান্য প্রদেশের কংগ্রেস কার্যকলাপ সম্পর্কে যারা অবহিত নয়

তাদের এই ধারণা যে বাংলার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিই শুধু কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের বিরোধিতা করছে। আসল ঘটনা কিন্তু এর বিপরীত। ফরওয়ার্ড ব্লক সর্বভারতীয় সংগঠন বলে দেশের প্রতিটি প্রান্তে কী ঘটছে আমরা তার খবর রাখি। অতএব আমরা দায়িত্বের সঙ্গে একথা বলতে পারি যে, সাধারণভাবে বামপন্থীরা এবং বিশেষ-ভাবে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিটি প্রদেশে ওয়ার্কিং কমিটির আক্রমণের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে যেখানে বামপন্থীদের ও ফরওয়ার্ড ব্লক-এর অবস্থা বেশী শক্তিশালী, আক্রমণ সেই সব ক্ষেত্রে কঠিনতর। যেহেতু বাংলায় আমাদের শক্তি সবচেয়ে বেশি, হাই কমাণ্ডের আক্রোশ বি. পি. সি. সি.-র উপর সর্বাধিক।

বি. পি. সি. সি.-কে হেয় ও দমন করার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি পর পর অনেক ব্যবস্থা অবলম্বন করে, কিন্তু কোনই লাভ হয় না। একটা তুচ্ছ কারণে বি. পি. সি.সি.-র উপরে একটা দলীয় নির্বাচনী ট্রাইবুনাল চাপানো হয়। ট্রাইবুনালের জন্য যে সকল নিয়ম বি. পি. সি. সি. প্রণয়ন করে ওয়ার্কিং কমিটি তা বিশেষভাবে দেখার এবং তাতে হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন বোধ করে। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। অতঃপর হাই কমাণ্ড আবিষ্কার করল, এত সব করেও নতুন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কমানো যাবে না। তারপর ওয়ার্কিং কমিটি মরিয়া হয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করল। তারা বি. পি. সি. সি.-কে কার্যত বাতিল করে দিয়ে ১৯৪০-এর মার্চ মাসে রামগড়ে যে কংগ্রেস অধিবেশন বসবে তার জন্য ডেলিগেট নির্বাচনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব দলীয় এক এডহক্ কমিটির উপর ন্যস্ত করল। বামপন্থী বাংলাকে একবার পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারলে, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যাপারে এবং রামগড় কংগ্রেসেও দক্ষিণপন্থীরা অবাধে যা ইচ্ছা তাই করে যেতে পারবে।

এর মধ্যে কৌতুকপ্রদ এক ঘটনা ঘটে। বি. পি. সি. সি.-র হিসাব পরীক্ষা করার জন্য ওয়ার্কিং কমিটি একজন অডিটারকে পাঠায়। তার আপ্রাণ চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়। বাংলায় ওয়ার্কিং কমিটির

যারা দালাল ছিল তারা কমিটিকে ভুল খবর পাঠায়। তারা জানিয়েছিল বি. পি. সি. সি.-র ও বঙ্গীয় পার্লামেণ্টারি পার্টির তহবিল থেকে নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লককে অর্থসাহায্য করা হয়।

আমাদের সন্দেহ নেই, যতদিন দক্ষিণপন্থীরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের বা প্রদেশগুলিতে ক্ষমতায় পুনর্বহাল হবার আশা পোষণ করবে ততদিন বামপন্থীদের ও ফরওয়ার্ড ব্লক-এর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ ও আক্রমণ অব্যাহত থাকবে। বর্তমানে আমরা ক্ষমতা দখলের রাজনীতি দেখতে পাচ্ছি এবং যা ঘটছে তার জন্য কারও অবাক হওয়া উচিত নয়।

দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণের জবাবে অথবা আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমরা যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করি না কেন, তা সর্ব-ভারতীয় পর্যায়ে হওয়া একান্ত দরকার। অন্য কোন সংগঠনে এই-রকম সর্বভারতীয় ফ্রন্ট না যদি থাকে ফরওয়ার্ড ব্লক-এ আছে। একটি বিষয়ে সবাই নিশ্চিন্ত থাকতে পারে, বামপন্থী বাংলা বামপন্থী ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হচ্ছে না।

বাংলাদেশে যে সংঘর্ষ চলেছে তা সর্বভারতীয় পর্যায়ের সংঘর্ষ—প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও প্রগতিশীল শক্তির মধ্যে সংঘর্ষ—দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ—আপসের নীতি ও আপসবিরোধিতার নীতির মধ্যে সংঘর্ষ। এইরকম সংঘর্ষের চূড়ান্ত সমাধান স্থানিক বা প্রাদেশিক পর্যায়ে হতে পারে না। সমাধান তখনই সম্ভব যখন প্রতিক্রিয়াশক্তিকে উৎখাত করা হবে—এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের অনুকূলে আপসের নীতিকে পরিহার করা হবে। ততদিন পর্যন্ত দুই ফ্রন্টে আমাদের সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। মনে যেন এই দৃঢ় বিশ্বাস থাকে যে আমরা জয়ী হবই এবং সেই জয় শীঘ্রই হবে।

সাম্প্রদায়িক ঐক্যের দিকে

২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০, 'ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন আগতপ্রায়। রামগড়ে কংগ্রেস অধিবেশনে কী হয় না হয় তার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে। বাংলাকে জোর করে যে যোগদান করতে দেওয়া হয়নি সেই কারণে এবং গত এক বছর ধরে সারা দেশে কংগ্রেস হাই কমাণ্ড বামপন্থীদের বিরুদ্ধে যে আক্রমণ চালিয়ে এসেছে তার দয়ায় ওই কংগ্রেসে বামপন্থীদের সংখ্যা হবে অত্যন্ত নগণ্য। বাংলার যে সব ডেলিগেট স্বাভাবিক অবস্থায় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে যোগদান করতে পারতেন, এই বাধ্যতামূলক অনুপস্থিতিতে তাঁদের আক্ষেপ করার কারণ নেই। রামগড়ে যদি তাঁরা পুরোপুরি শক্তিতে উপস্থিত হতেন, তবুও তাঁরা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তকে কিছুমাত্র প্রভাবিত করতে পারতেন না। রামগড় কংগ্রেস নিয়ে বামপন্থীরা যদি মাথা না ঘামায় তাহলে ছুনিয়া রসাতলে যাবে না। প্রকৃতপক্ষে যদি তারা রামগড় কংগ্রেসকে দক্ষিণ-পন্থীদের কংগ্রেসে পরিণত করতে পারে, তাহলেই বরঞ্চ ভাল হবে।

এই বছরে, কংগ্রেসের ভিতরে যা হবে তার থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটবে কংগ্রেস প্যাণ্ডেলের বাইরে। বিহার প্রদেশিক কিষাণ সভা বিরাট এক কিষাণ সমাবেশের ডাক দিয়েছে। আশেপাশের জেলা থেকে কমপক্ষে ছু লক্ষ কিষাণ তাতে যোগদান করবে। কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন যে সময় অনুষ্ঠিত হবে প্রায় একই সময়ে রামগড়ে নিখিল ভারত আপসবিরোধী সম্মেলনও বসবে। এই সম্মেলন যদি সাফল্যমণ্ডিত হয়, রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে তাহলে তা কংগ্রেসকেও ম্লান করে দিতে পারে। যাই হোক না কেন, তার ফলে কংগ্রেস হাই কমাণ্ড ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে আপসের যা কিছু কথাবার্তা, যা কিছু প্রয়াস চলছে, সে সবের চিরতরে সমাপ্তি ঘটাতে পারে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসে আসার প্রয়াস থেকে কংগ্রেস হাই কমাণ্ডকে নিরস্ত হতে বাধ্য করা দেশের রাজনৈতিক অগ্রগতির দিক থেকে একান্ত প্রয়োজন। এই কাজ সম্পন্ন হলে, কংগ্রেসের সামনে একটিমাত্র পথই খোলা থাকবে—সে পথ আপসহীন সংগ্রামের পথ, পূর্ণ স্বরাজে যার পরিণতি। যারাই ভারতের স্বাধীনতা চায় তারা সবাই জাতীয় সংগ্রাম শুরু করতে বাধ্য হবে।

দেশের মধ্যে যারাই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, নারীপুরুষনির্বিশেষে যারাই স্বদেশপ্রেমিক, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ডাক তাদের সবার কাছে আবেদন পৌঁছিয়ে দেবে। রণডঙ্কা যখন বেজে উঠবে, যারা মুক্তিপাগল তারা সবাই জাতি ধর্ম উচ্চনীচনির্বিশেষে সারিবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতার পথে যাত্রা শুরু করবে।

জনগণ স্বাধীনতার সংগ্রামে যখন সহযোদ্ধা হবে, তখন নতুন এক সমাজাত্মিক বোধ দেখা দেবে—এবং সেইসঙ্গে নতুন মনোভাব, নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন এক আদর্শের বিকাশ ঘটবে। এই বিপ্লব যখন ঘটবে ভারতবাসী তখন অন্য মানুষ, ভারতবাসীরা তখন এক বৈপ্লবিক জাতি হয়ে উঠবে। অনেক সমস্যা আজ যা দুরূহ বলে মনে হচ্ছে, তাদের পক্ষে তখন তা সমাধান করা সহজ হবে।

বর্তমান অবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়াকে ধ্বংস করা এবং আমাদের কর্মজীবনে সর্বাত্মক জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটানো প্রায় অসম্ভব। কিন্তু একবার আমরা যদি জাতিগতভাবে বৈপ্লবিক মনোভাবের বিকাশ ঘটাতে পারি এই কাজ কত তখন সহজ হয়ে যাবে।

সাম্প্রদায়িকতা দূর হবে তখনই যখন সাম্প্রদায়িক মনোভাব চলে যাবে। অতএব মুসলিম, শিখ, হিন্দু, খ্রীষ্টান ইত্যাদি, যারাই সাম্প্রদায়িক মনোভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছে এবং যথার্থ জাতীয়তাবাদী মনোভাবাপন্ন, সাম্প্রদায়িকতাকে দূর করা সেই সকল ভারতবাসীর কর্তব্য। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যে যুদ্ধ করে নিঃসন্দেহে সে যথার্থ জাতীয় মনোভাবাপন্ন।

যে কোন যুদ্ধে সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দলের উপর বিশেষ দায়িত্ব

ন্যস্ত হয়। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একই কারণে যারা পুরোগামী তাদের স্কন্ধেই বিশেষ দায়িত্ব পড়বে। আন্তঃসাম্প্রদায়িক অর্থাৎ জাতীয় একতার ভিত্তি স্থাপনের দায়িত্ব তাদেরই। ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে সকল হিন্দু ও মুসলিম, শিখ ও খ্রীষ্টান লড়াই করবে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের বিশেষভাবে বিনিয়োগ করতে হবে। একবার এই সমস্যার সমাধান করে সারা দেশের কাছে তা ঘোষণা করার পরে আবহাওয়া আপনি বদলে যাবে এবং চিরদিনের জন্য সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটবে। যারা পুরোগামী তারা যদি পথ দেখায়, শেষ পর্যন্ত সমস্ত জাতি তাদের অনুসরণ করবে।

অতএব কংগ্রেসের এবং মুসলিম লীগের হাই কমাণ্ড কবে সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটা সমাধান বাতলিয়ে দেবে সেই দিনের অপেক্ষায় আমাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকার দরকার নেই। বরঞ্চ যারা সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা তারা যাতে একত্রিত হয়ে এই সমস্যার সমাধান করে সেইদিকে আমাদের নজর দেওয়া উচিত। যদি তারা সাফল্যলাভ করে, প্রথম ও সবচেয়ে বড় বাধা তাহলে দূর হবে এবং জনসাধারণ—সমস্ত জাতি—তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। যারা স্বাধীনতাকে ভালবাসে এবং তার জন্য মৃত্যু বরণ করতে পারে তারা আর যে কোন লোকের থেকে অনেক সহজে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করতে পারে। অতএব অগ্রগামী সৈনিকরা আগুয়ান হও, তোমাদের উপর যে দায়িত্ব এসেছে তা পালন কর।

জার্মানি সম্পর্কে একটি কথা

১৯৪০-এর ১৩ই মার্চ 'ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

মনে হয় আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহে গতিবেগ ও চঞ্চলতা অত্যন্ত গুরুপূর্ণ অঙ্গ। প্রাচীন এক প্রবাদে বলে, "শুভারম্ভ মানেই অর্ধেক নিষ্পন্ন।" একালে একে বদলিয়ে বলা উচিত, "দ্রুতারম্ভ মানেই অর্ধেক নিষ্পন্ন।" নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে জার্মানি এই উপদেশ পালন করে চলেছে। রাইনলাণ্ডকে সামরিক দখল করতে, অথবা চেকোস্লোভাকিয়াকে আত্মসাৎ করতে, অথবা পোলাণ্ড আক্রমণে, অথবা একেবারে সম্প্রতি স্কাণ্ডিনাভিয়ায় অনুপ্রবেশে, জার্মানি সর্বদা বিদ্যুৎগতিতে কাজ করেছে। শত্রুর নার্ভকেন্দ্রে হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে শত্রু ভাল করে বোঝবার আগেই সে শত্রুকে অভিভূত ও অকর্মণ্য করে দিয়েছে। এই-রকম আকস্মিক আক্রমণকৌশলের পিছনে দীর্ঘকালব্যাপী সযত্ন পরিকল্পনা এবং তদনুযায়ী উপযুক্ত প্রস্তুতি থাকে তা সহজেই বোঝা যায়। এইপ্রকার বিশদ পরিকল্পনা রচনায় এবং সযত্ন প্রস্তুতিতে নাৎসী জার্মানির দক্ষতা অতুলনীয়।

বিশদ পরিকল্পনা ও উপযুক্ত প্রস্তুতির কথা বাদ দিলেও সময়সূচী অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট কার্যক্রম পালন করতে হলে কর্মশক্তি ও বল-বীর্যের দরকার হয়। এইসব গুণাবলী নাৎসীদের নিশ্চয় আছে। তাদের দ্রুতগতি ও সচলতার দরুন বিনা ব্যতিক্রমে তারা শত্রুকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়েছে এবং তাকে পর্যুদস্ত করতে তাদের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি।

যে ভাবে চেকোস্লোভাকিয়াকে পর্যুদস্ত করে জার্মানির অন্তর্ভুক্ত করা হল তাতে অনেকেই অবাক হয়ে গিয়েছিল। তিন সপ্তাহের মধ্যে পোলাণ্ডকে জয় করে নেওয়া আরও বিস্ময়কর, কারণ আধুনিক প্রয়োজনীয় অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত শক্তিশালী এক সেনাবাহিনী আছে

বলে পোলাণ্ডের খ্যাতি ছিল এবং নির্ভীক যোদ্ধা বলেও পোলদের সুনাম ছিল।

রণকৌশলের দিক থেকে পোলাণ্ডের আসন্ন আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে চেকোস্লোভাকিয়াকে দখল করে নেওয়া প্রয়োজন ছিল। পোলাণ্ড অধিকার, অন্ততপক্ষে পোলিশ করিডর অধিকার, জার্মানির প্রধান অংশের সঙ্গে পূর্ব প্রুশিয়ার যোগ বজায় রাখবার জন্য দরকার ছিল। অস্ট্রিয়া, ডানসিগ, মেমেল্‌লাণ্ড দখলও বোঝা যায়। অন্যান্য কারণ ছাড়াও জাতি ও বর্ণগত কারণ তার অন্যতম কারণ ছিল। কিন্তু স্কাণ্ডিনেভিয়া সম্পর্কে কী বলা যায়?

ডেনমার্ক এবং নরওয়ের মত ছোট ছোট স্কাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলি কখনই শক্তিশালী জার্মানির কাছে বিপদের কারণ হয়নি। তাহলে জার্মানি কেন তাদের আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে অমান্য করল? আপাত-দৃষ্টে মনে হয় এর কারণ, নরওয়ের উপকূলবর্তী নৌ-এলাকায় গ্রেটব্রিটেন মাইন পেতেছিল এবং জার্মানি তার প্রতিশোধ নিতে এই কাজ করেছে।

কিন্তু এই উত্তর যথেষ্ট নয়। নরওয়ের উপকূলবর্তী এলাকায় মাইন পাতার জন্য ব্রিটেন যদি দায়ী হয়ে থাকে তার উপর প্রতিশোধ নিতে হলে, জার্মানির তাকেই কঠিন আঘাত করা উচিত ছিল। তার বদলে সে ডেনমার্ক ও নরওয়েকে আঘাত করল কেন?

যেহেতু জার্মানির বিশ্বাস করার কারণ ছিল, গ্রেটব্রিটেনের মতলব ছিল ডেনমার্ক ও নরওয়েকে দখল করে নেওয়া—ঠিক যেমন প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গ্রেটব্রিটেন গ্রীসের সালোনিকা দখল করে নিয়েছিল। সেইজন্য জার্মানি তার শত্রুর মতলব বুঝে আগেভাগে স্কাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলি দখল করে নিল। অধিকতর গতিবেগ ও দ্রুত সঞ্চলনের দরুন, জার্মানি ব্রিটেনের আগে তা করতে পেরেছে। ডেনমার্ক দখল হল যেন হাওয়া খেতে যাওয়া, আর নরওয়ে দখল যেন আনন্দ বিহার। পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির ফলে বিদ্যুৎগতিতে এত সব সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে।

ডেনমার্কের ফ্যারো দ্বীপ ব্রিটেন যে দখল করে নিয়েছে তার থেকেই বোঝা যায় ডেনমার্ক ও নরওয়েকে ব্রিটেন অধিকার করে নেবে, জার্মানির এই ধারণা ভিত্তিহীন ছিল না।

ব্রিটিশ নৌবহর, সেইসঙ্গে ব্রিটিশ ভূভাগের উপর ভবিষ্যতে আক্রমণ চালানোর জন্য এখন থেকে ডেনমার্ক ও নরওয়েকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

জার্মানি ফ্যাসিস্ট হতে পারে, সাম্রাজ্যবাদী হতে পারে, নির্মম বা নৃশংস হতে পারে, তা সত্ত্বেও এই গুণগুলির জন্য তাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না—যেমন, কীভাবে আগেভাগে পরিকল্পনা করতে হয়, সেইমত প্রস্তুত হতে হয়, সময়তালিকা অনুযায়ী কাজ করে বিদ্যুৎগতিতে আঘাত হানতে হয়। মহত্তর কোন আদর্শের জন্য এই গুণগুলিকে কি কাজে লাগানো যায় না ?

রামগড় অভিভাষণ

১৯শে মার্চ, ১৯৪০, বিহারের রামগড়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত আপসবিরোধী সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণের সম্পূর্ণ অনুলিপি।

কমরেডগণ,

আজ রামগড়ে নিখিল ভারত আপসবিরোধী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার জন্য আহ্বান করে আমাকে আপনারা বিপুল সম্মানে সম্মানিত করেছেন। সেইসঙ্গে আমার স্কন্ধে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা যথেষ্ট গুরুভার। দেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যে সব শক্তি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস প্রতিহত করতে দৃঢ়সংকল্প জনসমক্ষে তাদের আনবার উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলন। এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করা সহজ কাজ নয়। এই কাজ আরও গুরুত্বপূর্ণ, আরও কঠিন হয়ে ওঠে যখন দেখি স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর মত ব্যক্তি রিসেপশন কমিটির চেয়ারম্যান। স্বামীজির উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়ে আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।

কমরেডগণ, আমি আমার কর্তব্যে অবহেলা করব যদি আমাদের সামনে যে সমস্যা রয়েছে তা আলোচনা করার আগে এই সম্মেলন আয়োজন করার দায়িত্ব যাঁদের উপর ছিল তাঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন না করি। এই সম্মেলনে মিলিত হবার আগে যে বাধাবিপত্তি পার হতে হয়েছে সে বিষয়ে আমার কিছু ধারণা আছে। এ বিষয়ে সেইজন্য বলবার আমার কিছুটা অধিকার আছে। এই সব বাধা-বিপত্তির প্রকৃতি ছিল দু রকমের। প্রথমত সম্মেলনের জন্য প্রয়োজনীয় আয়োজন করবার আগেই রামগড়ে যে সব স্থুল ও বাস্তব বাধাবিপত্তি উত্তীর্ণ হতে হয়। দ্বিতীয়ত সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের দেশব্যাপী নিয়মিত বিরুদ্ধ প্রচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং তাকে খণ্ডন করতে হয়েছে। এই প্রচারকার্যে সবচেয়ে বিস্ময়কর ও বেদনাদায়ক ভূমিকা

গ্রহণ করে বামপন্থীদের (অথবা ভুয়ো বামপন্থীদের) একটা অংশ খোলাখুলিভাবে এই সম্মেলনের নিন্দা করে এবং অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালিয়ে সম্মেলনকে পণ্ড করার জন্য আপ্রাণ প্রয়াস করে। প্রকৃতপক্ষে কয়েক মাস ধরে উত্তরোত্তর প্রকট হয়ে উঠছে, কিছুসংখ্যক বামপন্থী দক্ষিণপন্থীদের তাঁবেদারের ভূমিকা গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে, তবে এরকম ঘটনা ইতিহাসে নতুন নয়। মানুষের বেঁচে থাকা মানেই শেখা, এবং যত বেশিদিন সে বাঁচে ততই সে বুঝতে পারে—ইতিহাস বারে বারে ফিরে ফিরে আসে—সুবিদিত এই প্রবচনটি কত সত্য।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যারা তল্পিবাহক তারা যুক্তি দেখাচ্ছে, কংগ্রেসই তো বৃহত্তম আপসবিরোধী সম্মেলন, অতএব এইপ্রকার একটা সম্মেলন অনাবশ্যক। পাটনায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির শেষ বৈঠকে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় আমাদের সামনে তা তুলে ধরে দেখানো হচ্ছে যে কংগ্রেস আপসবিরোধী নীতি গ্রহণ করেছে। এই ধরনের যুক্তির সারল্যকে তারিফ না করে পারা যায় না, কিন্তু যারা রাজনীতিজ্ঞ, যারা রাজনৈতিক কর্মী তাদের এতটা সরল হওয়া কি শোভন ও সঙ্গত?

পাটনা প্রস্তাবের সবটা, বিশেষ করে তার শেষের অংশটুকু ভালো করে পড়ে দেখলে বুঝতে দেরি হয় না যে তাতে এমন অনেক ফাঁক আছে যা প্রস্তাবটির স্বকীয় গুরুত্বকে হ্রাস করেছে। এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়ে দিলেন, মীমাংসার উদ্দেশ্যে ভবিষ্যৎ আলাপ-আলোচনার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। আইন অমান্যের উপর মহাত্মাজীর পরবর্তী দীর্ঘ মন্তব্য থেকে কোনক্রমেই আমরা আশ্বস্ত হই না যে, সংগ্রামের পর্ব শুরু হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে গত দেড় বছর ধরে আমাদের কাছে যা বিভ্রান্তি ও মর্মপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা এই যে, একদিকে যেমন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা গরম গরম প্রস্তাব গ্রহণ করছেন এবং অনুরূপ বিবৃতি প্রকাশ করছেন, তেমনই একই সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী বা

দক্ষিণপন্থী অন্য নেতারা এমন মন্তব্য ও বিবৃতি দান করছেন যাতে সাধারণের মনে একেবারে ভিন্ন ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে। এর পরেও বিতর্কের প্রশ্ন থেকে যায়, পাটনা প্রস্তাব কি একান্তই গৃহীত হত, যদি গত ছ মাস ধরে বামপন্থীরা সমানে চাপ দিয়ে না যেত ?

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের সর্বপ্রকার আলোচনার পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছ থেকে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই ঘোষণা শোনবার জন্য সারা দেশ সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু এই ঘোষণা কি আসন্ন ? যদি তাই হয়, কবে ?

কমরেডগণ, যারা জাহির করছে যে কংগ্রেসই বৃহত্তম আপস-বিরোধী সম্মেলন সম্ভবত তাদের স্মৃতিলোপ হয়েছে, অতএব তাদের মনে আবার পূর্বস্মৃতি জাগিয়ে তোলা দরকার। তারা কি ভুলে গেছে, যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজনমাত্র না বোধ করে সিমলায় গিয়ে মহামহিম বড়লাটকে জানিয়ে এলেন যে, যুদ্ধচালনার ব্যাপারে তিনি গ্রেট-ব্রিটেনকে বিনাশর্তে সাহায্যদানের পক্ষপাতী ? তারা কি এটুকু বোঝে না, যেহেতু মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের একচ্ছত্র ডিক্টেটর, তাঁর ব্যক্তিগত অভিমতের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য আছে ? তারা কি ভুলে গেছে, যুদ্ধ বাধবার পর থেকে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আসল প্রশ্নটি—যথা পূর্ণ স্বরাজের জন্য আমাদের দাবির প্রশ্ন ধামাচাপা দিয়ে ভুয়ো কন্‌স্টিটিউ-য়েণ্ট এসেম্‌ব্লির দাবিকে সামনে তুলে ধরেছে ? তারা কি ভুলে গেছে, প্রধান প্রধান কিছু দক্ষিণপন্থী নেতা, তাদের মধ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরাও আছেন, কন্‌স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্‌ব্লির প্রকৃত রূপটিকে ক্রমাগত ছোট করে চলেছে এবং তারা এতদূর পর্যন্ত গেছে যে, তাদের সাধের কন্‌স্টিটিউয়েণ্ট এসেম্‌ব্লি নির্বাচন করার ভিত্তি হিসেবে আইন পরিষদের বর্তমান ভোটাধিকারকে এবং পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীকেও তারা মেনে নিতে রাজী ? তারা কি ভুলে গেছে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগের পর থেকে কিছু কিছু কংগ্রেসী মন্ত্রী সরকারী ক্ষমতায় পুনরধিষ্ঠিত হবার জন্য অত্যধিক আগ্রহ দেখাচ্ছে ? ইংরেজ সরকারের

সঙ্গে আপসের ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধী গত ছ মাস ধরে যে একই-রকম মনোভাব পোষণ করে চলেছেন, তা কি তারা লক্ষ্য করছে না ? এবং তারা কি জানে না, গরম গরম কথার আড়ালে আপসের জন্য কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে ?

আমাদের দুর্ভাগ্য, ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের কথার উপর আর কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না, এবং তাদের ধারণা হয়েছে, কংগ্রেস সদস্যরা মুখে যাই বলুক না, শেষ পর্যন্ত তারা লড়াইয়ে নামবে না। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে প্রস্তাব ও বিবৃতির অভাব হয়নি। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কিছু কিছু সদস্য মনে করে, সারা দুনিয়ায় এই সব প্রস্তাবের প্রভাব পড়েছে। সারা দুনিয়ায় তাদের প্রভাব পড়ুক বা নাই পড়ুক, ইংরেজদের উপর যে কোনই প্রভাব পড়েনি, এ কথা ঠিক। ইংরেজ জাতি আসলে বাস্তববাদী। গত ছ মাস আমরা তাদের শুনিয়েছি কেবল কথা আর কথা এবং আমরাও আদ্যিকালের সেই জবাব শুনেছি যে, যতদিন হিন্দু-মুসলিম সমস্যা অমীমাংসিত থাকবে ততদিন পূর্ণ স্বরাজ চিন্তাতীত।

গত সেপ্টেম্বর থেকে ভারত এক অস্বাভাবিক সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছে। এই সময়ে মানুষের মনে নানারকম দ্বিধা ও সংশয় জাগছে। প্রথমে পতন হল নেতাদেরই, যে নৈতিক অধঃপতনের দিকে তারা পা বাড়িয়েছে, তা মহামারীর মত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের যদি এই পচন রোধ করতে হয় ব্যাপকভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এই প্রয়াসকে যদি সত্যিই সার্থক করে তুলতে চাই, তাহলে আমাদের কার্যকলাপের লক্ষ্য হওয়া উচিত সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে কোনপ্রকার সম্পর্ক না রাখতে যারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তাদের নিয়ে সর্বভারতীয় এক সম্মেলন আহ্বান করা।

আমরা যে সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছি, ভারতের ইতিহাসে তা বিরল হতে পারে কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে তা মোটেই নতুন নয়। সাধারণত কালান্তরের সময় এইরকম সঙ্কট দেখা দেয়। ভারতে আমরা গতায়ু একটা যুগের উপর যবনিকাপাত করছি, সেইসঙ্গে

নতুন যুগের অরুণোদয়কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। সাম্রাজ্যবাদের যুগ শেষ হয়ে আসছে এবং স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সমাজবাদের যুগ আমাদের সামনে আসন্ন। তাই ভারত আজ ইতিহাসের এক পথসন্ধিতে দাঁড়িয়ে আছে। দুনিয়ার আসন্ন উত্তরাধিকারে, আমরা যদি ইচ্ছা করি, আমরাও অংশভাগী হতে পারি।

পুরনো কাঠামোটা যখন নিজের ভারে ভেঙে পড়ছে এবং পুরনোর ভগ্নস্তূপ থেকে যখন নতুনের আবির্ভাব এখনও হয়নি, তখন লোকেরা যে বিভ্রান্ত হবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তবে অনিশ্চয়তার এই দুঃসময়ে আমরা যেন আমাদের উপর, দেশবাসীর উপর, মানবজাতির উপর আমাদের বিশ্বাস না হারাই। বিশ্বাস হারানো হবে নিদারুণ এক সর্বনাশ।

এইরকম সঙ্কটের মধ্যেই হয় জাতির নেতৃত্বের চূড়ান্ত পরীক্ষা। বর্তমান সঙ্কটে আমাদের নেতৃত্বের যাচাই হয়ে গেছে। দুর্ভাগ্যবশত সেই নেতৃত্ব আশানুরূপ হতে পারেনি। কেবলমাত্র তার ব্যর্থতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করে এবং সর্বসমক্ষে তুলে ধরেই আমরা ইতিহাসের শিক্ষা লাভ করতে পারি এবং আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপ্রয়াস ও অবদানের ভিত্তি স্থাপন করতে পারি। কিন্তু এইরূপ বিশ্লেষণ ও দোষোদ্ঘাটন সংশ্লিষ্ট সবার কাছেই বেদনাদায়ক হবে, যদিও তা যাতে না হয় তারও উপায় আছে।

এখানে আমি মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে অন্যান্য দেশে অন্যান্য যুগে অনুরূপ সঙ্কটের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাতে চাই। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় যখন অক্টোবর বিপ্লব শুরু হল, বিপ্লবকে কীভাবে পরিচালিত করতে হবে সে বিষয়ে কারও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বলশেভিকদের অধিকাংশই তখন অন্যান্য পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশনের কথা ভাবছে। একমাত্র লেনিন সর্বপ্রকার কোয়ালিশনকে নস্যাৎ করে আওয়াজ তুললেন—"সমস্ত শক্তি সোভিয়েতকে দিতে হবে।" দ্বিধা-সন্দেহ-ভরা এই সময়ে লেনিনের সময়োচিত নেতৃত্ব না পেলে কে বলতে পারে রুশ ইতিহাসের মোড় কোন্ দিকে ঘুরত? লেনিনের অভ্রান্ত

স্বজ্ঞান (বা প্রজ্ঞা) যা চূড়ান্তভাবে ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিল, রাশিয়াকে এমন এক বিপর্যয় ও সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করেছিল যা কিছুদিন আগে স্পেনকে কবলিত করেছে।

এবারে বিপরীত এক দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। ১৯২২ সালের ইটালী ছিল সব দিক থেকে সমাজতন্ত্রের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। তার একমাত্র প্রয়োজন ছিল ইটালীয় এক লেনিনের। কিন্তু লগ্ন পার হয়ে গেল, সে লোক এল না, সোস্যালিস্টদের হাত থেকে সুযোগ চলে গেল। ফ্যাসিস্ট নেতা বেনিটো মুসোলিনি সঙ্গে সঙ্গে সেই সুযোগ কাজে লাগাল। তার রোম যাত্রা এবং ক্ষমতা দখলের ফলে ইটালীর ইতিহাস সম্পূর্ণ এক ভিন্ন খাতে চলে গেল এবং শেষ পর্যন্ত ইটালী সোস্যালিস্ট না হয়ে ফ্যাসিস্টে পরিণত হল। ইটালীর নেতারা দ্বিধা ও সন্দেহের কবলে পড়েছিল এবং সেই কারণে তারা ব্যর্থও হল। মুসোলিনির একটা মস্ত গুণ ছিল, তা শুধু তাকে রক্ষাই করেনি, তাকে জয়গৌরবও এনে দিয়েছে। সে তার নিজের মনকে জানত এবং কাজে এগুতে সে ভয় পেত না। নেতৃত্বের সার কথাই এই।

আজ আমাদের নেতারা ইতস্তত করছে এবং তাদের দ্বিধাসংশয় বামপন্থীদেরও একটা অংশকে নীতিভ্রষ্ট করেছে। "একতা", "জাতীয় ফ্রন্ট", "নিয়মশৃঙ্খলা"—এইগুলি সস্তা স্লোগান হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বাস্তবের সঙ্গে এদের কোন সম্বন্ধ নেই। এই সব চিত্তাকর্ষক স্লোগানে আচ্ছন্ন হয়ে মনে হয় তারা ভুলেই গেছে যে এই সময়ে সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন তা দৃঢ়, আপসহীন একটা নীতি, যে নীতি আমাদের জাতীয় সংগ্রামের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাবে। এই উদ্দেশ্যে যা কিছু আমাদের শক্তি যোগাবে তাই আমাদের সমাদরযোগ্য। যা কিছু আমাদের দুর্বল করবে, তাই পরিত্যাজ্য। যে একতা আমাদের দক্ষিণপন্থী রাজনীতিজ্ঞদের ছত্রছায়ায় বন্দী করে রাখে সে একতা কোনক্রমেই কল্যাণকর নয়। যে কোন অবস্থায় যে কোন শর্তে যদি একতা কাম্য হয়, তাহলে তো আমরা কংগ্রেসকে লিবারেল ফেডারেশনের সঙ্গেও ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হতে বলতে পারি।

বর্তমান সঙ্কটে অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে এযাবৎ যারা বামপন্থী বলে পরিগণিত হত তাদের দলে ভাঙন। আসন্ন ভবিষ্যতে হবে ভারতের বামপন্থার অগ্নিপরীক্ষা। যাদের মধ্যে যোগ্যতার অভাব দেখা যাবে তাদের ভুয়ো বামপন্থী স্বরূপ অচিরেই সবার সামনে প্রকাশ পাবে। ফরওয়ার্ড ব্লক-এর সদস্যদেরও তাদের কর্মে ও আচরণে প্রমাণ করে দেখাতে হবে তারা সত্যিই অগ্রগামী ও সচল। এমনও হতে পারে, আসন্ন অগ্নিপরীক্ষায় যারা মার্কামারা দক্ষিণপন্থী তাদের মধ্যে কেউ কেউ সাচ্চা বামপন্থী—তার মানে কর্মক্ষেত্রে বামপন্থী—হয়ে উঠতে পারে।

বামপন্থা বা বামবাদ বলতে আমরা কী বুঝি সে বিষয়ে এখানে দু-একটা কথা বলা দরকার। বর্তমান কাল আমাদের আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী পর্ব। এই কালে আমাদের প্রধান কর্তব্য সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটানো এবং ভারতের জনগণের জন্য জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন। স্বাধীনতা আসবার পর জাতীয় পুনর্গঠনের যুগ শুরু হবে এবং সেই পর্ব হবে আমাদের আন্দোলনের সোশ্যালিস্ট বা সমাজতান্ত্রিক পর্ব। আমাদের আন্দোলনের বর্তমান পর্বে তারাই বামপন্থী বলে গণ্য হবে যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই চালিয়ে যাবে। যারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইতস্তত করবে, দ্বিধাগ্রস্ত হবে—সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস করার মনোভাব যাদের মধ্যে দেখা যাবে—তারা কোনক্রমেই বামপন্থী হতে পারে না। আমাদের আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে, বামপন্থী ও সমাজবাদ হবে সমার্থক—কিন্তু বর্তমান পর্যায়ে 'বামপন্থী' ও 'সাম্রাজ্যবাদবিরোধী' শব্দ দুটি একই অর্থবোধক হওয়া উচিত।

এই মুহূর্তের সমস্যা—"ভারত কি এখনও দক্ষিণপন্থীদের আয়ত্তাধীনে থাকবে, না, তা চূড়ান্তভাবে বামপন্থা গ্রহণ করবে?" এর জবাব একমাত্র বামপন্থীরাই দিতে পারে। তারা যদি সমস্ত বাধা-বিপত্তি, বিপদ অগ্রাহ্য করে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামে দৃঢ় ও

আপসহীন নীতি গ্রহণ করে, তাহলেই বামপন্থীরা নতুন ইতিহাস রচনা করবে এবং ভারত বামপন্থা গ্রহণ করবে।

যারা এখনও আপসের কথা ভাবছে, তাদের কাছে আয়ার্ল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক ইতিহাস এবং ইঙ্গ-আইরিশ চুক্তির পরিণতি অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ এক মোহমুদ্গর।

সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের অর্থ হবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় সংগ্রাম অচিরেই জনগণের মধ্যে অন্তর্ঘাতী গৃহযুদ্ধে পর্যবসিত হবে। এই অবস্থা কি কোন দিক থেকে কাম্য ?

এদেশে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস যদি সম্ভবপর হয়, তাহলে ভারতের বামপন্থীদের ভবিষ্যতে কেবলমাত্র সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হবে না, সাম্রাজ্যবাদের নবজাত ভারতীয় শাগরেদদের সঙ্গেও তাদের লড়তে হবে। এর অবশ্যম্ভাবী অর্থ দাঁড়াবে, সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম ভারতীয়দের নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধে পরিণত হবে।

সময়ের পুরো সুযোগ আমাদের গ্রহণ করতে হবে, বিলম্ব হবার আগে আমাদের কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী তূর্যনিনাদে সবাইকে ডাক দিয়েছেন। আমাদের যত শক্তি ও সাহস আছে সব নিয়ে তাঁর ডাকে যেন আমরা সাড়া দিই। এই সম্মেলন থেকে সাম্রাজ্যবাদের কাছে ও তার ভারতীয় মিত্রদের কাছে আমাদের সাবধানবাণী পাঠাতে হবে। এই সম্মেলনের সাফল্যের অর্থ হবে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসের অবসান।

আমাদের বিদায় নেবার আগে এই সম্মেলনের প্রস্তাবগুলিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসহীন লড়াই চালিয়ে যাবার জন্য স্থায়ী একটা সংগঠন গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রত্যেকে এখন বুঝতে পারছে, কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি যদি জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার জন্য ডাক না দেয়, অন্যদের ডাক দিতে হবে। অতএব সব দিক বিবেচনা করে এই সম্মেলনের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করার জন্য—এই সঙ্কটের সময় ওয়ার্কিং কমিটি যদি

আমাদের নিরাশ করে, সেই কথা ভেবেও স্থায়ী একটি সংগঠন গড়া দরকার। আমি আশা করি ও বিশ্বাস করি যে, এই সম্মেলনের আলোচনা জাতিগতভাবে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সংগ্রাম ও কাজ চালিয়ে যাবার ভূমিকা হবে।

। ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ।

বঙ্গীয় হিন্দুমহাসভা

৩০শে মার্চ, ১৯৪০, 'ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

গত বছর শেষের দিকে কলিকাতায় হিন্দুমহাসভার নিখিল ভারত বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের দিক থেকে তা বিরাট সাফল্য অর্জন করে এবং মহাসভার নেতারা তাতে খুবই খুশি হন। তাঁরা আশা করতে শুরু করেন তাঁদের সংগঠন বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়বে। সেই সময়ে কানাঘুষা শোনা গিয়েছিল যে সম্মেলনটা আসলে ছিল কলিকাতার আসন্ন পৌরনির্বাচনের প্রস্তুতিমাত্র। পরবর্তী ঘটনাবলী এই সংবাদকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেনি।

কলিকাতা উন্নয়নের ও পৌরকল্যাণের পোষকতা করার জন্য এবং নির্বাচন নিয়ে অকারণ দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ এড়াবার জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং বঙ্গীয় হিন্দুমহাসভা তাদের নিজ নিজ প্রতিনিধি মারফত একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছয়। বোঝাপড়ার শর্তগুলি যথারীতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বোঝাপড়ার ভিত্তি ছিল এই যে, নির্বাচন পরিচালিত হবে সম্মিলিত কংগ্রেস করপোরেশন নির্বাচনী বোর্ডের নামে এবং যারাই নির্বাচিত হবে তারা কংগ্রেস মিউনিসিপাল অ্যাসোসিয়েশনে যোগদান করবে। কংগ্রেস করপোরেশন নির্বাচনী বোর্ড হিন্দুমহাসভার ছজনকে বোর্ডের সদস্যভুক্ত করবে এবং যে কমিটি প্রার্থী নির্বাচন করবে তাতে উভয় সংগঠন থেকে সমানসংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে। কিন্তু হিন্দুমহাসভা পৃথকভাবে নির্বাচন পরিচালন করবে না। তেমনি করপোরেশনে পৃথকভাবে হিন্দুমহাসভা ব্লকও থাকবে না। ভবিষ্যতে করপোরেশনে যদি কোন সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন দেখা দেয়, কংগ্রেস মিউনিসিপাল অ্যাসোসিয়েশন তাকে পার্টিগত প্রশ্ন বলে গণ্য করবে না এবং সেক্ষেত্রে সদস্যদের নিজেদের ইচ্ছামত ভোট দেবার স্বাধীনতা দেওয়া হবে।

উল্লিখিত চুক্তি বেশীদিন টেকেনি। প্রার্থী নির্বাচন নিয়েই মত-পার্থক্য দেখা দেয় এবং চুক্তি বাতিল করে দিতে হয়।

হিন্দুমহাসভার সঙ্গে উপরোক্ত বোঝাপড়ার আগে, নির্বাচন সম্পর্কে আগ্রহী সব সংগঠনের কাছে, বিশেষতঃ হিন্দুমহাসভা ও মুসলিম লীগের কাছে, আমি প্রকাশ্যে আবেদন জানাই, যাতে তাঁরা, অন্যান্য প্রশ্নে যদি মতবিরোধ থেকে থাকে তৎসত্ত্বেও, পৌরক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন। এই সূত্রে কয়েকটি সংগঠনের কাছে আমি চিঠিও পাঠাই। যখন উল্লিখিতভাবে হিন্দুমহাসভা সাড়া দেয় আমরা স্বভাবত আনন্দিত হই।

পরিস্থিতি অনুধাবন করে আমরা যা বুঝেছিলাম তা এই যে, সাময়িক চুক্তি সম্ভব, যেহেতু হিন্দুমহাসভায় জাতীয়তাবাদী মনোভাবাপন্ন লোকেরা আছে। চুক্তি টিকল না, তার কারণ হিন্দু-মহাসভায় যারা গোঁড়া সাম্প্রদায়িক, যারা বরাবরই কংগ্রেসের সঙ্গে যে-কোনপ্রকার বোঝাপড়ার বিরোধী, শেষ পর্যন্ত তারাই দলে ভারি হয়ে উঠল।

পৌর ব্যাপারে হিন্দুমহাসভার সঙ্গে আমাদের বোঝাপড়া হয়েছে বলে দেশময় আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালানো হয়েছে। এই প্রচারের অনেকটাই দুরভিসন্ধি থেকে, কিছুটা ভুল বোঝার দরুন। আমরা দৃঢ়নিশ্চিত যে, বোঝাপড়ার ভিত্তিতে কোন ত্রুটি ছিল না এবং তা ছিল কংগ্রেসের নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। বোঝাপড়া অনুযায়ী যথা-নিয়মে যদি কাজ হত, জাতীয়তার নীতিই জয়ী হত, সাম্প্রদায়িকতার নীতি নয়। দুর্ভাগাবশত কিছু কিছু রাজনীতিবিদ ও রাজনৈতিক দালালের কাছে আমরা সর্বদাই চক্ষুশূল এবং যে কোন সূত্রে আমাদের দু'কথা শোনাতে পারলে তারা ছাড়ে না। দেরিতে হলেও একথা আমরা জোরের সঙ্গে বলতে চাই যে, যে-ভিত্তিতে আমরা হিন্দুমহা-সভার সঙ্গে সাময়িক বোঝাপড়ায় এসেছিলাম সেই ভিত্তিতে অন্য যে কোন সংগঠনের সঙ্গে অনুরূপ বোঝাপড়ায় আসা যেতে পারত।

সাম্প্রতিক সংশোধনী বিলের ফল নতুন কলিকাতা মিউনিসিপাল

আইন এবং সেই আইন অনুযায়ী সত্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই আইন কলিকাতার পক্ষে এমন এক নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে যা বিপদসঙ্কুল। করপোরেশনের হিন্দু ও মুসলিম ভারতীয় সদস্যরা যদি একতাবদ্ধ না হন তাহলে করপোরেশন ইংরেজদের হাতে চলে যাবে। কয়েকজন মাত্র ইংরেজ করপোরেশনে আধিপত্য করতে শুরু করবে, বাংলার আইনসভায় যেমন তারা করে চলেছে।

কংগ্রেস নীতির প্রতি অনুগত থেকে পৌর ব্যাপারে হিন্দুমহাসভার সহযোগিতা লাভ করে যাতে এই বিপদ এড়ানো যায় আমরা তার চেষ্টা করেছিলাম। আমরা ব্যর্থ হয়েছি। উপরন্তু হিন্দুমহাসভার কোন কোন নেতা যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, তাঁরা এবং হিন্দুমহাসভার কিছু কিছু কর্মী নির্বাচন উপলক্ষ্যে যে সকল কূটকৌশল অবলম্বন করেন তাতে আমরা বেদনা ও দুঃখ-বোধ করেছি। হিন্দুমহাসভার নির্বাচনদ্বন্দ্ব অনাবিল ছিল না।

এর চেয়েও বড় কথা, হিন্দুমহাসভা প্রার্থীদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল যারা কংগ্রেস মিউনিসিপাল অ্যাসোসিয়েশনকে ভাঙবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে মনোনীত ও ইংরেজ কাউন্সিলারদের সহযোগিতায় তারা করপোরেশনের ইউনাইটেড পার্টিও গঠন করে। তাদের মধ্যে কয়েকজন পুনর্নির্বাচিত হয়। ভবিষ্যতে তাদের আচরণ কিরকম হবে সহজেই অনুমান করা যায়। ইংরেজ আধিপত্যের হাত থেকে করপোরেশনকে রক্ষা করার চেয়ে কংগ্রেসকে নিপাত করার ইচ্ছাই যে হিন্দুমহাসভার প্রবল ছিল, তারা তার প্রমাণ দিয়েছে।

এখনও আমাদের জানতে বাকি আছে করপোরেশনে আর কোন ভারতীয় দল আছে কিনা যারা কংগ্রেসের সঙ্গে লড়াই করার চেয়ে ব্রিটিশ আধিপত্যকে প্রতিরোধ করতে অধিকতর আগ্রহী।

হিন্দুমহাসভার উল্লিখিত কাজ তার ইতিহাসের এক নতুন পর্বের সূচনা করছে। তা এক রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করতে এবং বাংলাদেশের, অন্ততপক্ষে বাংলাদেশের যে হিন্দুরা এ দেশের জাতীয়তা-বাদের মেরুদণ্ড তাদের, রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছে।

যথার্থ হিন্দুমহাসভার সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ কোন বিরোধ নেই। কিন্তু রাজনৈতিক যে হিন্দুমহাসভা কংগ্রেসকে বাংলার জনজীবনের ক্ষেত্র থেকে উৎখাত করতে প্রয়াসী এবং সেই উদ্দেশ্যে এরই মধ্যে আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করেছে, তার সঙ্গে লড়াই অবশ্যম্ভাবী; সে-লড়াই সবে শুরু হয়েছে।

রামগড়ের আহ্বান

৬ই এপ্রিল, ১৯৪০, 'ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

গত ১৯শে ও ২০শে মার্চ রামগড়ে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন চলছিল তখন সেখানে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত আপস-বিরোধী সম্মেলনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সম্পূর্ণভাবে আমরা তা গত সংখ্যায় প্রকাশ করেছি। দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস সদস্যদের প্রচণ্ড বিরোধিতা উপেক্ষা করে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। শেষ পর্যন্ত সম্মেলনকে পণ্ড করার জন্য তারা নানা প্রকার নির্লজ্জ উপায় অবলম্বন করে। সে সব সত্ত্বেও সম্মেলন সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হয়। জনসমাবেশই শুধু অভূতপূর্ব হয়নি—তা কংগ্রেসের জনসমাবেশকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল,—এই সম্মেলন দেশের প্রত্যেক প্রান্ত থেকে সমাগত যথার্থ সাম্রাজ্যবাদবিরোধীদের অত্যাবশ্যক এক মিলনমঞ্চের চাহিদাও মিটিয়েছিল।

২০শে মার্চ রামগড় আপসবিরোধী সম্মেলনে প্রধান যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তার আলোচ্য বিষয় ছিল আমাদের জাতীয় সংগ্রাম। প্রস্তাবটি দারুণ হর্ষধ্বনি ও প্রচণ্ড উৎসাহের মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। যে মুহূর্তে ঘোষণা করা হল যে, প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে, অমনি শিঙাধ্বনি বেজে উঠল এবং আনন্দ ও পবিত্র উদ্দীপনায় আত্মহারা এক লক্ষ লোক আসন ছেড়ে লাফিয়ে দাঁড়াল। এ এমনই এক দৃশ্য যা মানুষ একবার দেখলে কখনও ভুলবে না।

রামগড় থেকে আহ্বান এল এবং আমরা যারা সম্মেলনে সেখানে উপস্থিত ছিলাম, প্রত্যেকে সাড়া দিলাম। আমাদের সংগ্রাম ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এখন সমগ্র জাতির সেই সংগ্রামের সামিল হওয়া বাকি।

৬ই এপ্রিল বাৎসরিক জাতীয় সপ্তাহ পালন শুরু হবে। ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসে ওই সপ্তাহ অবমাননার সপ্তাহ, কারণ ১৯১৯

খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের অমৃতসরে [এই সপ্তাহেই] জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। পরাধীন জাতির আত্মমর্যাদা ও সম্মানবোধ জাগ্রত করার জন্য তাদের অবমাননার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রায়শই প্রয়োজন।

এই বৎসর জাতীয় সপ্তাহের অভূতপূর্ব এক তাৎপর্য আছে, যেহেতু আপসবিরোধী সম্মেলন নির্দেশ দিয়েছে যে, ৬ই এপ্রিল যেন সমস্ত স্থানীয় সংগ্রাম তীব্রতর করা হয় এবং সমগ্র ভারতের ভিত্তিতে সর্ব-ভারতীয় ফ্রণ্টে এক সংগ্রাম শুরু করা হয়। নতুন জীবন ও অনুপ্রেরণায় কম্পিত হৃদয় নিয়ে আজ আমরা জাতীয় সপ্তাহের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে আছি।

যারা অতল গিরিপ্রপাতের ধারে দাঁড়িয়ে আছে কে জানে তাদের ভবিষ্যতে কী আছে? তারা কি স্বরাজ অর্জন করতে পারবে, না, পারবে না? তারা কি বাইরের শত্রুদের এবং দক্ষিণের ও বামের ধরের পেচকদের পর্যুদস্ত করতে পারবে?

স্বরাজ তারা অর্জন করতেও পারে, নাও পারে। কিন্তু একটি বিষয় সুনিশ্চিত। আর সবাই যখন নিরাশ করেছে তারা যে তখন তাদের কর্তব্য পালন করেছে এই আত্মপ্রসাদ তাদের থাকবে। দেশে ও বিদেশে তারা ভারতীয় জাতির সম্মানকে তুলে ধরবে। এর চেয়েও বড় কথা, তারা এদেশে বামপন্থী আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করবে। এক আঘাতে স্বাধীনতা অর্জন করা যাক বা না যাক, দক্ষিণপন্থা চিরতরে সমাধিস্থ হবে এবং ভারতের মাটিতে বামপন্থা দৃঢ়মূল শিকড় বিস্তার করবে।

রণশিঙা ধ্বনিত হয়েছে। পাশার দান চালা হয়ে গেছে। এইক্ষণে আর দ্বিধা নয়। আমাদের ক্রমাগত বেগে এগিয়ে যেতে হবে। অনাগত ভবিষ্যৎ থেকে উদ্ভূত হবে সেই আলোক যা আমাদের বহু যুগের আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করবে, যা এনে দেবে স্বাধীনতা ও সাম্য; শান্তি ও অন্ন; এবং সবার উপরে পরমানন্দের অমৃতকলস।

যাত্রা হলো শুরু

১৩ই এপ্রিল, ১৯৪০-এর 'ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

রাজনৈতিক অচলাবস্থার এবার অবসান হয়েছে। রামগড়ের আহ্বানের ফল ফলেছে। সেখানে যে রণভেরী বেজেছিল তা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং জীবন্ত জনতা সেই ডাকে অন্তর থেকে সাড়া দিয়েছে। গত সপ্তাহের প্রতিদিনকার কাগজ পড়ে আনন্দের শিহরন জাগে। আমরা আর বসে বসে ভাবনার জট পাকাচ্ছি না বা সমালোচনা করছি না। অন্তহীন বাগবিতণ্ডায় আর আমরা নিরত নেই, নিরত নেই স্থানীয় সংগ্রাম বনাম জাতীয় সংগ্রামের উপর চুলচেরা যুক্তিতর্কে। আমরা এখন যাত্রারত। অন্ধ্রে অন্নপূর্ণাইয়া, বোম্বাইয়ে সেনাপতি বাপত এবং প্রাক্তন সিভিলিয়ান কামাথ, মহারাষ্ট্রে কিষাণ নেতা ভুস্‌কুটে, মাদ্রাজে অধ্যাপক রঙ্গ, আসরাফুদ্দীন চৌধুরী এবং সত্যরঞ্জন বক্সী যথাক্রমে বাংলার কংগ্রেসের এবং বাংলার ফরওয়ার্ড ব্লক-এর সেক্রেটারি এবং আরও অনেক কমরেড যাঁদের অধিকাংশ ফরওয়ার্ড ব্লক ও কিষাণ সভার সঙ্গে যুক্ত—বর্তমানে কারারুদ্ধ। প্রথম দলে তাঁরা গেছেন, গৌরবের জয়মাল্য তাঁদেরই প্রাপ্য। তাঁরা শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী।

এখন সমস্যা, আমাদের করণীয় কী? ১৯৩০ সালে ভারতের বুকে যখন বিপ্লবের আগুন জ্বলছে তখন উগ্রপন্থী বলে পরিচিত একদল ধড়িবাজ কংগ্রেসীরা প্রতিবিপ্লবী এই কারণ দেখিয়ে আন্দোলন থেকে দূরে সরে রইল এবং তাতে যোগ দিতে রাজী হল না। যে সকল নারী পুরুষ বিদেশীদের 'আইন শৃঙ্খলা' অমান্য করছিল, কারাবাসের কষ্ট নির্ভয়ে স্বীকার করছিল এবং পুলিসের বেটন চার্জের সম্মুখীন হচ্ছিল তাদের প্রতিবিপ্লবী বলা এমন কি সরলবিশ্বাসী ভাবতীয়দের কাছেও একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছিল। আন্দোলন উত্তরোত্তর শক্তি অর্জন করে বেড়ে চলল এবং এদেশের অগণিত জনতাকে অনুপ্রাণিত করল এবং বিপ্লবী জনতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও একা হয়ে রইল এই বামপন্থীরা।

আজ সেই উগ্রপন্থীরা একই রকম পরিস্থিতিতে রয়েছে। কেতাবী বিপ্লবী ও মতান্ধ রাজনীতিজ্ঞ হলে ঠিক যেমন হয়, সেইমত তারা যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে তার থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। এই নীতিতে চললে তারা নিজেদেরই পায়ে কুড়ুল মারবে, আর কারও তাতে ক্ষতি হবে না। তারা যতই মুখ ফেরাক, যদি বাধাও দেয়, তবুও যাত্রীদলের পথযাত্রা অবিরাম চলবে। এখন কাজ করার সময়—কথা-কাটাকাটি বা শব্দের অর্থ নিয়ে চুলচেরা বিচারের সময় এখন নয়।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে খবর এসে পৌঁছচ্ছে তাতে দেখা যায় সর্বত্রই আমাদের করণীয় কাজ নিরঙ্কুশ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। কয়েক জায়গায় গান্ধীবাদীরা আমাদের কাজ পণ্ড করার জন্য কংগ্রেস সোস্যালিস্ট ও ন্যাশনাল ফ্রন্টওয়ালাদের সঙ্গে হাত মেলায়, কিন্তু তার ফলে তাদের লাভ হয়েছে চরম ব্যর্থতা। জনতা যে আমাদের সপক্ষে এ-বিষয়ে আজ কোনই সন্দেহ নেই।

ন্যাশনাল ফ্রন্ট দল যে জাতীয় সংগ্রামে যোগ দিতে এগিয়ে আসছে না—এ কি ভাগ্যের পরিহাস নয়? তারা তো অন্ততপক্ষে স্থানীয় সংগ্রামগুলি তীব্রতর করতে এবং তার প্রয়োগক্ষেত্র সম্প্রসারিত করতে এগিয়ে আসতে পারত; অন্যেরা, যেমন কিষাণ সভা ও ফরওয়ার্ড ব্লক, না হয় তাদের খুশিমত কাজ করে যেত। কিন্তু তাদের বর্তমান নীতি মনে হয় অনেকটা 'নিজেও করব না, অপরকেও করতে দেব না' নীতি। তারা নিজেরাও সংগ্রামে যোগ দেবে না, অপরকেও যোগ দিতে দেবে না। ১৯৩০ সালে যারা জাতীয় সংগ্রামে অংশ নিয়েছিল তাদের প্রতি-বিপ্লবী বলে ধিক্কার দেওয়া হয়েছিল; আজ তাদের একতার বিঘাতক বলে ধিক্কার দেওয়া হচ্ছে। উগ্রপন্থীদের এখনও এইটুকু জানতে বাকি আছে যে, সেই একতাই যথার্থ ও অভীপ্সিত একতা যে একতা এগিয়ে নিয়ে যায় কর্ম ও সংগ্রামের দিকে। যে একতা কর্মকে নিরুদ্যম করে তা অর্থহীন ও অসার্থক এবং সেই একতাকে বলা যেতে পারে সমাধি-ক্ষেত্রের একতা।

সময় যত অতিবাহিত হচ্ছে, উত্তেজনা ও উৎসাহ তত বেড়ে

চলেছে। আমাদের অভীষ্টলাভে যেন সহায়তা করার জন্যই সরকার প্রথমদিন আঘাত হেনেছে, আবার শেষের দিনেও হেনেছে। যতবার তারা আঘাত হানবে, যত জোরে তারা আঘাত করবে, ততই বলিষ্ঠ হবে প্রতিক্রিয়া, তত বেশি জাগবে সাড়া। সে দিন চলে গেছে যখন নিপীড়ন করে মানুষকে দাবিয়ে রাখা যায়।

আমরা যখন এগিয়ে যাব, আরও অনেকে আমাদের অনুসরণ করবে, হয়ত বা কিছুটা মন্থরভাবে। দক্ষিণপন্থীরা সত্যাগ্রহ কমিটি, যুদ্ধ কাউন্সিল এবং ঐরকম কত কী গঠন করছে এবং নেতারা সার্ট-প্যাণ্ট পরে কুচকাওয়াজ করছে। ভাল কথা। কিন্তু কতদিন এই মুখপাত চলবে ? আসল নাটক কবে শুরু হবে ? যদি তা রামগড়ে শুরু হত আমরা তাহলে দক্ষিণপন্থীদের অনুগামী হতাম, অগ্রগামী হতাম না। কিন্তু ভাগ্যবিধাতার নির্দেশ আমাদের বাধ্য করেছে সংগ্রামের সূচীমুখ হতে, বাধ্য করেছে জাতীয় সেনার অগ্রবাহিনী হতে। এই ভূমিকা যে কোন ব্যক্তির জীবন সার্থক করে এবং তা পালন করার জন্য কোন ত্যাগই তেমন বড় নয়।

বাজুক দামামা, বাজুক তূর্য। যৌবনদৃপ্ত বক্ষে আসুক জীবনের জোয়ার, আনন্দে রক্ত নেচে উঠুক। মুক্তির লগ্ন সমাগত—আমাদের কেবল কর্তব্য করতে হবে এবং মূল্য দিতে হবে। বহুযুগের নিদ্রা ত্যাগ করে ভারত জেগে উঠেছে—এ ভারত পুনর্জাত, পুনর্সঞ্জীবিত। ভারতমাতার পুত্রকন্যারা মহান যুদ্ধে লড়াই করতে চলেছে। যথাসাধ্য সাহায্য ও সহানুভূতি নিয়ে সকলে যোগ দিক।

চরম পরীক্ষা এখন চলেছে। কে খাঁটি, কে মেকী, এবার আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আলাদা হয়ে যাচ্ছে বামপন্থীদের থেকে দক্ষিণপন্থীরা। এই অগ্নিপরীক্ষা থেকে বামপন্থা জয়ী হয়ে বেরিয়ে আসবে। দক্ষিণপন্থাকে ত্যাগ করা মানে মধ্যপন্থা, প্রতিক্রিয়া ও আপসের পরাজয়। বামপন্থা জয়ী হয়ে যখন আত্মপ্রকাশ করবে, দুনিয়ায় এমন কোন শক্তি নেই যা ভারতকে তার স্বাধীনতার জন্মস্বত্ব থেকে বঞ্চিত রাখতে পারে।

স্বামীজির বাণী

২০শে এপ্রিল, ১৯৪০, ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়'।

ব্রিটিশ সরকার যে কোন সাম্রাজ্যবাদী সরকারের মত ক্ষমাহীন, নির্মম ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আঘাত করার যখনই আবশ্যক বোধ করে তারা আঘাত করতে দ্বিধা করে না এবং ব্যক্তিকে তারা কদাচিৎ সম্মান করে। দেশের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে সম্মানিত তাঁদের কপালেও দুঃখ-ভোগ আছে যদি তাঁরা শাসনকর্তৃত্বের বিরাগভাজন হন।

স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর নামের প্রভাব এদেশে মন্ত্রশক্তির মত। ভারতের কিষাণ আন্দোলনের অবিসম্বাদী নেতা, তিনি আজ জনগণের পরম প্রিয়, অগণিত মানুষের আদর্শ নায়ক। রামগড়ে সারাভারত আপসবিরোধী সম্মেলনের রিসেপসন কমিটির সভাপতিরূপে তাঁকে পাওয়া বাস্তবিক ছিল এক দুর্লভ সৌভাগ্য। ফরওয়ার্ড ব্লক-এর পক্ষে বামপন্থী আন্দোলনের অগ্রগণ্য অন্যতম নেতা হিসেবে এবং ফরওয়ার্ড ব্লক-এর বন্ধু, উপদেষ্টা ও পরিচালক হিসেবে তাঁকে লাভ করা ছিল একাধারে বিশেষ রকমের অধিকার ও সম্মান। প্রকৃতপক্ষে স্বামীজিকে অনুসরণ করে কিষাণ আন্দোলনের প্রথম সারির বহু নেতা ফরওয়ার্ড ব্লক-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করে চলেছেন।

অবশেষে স্বামীজির উপরে শাসনের খড়্গ নেমে এল। আজ সকালে ভারত রক্ষা আইনে পাটনায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গতকাল তিনি কলিকাতায় ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় আমরা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেছি। তখন আমরা কিছুই জানতাম না যে তাঁকে গ্রেপ্তার করার পরওয়ানা পাটনায় তৈরি রয়েছে। গত রাত্রে তিনি কলিকাতা ত্যাগ করে গেছেন। আর আজ সকালে পাটনায় তিনি পুলিস হেফাজতে।

তাঁর কলিকাতা ত্যাগ করার পূর্বে আমাদের স্বাক্ষরিত এক যুক্ত বিবৃতি আমরা প্রকাশ করি, তাতে সারা দেশে যথাযথভাবে যে দিকে

পালনের জন্য আবেদন করা হয়। সেই বিবৃতি এই সংখ্যাতেই দেখা যাবে।

তাঁর গ্রেপ্তারের খবর পাওয়া মাত্র, তাঁকে কারারুদ্ধ করার প্রতিবাদে ২৮শে এপ্রিল সারা ভারত স্বামী সহজানন্দ দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা মনে-প্রাণে আশা করি ঐ দিনটি এমনভাবে পালন করা হবে যাতে ব্রিটিশ সরকার সমুচিত জবাব পায়।

স্বামীজি তাঁর গ্রেপ্তার ও কারাবাসের মধ্যে দিয়ে যে দুর্লভ সম্মানের অধিকারী হলেন তার জন্য আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাই। সত্য বলতে কি, তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সরকারকে তিনি বাধ্য করতে পেরেছেন বলে তিনি ঈর্ষার পাত্র।

স্বামীজির গ্রেপ্তারকে স্বাগত জানানো উচিত। অচলাবস্থাকে চূর্ণ করে ঝাঁপিয়ে পড়তে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তা অনুপ্রাণিত করবে। ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা আর সয় না। কাজ করার সময় এসে গেছে এবং আমাদের কাজে নামতে হবে।

কারান্তরালে স্বামীজি অদৃশ্য হয়েছেন, কিন্তু তিনি পিছনে রেখে গেছেন তাঁর অবদান। তাঁর কাছ থেকে আমাদের শেখবার আছে তাঁর জীবনের শিক্ষা—সেবা ও আত্মত্যাগের শিক্ষা, অব্যর্থ রাজনৈতিক সজ্ঞানের শিক্ষা, বিপ্লববাদ ও সক্রিয় সমাজবাদের শিক্ষা। মূলত তিনি কাজের লোক। তাই গ্রেপ্তার হবার পর তিনি দেশবাসীকে আবেদন করেন তারা যেন বিলম্ব না করে দ্বিধাসংকোচ ত্যাগ করে এখনই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

স্বামীজির গ্রেপ্তার নব্য ভারতের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। আমাদের এই চ্যালেঞ্জ এখন নিতে হবে। ব্রিটিশ সরকার দেখুক ও বুঝুক সারা দেশ তাঁর পশ্চাতে এক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"হয় স্বাধীনতা দাও, নয়ত মৃত্যু" পবিত্র এই সঙ্কল্প মনে নিয়ে দ্বিগুণ শক্তি ও নতুন উদ্যমে আমাদের যাত্রা অব্যাহত থাকুক। তখনই কেবল সব বাধা অপসারিত হবে এবং রাত্রিকবলিত এই দেশে হবে স্বাধীনতার অরুণোদয়।

নতুন কুচকাওয়াজ

২৭শে এপ্রিল, ১৯৪০, ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

লণ্ডন আবার মুখর হয়েছে। কিন্তু যে সময়ে ভারত-সচিবের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে ভারতের জনসাধারণের কৌতূহল জাগ্রত হত এখন আর সেদিন নেই। সেই কারণে লর্ড জেটল্যাণ্ডের বক্তৃতা সম্পর্কে ঘোষণা, এমন কি বক্তৃতার ভাষণ জনসাধারণের মনে কোন সাড়া জাগায়নি। বক্তৃতাটা যথারীতি আমলাতান্ত্রিক ছকে বাঁধা উক্তি বলে কোনই আমল পায়নি। এইরকম উক্তি টেমস নদীর উপকূল থেকে প্রায়শই শোনা যায়।

ইংরেজদের দৃষ্টিকোণ থেকে, ভারতীয় পরিস্থিতিকে বোঝানো যায় একটি কথায়—অচলাবস্থা। কিন্তু কে এই অচলাবস্থা ভঙ্গ করবে এবং কিভাবেই বা করবে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তা পারে কি? এই পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রেখে যে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন স্পষ্টতই তাদের সেই জীবতার অভাব। এবং এই জীবতার অভাবের মূল কারণ এই যে, এইরকম সঙ্কটকে অবধারণ করতে গেলে এবং ঠিকমত তার সমাধান করতে হলে যে ন্যায়নিষ্ঠা ও বৈপ্লবিক মনোভাব থাকা দরকার তা তাদের নেই।

প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদী মন সব সময়ে একটা বাঁধা ছকের মধ্যে কাজ করে। তা কখনও নতুন কোন পথের হদিস দিতে পারে না। সেই কারণে অবক্ষয় যখন একবার শুরু হয়, সাম্রাজ্যবাদের অধঃ-পতন তখন রোধ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। মনে পড়ে প্রাচীন অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় সাম্রাজ্যের কথা। গত মহাযুদ্ধের পর তা প্রায় তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে। এমন কি ১৯১৪ সালে যখন মহাযুদ্ধ শুরু হয়, তার পরেও ওই সাম্রাজ্যকে হয়ত রক্ষা করা যেত যদি তার শাসকরা চেক, সার্ব, ক্রোট, স্লোভিন ইত্যাদির মত অবদমিত জাতিগুলির যুক্তিসঙ্গত

সব দাবি মিটিয়ে দিতে দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বন করত। সাম্রাজ্যবাদ—এবং বিশেষ করে প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদ—চিরাচরিত ভাবে "ছকে বাঁধা ও অনড়।"

কিন্তু এই ঘটনার জন্য আমাদের আফসোস করার কিছু নেই। পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ার মত নমনীয়তা ও সামর্থ্য প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদের থাকে না বলেই তা শেষ পর্যন্ত আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়াতে পারে, যদিও তার ফলে আমাদের অব্যবহিত কর্তব্য, ভিন্নাবস্থায় যা হত, তার থেকে অনেক বেশী দুরূহ হতে পারে।

গত চার বছর, বিশেষত গত আট মাস ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের তুলনায় জার্মানির মত নতুন এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অনেক বেশি সক্রিয়তা ও সচলতার পরিচয় দিয়েছে। এই সক্রিয়তা না থাকলে সোভিয়েত-জার্মান চুক্তির মত বৈপ্লবিক ও অশ্রুতপূর্ব এক পদক্ষেপ সম্ভব হত না। এবং এই সচলতা না থাকলে স্কাণ্ডিনেভিয়ার উপর যে দ্রুত আক্রমণ সারা দুনিয়াকে চমকিয়ে দিয়েছে তাও কখনও সম্ভব হত না।

সক্রিয়তা জীবনের ধর্ম, সক্রিয়তা বিকাশের ধর্ম। এবং সেই সক্রিয়তাই সুস্থ, কল্যাণকর ও সৎ যখন তার মধ্যে দিয়ে প্রগতিশীল ভাবের প্রকাশ হয়। এইপ্রকারের সক্রিয়তা আজ ভারতের অত্যন্ত প্রয়োজন।

একমাত্র হোয়াইট হলই আজ পাঁয়তারা কষছে না। ওয়ার্ধাও একই কাজ করছে। আমরা যে অনিশ্চয়তা ও অকর্মণ্যতার কুয়াশার জালে চাপা পড়েছি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কী ভাবে তা অপসারণ করবে ঠিক করছে আমাদের তা জানা নেই। হয়ত তারা নিজেরাও জানে না। গান্ধীবাদী কংগ্রেস মহাত্মার দ্বারপ্রান্তে অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছে, কখন তাঁর "অন্তরের আলো" জ্বলে উঠবে। কিন্তু সেই আলো যদি আমাদের নিরাশ করে, যেমন কদিন আগে রাজকোটে করেছে, তাহলে কী হবে ? রাজকোটে যখন তা ব্যর্থ হয়, তার অনুকল্প কোন নতুন আলো বা নতুন টেকনিক সম্পর্কে জনসাধারণ আগ্রহও দেখায়নি

কিংবা তা গ্রহণ করতেও চায়নি। বর্তমান সঙ্কটের ক্ষেত্রেও ইতিহাসের আরেকবার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে।

কংগ্রেস অধিবেশনের সময় রামগড়ে ১৯শে ও ২০শে জুন যে সারা ভারত আপসবিরোধী সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়, তারপরে কংগ্রেসের সদর কার্যালয়ে কিছুটা তৎপরতা দেখা যায়। একটি সত্যাগ্রহ শপথ রচনা করা হয়েছে এবং সমস্ত কংগ্রেস সংগঠনের সব এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যদের সেই শপথ নিতে বাধ্য করা হয়েছে, না নিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সম্ভবত আমরা এই শপথ নিতে পারি না এবং তা একাধিক কারণে। প্রথমত, আমাদের সংগ্রাম এর আগেই শুরু হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কবে যে সংগ্রাম শুরু করবে এবং শুরু করবে কিনা, তা জানা যাচ্ছে না। তৃতীয়ত এই শপথ নিলে আমরা সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নিয়ম-শৃঙ্খলার আওতার মধ্যে চলে যাব এবং সে ক্ষেত্রে অন্য কোন সংগঠন বা সংস্থা যদি সংগ্রাম শুরু করে তাহলে সেই সংগ্রামে আমাদের যোগদান করা সম্ভব হবে না। এসব সত্ত্বেও এই উদ্যমকে আমরা সাদরে সমর্থন করছি। অবশ্য যদি তার পরিণাম হয় জাতীয় সংগ্রাম।

কংগ্রেস সদর দপ্তরে আরেক প্রকার তৎপরতার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। কয়েক স্থানে এখন নেতাদের শিবির গড়ে তোলা হচ্ছে এবং নেতারা কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করছেন। নতুন ধরনের এইসব কুচকাওয়াজের ছবি খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে। তা সত্যিই কৌতুকপ্রদ। ১৯২০ বা ১৯৩০ বা ১৯৩২ সালে সারা দেশ যখন স্বরাজের জন্য ব্যাপক জাতীয় সংগ্রামের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল তখনও এই ধরনের কুচকাওয়াজের কোন ব্যবস্থা হয়নি। এই নতুন কুচকাওয়াজের অভিনবত্ব সবার কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। একে সমর্থন করার আরও একটি কারণ এই যে, কংগ্রেস কেবিনেটের পাঁয়তারা কষার নীতিকে এ ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই "কুচকাওয়াজ" কবে গণসত্যাগ্রহের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে সক্রিয় হয়ে উঠবে? আমাদের এখনকার ভাবনা এই।

আজ অনেকেরই এই ধারণা যে, আপসবিরোধীওয়ালাদের চাপে পড়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি নিকট ভবিষ্যতে অত্যন্ত সীমিত-ভাবে সত্যাগ্রহ শুরু করতে পারে। আরও গুজব শোনা যাচ্ছে যে, এই সীমিত সত্যাগ্রহ এক বা একাধিক নেতার "আমরণ অনশন" বা অনশন ধর্মঘটের রূপ নিতে পারে। কিন্তু এইসব কূটচালে আমাদের বিপথচালিত বা বিভ্রান্ত হওয়া উচিত হবে না। চৌরিচৌরা বা দিল্লী চুক্তি বা হরিজন আন্দোলন অথবা নবতর এই আমরণ অনশন কিছুই যেন আপসহীন গণসংগ্রামের পথ থেকে আমাদের মনোযোগকে বিচলিত না করে। আমরা চাই জনগণের স্বাধীনতা এবং সেই স্বাধীনতা যা জনগণ নিজেদের প্রয়াসে, নিজেরা দুঃখবরণ করে ও আত্মত্যাগের ভিতর দিয়ে জয় করে আনবে। একমাত্র তখনই আমরা যথার্থ স্বরাজ ও স্থায়ী স্বরাজ লাভ করব।

কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িক সংগঠন

৪ঠা মে, ১৯৪০-এর ফরওয়ার্ড ব্লক'এ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

খুব বেশিদিন আগে নয় এমন একসময় ছিল যখন কংগ্রেসের স্বনামধন্য নেতারা হিন্দুমহাসভা ও মুসলিম লীগের মত সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সদস্য ও নেতা হতে পারত। তখনকার দিনে এইসব সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সাম্প্রদায়িকতা তেমন প্রকট ছিল না। এই কারণে লালা লাজপৎ রায় হিন্দুমহাসভার নেতা হতে পেরেছিলেন এবং আলী ভাইরা হতে পেরেছিলেন মুসলিম লীগের নেতা। বাংলায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, মৌলানা আক্রম খাঁ মুসলিম লীগেরও একজন নেতা ছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এই সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি আগের থেকে অনেক বেশি সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছে। এরই প্রতিক্রিয়ায়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার গণতন্ত্রে একটি ধারা যোগ করেছে, তাতে বলা হয়েছে হিন্দুমহাসভা বা মুসলিম লীগের মত কোন সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সদস্য কংগ্রেসের নির্বাচিত কমিটির সদস্য হতে পারবে না।

যেহেতু কংগ্রেস এই নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করেছে, কোন কোন মহলে এইসব সাম্প্রদায়িক সংগঠনকে অস্পৃশ্য বলে গণ্য করার মনোভাব দেখা দিয়েছে। সামাজিক অস্পৃশ্যতাকে যখন আমরা দূর করতে চেষ্টা করছি, তখন মনে হচ্ছে রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতাকে আমরা উৎসাহ দিচ্ছি। ফলত যখনই এই সংগঠনগুলিকে কংগ্রেসের কাছাকাছি আনবার প্রয়াস করা হয়, তখন অনেকের উঁচু মাথা তাতে হেঁট হয়ে যায়। পৌরক্ষেত্রে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি যখন হিন্দুমহাসভার সঙ্গে এবং পরে মুসলিম লীগের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চায়, তখন তাদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল।

হিন্দুমহাসভার সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসবার জন্য দুবার প্রয়াস করা হয়েছিল। প্রথমবার করা হয় গত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষাশেষি কলিকাতা মিউনিসিপাল নির্বাচনের আগে। দ্বিতীয়বার করা হয় এপ্রিলের (গত মাসের) মাঝামাঝি সাধারণ নির্বাচনের পরে এবং অল্‌ডারম্যান নির্বাচনের প্রাক্কালে।

প্রথম চুক্তির ভিত্তি ছিল, নির্বাচন পরিচালিত হবে কেবলমাত্র কংগ্রেসের নামে এবং নির্বাচনের পরে জয়ী প্রার্থীরা কংগ্রেস মিউনিসিপাল অ্যাসোসিয়েশনে যোগদান করবে। প্রার্থীদের নির্বাচন করবে হিন্দুমহাসভা ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা সম্মিলিতভাবে এবং হিন্দুমহাসভার প্রতিনিধিদের ভিতর থেকে কংগ্রেস নির্বাচন বোর্ড একজন সদস্যকে কোঅপ্ট করে নেবে। প্রার্থী মনোনীত করার প্রশ্নে এই চুক্তি ভেঙে যায় এবং তার ফলে নির্বাচনে কংগ্রেস ও হিন্দু-মহাসভার মধ্যে দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়।

কংগ্রেস নীতির দিক থেকে বিচার করলে উল্লিখিত যে বোঝাপড়া হয়েছিল তাতে আপত্তিকর কিছুই ছিল না। তা সত্ত্বেও খবরটা যখন প্রচার হল দেখা গেল কেবলমাত্র মুসলিমদের মধ্যেই নয়, গোঁড়া কংগ্রেসীদের মধ্যেও, যাদের মধ্যে গান্ধীবাদীরাও ছিল, সংস্কার ও অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এর কারণ হিসেবে একটি তত্ত্বেই আসা যায় যে, সম্প্রতি আমাদের মধ্যে একপ্রকারের রাজনৈতিক অস্পৃশ্যতা দেখা দিচ্ছে।

হিন্দুমহাসভার সঙ্গে দ্বিতীয় বোঝাপড়া ভেঙে যায় ১৬ই এপ্রিল রাত দশটা নাগাদ এবং তা ভেঙে যায় অলডারম্যানের পদের জন্য যে পাঁচজন প্রার্থীকে কাউন্সিলারদের সম্মিলিতভাবে নির্বাচন করার কথা ছিল তাদের মনোনীত করার প্রশ্নে। এই চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটে যাবার পর রাত এগারটা থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের আলাপ-আলোচনা শুরু হয় এবং রাত দুটো নাগাদ একটা মতৈক্যে পৌঁছনো যায়।

মতৈক্য হয় অলডারম্যানদের ও মেয়রের প্রশ্নে। সব যদি

ভালোমত চলে, এই চুক্তি পৌরসমস্যার অন্যান্য ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হবে। এবং ভাগ্য যদি অনুকূল হয় এই ধরনের বোঝাপড়ার ক্ষেত্র ও প্রয়োগ-সম্ভাবনা একদিন এত ব্যাপক হবে যে তার মধ্যে প্রদেশ ও দেশ সম্পর্কিত অনেক বড় বড় প্রশ্নও থাকবে।

হিন্দুমহাসভা এবং অমৃতবাজার পত্রিকার মত সংবাদপত্রের কৃতিত্ব এই যে, তারা হঠাৎ অত্যুগ্র সাম্প্রদায়িকতার পোষকতা করতে শুরু করেছে, বাংলাদেশের এবং অন্যত্র হিন্দুদের মন বিষিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে দিনের পর দিন সাম্প্রদায়িক বিষ উদ্‌গার করে চলেছে। কিন্তু হিন্দুদের বিপথচালিত করার সব প্রয়াস এতদিন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। সম্প্রতি শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ও দেশবন্ধু পার্কে কলিকাতার নাগরিকদের দুটি বিরাট সভা হয়, উদ্দেশ্য ছিল উল্লিখিত কংগ্রেস-লীগ চুক্তির প্রশ্নে কলিকাতার জনসাধারণের রায় কী তা জানা। প্রথম সভায় কম করে ধরলেও কুড়ি হাজার লোক উপস্থিত ছিল এবং দ্বিতীয় সভায় ছিল ত্রিশ হাজার। উভয় সভাতেই আমাদের প্রতি সর্বসম্মত আস্থা জ্ঞাপন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, কিছু সংখ্যক সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হিন্দু উল্লিখিত বোঝাপড়ার জন্য আমাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

আমরা কিন্তু আমাদের দিক থেকে সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলিকে অস্পৃশ্য বলে মনে করি না। উপরন্তু আমরা মনে করি কংগ্রেসের ক্রমাগত চেষ্টা করা উচিত তাদের ভালো করে বুঝিয়ে নিজেদের দিকে টেনে আনা। গত তিন বছর ধরে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছনোর জন্য বারে বারে চেষ্টা করা হয়েছে। কোন এক পর্যায়ে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন আমি নিজে মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মিস্টার জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং তাঁর সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎকার ঘটে। সেই সময় সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয়, যদিও তাতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ও মহাত্মা গান্ধীর আশীর্বাদ আমি লাভ করেছিলাম। যে প্রয়াস শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল তাতে যারা আপত্তি করেনি তারা এখন বর্তমান প্রয়াসে ঘোরতর আপত্তি জানাচ্ছে

যেহেতু এই প্রয়াস সফল হয়েছে। সংস্কার কি এর চেয়ে বেশিদূর যেতে পারে ?

মুসলিম লীগের সঙ্গে বর্তমান চুক্তিকে আমরা বিরাট একটা কীর্তি বলে মনে করি, বাস্তবাবস্থার দিক থেকে নয়, সম্ভাব্যতার দিক থেকে। গত তিন বছর ধরে আমরা অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছিলাম, কিন্তু সাফল্যলাভ করিনি। প্রতিবারই সাম্প্রদায়িক সংস্কার ও বিদ্বেষের অনড় এক দেওয়ালে আমরা প্রতিহত হয়েছি এবং আমাদের সব চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে। এইবার আমরা সেই দেওয়াল ভেদ করতে পেরেছি এবং তার ফাটল দিয়ে আশার আলোকরশ্মি দেখা যাচ্ছে। এবারে কিছুটা আশা হচ্ছে যে আমরা হয়ত এমন একটা সমস্যার শেষ পর্যন্ত সমাধান করতে পারব যা অনেকের কাছেই প্রায় সমাধানের অতীত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। সামান্য সূত্রপাত থেকে অনেক সময় বিরাট বিরাট কীর্তির উদ্ভব হয়।

ভারত, জাগো!

১১ই মে, ১৯৪০-এর ফরওয়ার্ড ব্লকএ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

ইওরোপের ঘটনাবলী দ্রুত এক সঙ্কটের দিকে ধেয়ে চলেছে। হল্যাণ্ডে নাৎসী আক্রমণের যে সংবাদ আমাদের কাছে এসে পৌঁছিয়েছে তা জার্মানির বর্তমান শাসকদের দুর্ধর্ষতার ও স্থির সংকল্পের নিশ্চিত প্রমাণ, সেইসঙ্গে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কি রকম দ্রুতবেগে তারা কাজ করতে পারে। যুদ্ধ বাধবার পর থেকে স্কাণ্ডিনাভিয়ার দেশগুলিতে নাৎসীদের অভিযান ছাড়া আর যা ঘটেছে তাতে আমরা অবাক হইনি। প্রকৃতপক্ষে আমাদের ভবিষ্যৎকথন অনেকাংশেই বাস্তব ঘটনার দ্বারা সমর্থিত হয়েছে।

১৯৩৮-এর অক্টোবরে ইওরোপের আসন্ন যুদ্ধসঙ্কটের কথা আমরা প্রকাশ্যে আলোচনা শুরু করি। ১৯৩৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে জলপাইগুড়িতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে সর্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে এই চিন্তাই ব্যক্ত হয় এবং ভারতের জাতীয় দাবির প্রশ্নে ব্রিটিশ সরকারের কাছে চরমপত্র দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। ১৯৩৯-এ মার্চ মাসে ত্রিপুরি কংগ্রেসে জলপাইগুড়ি-প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয় কিন্তু তা বিনা ভণিতায় অগ্রাহ্য হয়। যদি সেখানে তা গৃহীত হত, সরকারকে তাহলে চরমপত্র দেওয়া হত, জাতীয় সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি পুরোদমে শুরু হয়ে যেত এবং নির্ধারিত ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পরে পরেই জাতীয় সংগ্রাম আরম্ভ হত। কিন্তু এইমত কিছুই হল না। অপরপক্ষে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বামপন্থীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করল। এই জেহাদ আজও চলেছে।

ত্রিপুরি কংগ্রেসের ছয় মাস পরে ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে ইওরোপে যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধ বাধবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক মহলে আশা জেগেছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রারম্ভিক প্রস্তুতি হিসেবে সবাইকে সঙ্ঘবদ্ধ করা

হবে। প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পদত্যাগ এই আশায় ইন্ধন যোগায়, কিন্তু অচিরেই সে আশা ধূলিসাৎ হয়। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম এড়াবার উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার যুক্তির অবতারণা করা হয়। আমাদের পক্ষে আমরা একাধিক কারণে অবিলম্বে সংগ্রাম শুরু করবার জন্য সঙ্গতভাবে অবিরাম দাবি জানাতে থাকি। অন্যতম প্রধান বিবেচনার বিষয় ছিল এই যে, ১৯৪০-এর বসন্তকালে যুদ্ধ একটা সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হবে এবং আমাদের দিক থেকে খুবই স্বাভাবিক যে, আমরা সে অনুযায়ী আমাদের আন্দোলনের সময় ঠিক করতে চেষ্টা করব। আমরা যদি ১৯৪০-এর বসন্তকালে ভারতেও সঙ্কট আনতে চাইতাম, কয়েক মাস আগে থেকে আমাদের আন্দোলন শুরু করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমাদের যুক্তি ও আবেদনে কেউ কর্ণপাত করল না। আমাদের বিরুদ্ধে বলা হল যে, ইওরোপের সঙ্কট ১৯৪০-এর এপ্রিলের আগে যখন আসছে না, আমাদের তাড়াহুড়া করে আন্দোলন শুরু করার দরকার নেই।

মাসের পর মাস যত কেটে যেতে লাগল আমাদের নেতারা শুধু কথার পর কথা বলে গেলেন এবং তর্কের জাল বুনে চললেন। কার্যকর কিছুই করা হল না এবং ১৯৪০-এর বসন্তকালও এসে গেল। বসন্তের সমাগমে জার্মানদের সামরিক তৎপরতা দুর্ধর্ষ হয়ে দেখা দিল। এক সকালে ডেনমার্ক অধিকৃত হল এবং নরওয়ে আক্রান্ত হল। বিদ্যুৎ-গতিতে জার্মানি আঘাত হানল। হতচকিত মিত্রশক্তি পর্যুদস্ত হল।

এখন হল্যাণ্ড আক্রান্ত হয়েছে এবং সম্ভবত চক্ষের পলকেই অধিকৃত হবে। কেউ জানে না আরও কত বিস্ময় আমাদের কপালে আছে। ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে জাপানীদের আক্রমণের কথা লোকেরা বলাবলি করছে। মনে হচ্ছে ইটালীয় সেনা-বাহিনী লড়াইয়ের জন্য কোমর বাঁধছে,—বিশেষ করে যখন ডুচে পালাৎসিও ভেনিৎসিয়ার অলিন্দ থেকে রণহুঙ্কার দিয়ে চলেছেন এবং বাইরের জনতা "টিউনিশিয়া, টিউনিশিয়া" বলে চিৎকার করছে। নরওয়ের বিপর্যয়ের পর লণ্ডনে মন্ত্রিসভা টলটলায়মান।

কিন্তু ভারত কি করছে? ভারতের জাতীয় কংগ্রেসই বা কি করছে?

হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেস দক্ষিণপন্থীরা ফরওয়ার্ড ব্লককে ও কিষাণসভাকে আক্রমণ করে চলেছে। ফরওয়ার্ড ব্লক ও কিষাণসভা তাদের দিক থেকে কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সাহায্য ব্যতিরেকে চলবার চেষ্টা করছে। কংগ্রেস হাই কমাণ্ড কী যে করা উচিত সে বিষয়ে অনিশ্চিত এবং তাদের দ্বিধা ও সংশয়ের এই মনোভাব অন্যের ভিতরেও ছড়াচ্ছে এবং কিছুপরিমাণে মনোবল ক্ষুণ্ণ করছে। মুসলিম লীগ জাতীয় সমস্যার থেকে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নিয়েই বেশী ব্যাপৃত। এই সবের যোগফল দাঁড়াচ্ছে এই যে ভারত আজ এক অচলায়তনে আবদ্ধ। কর্মতৎপর নেতৃত্বের অভাবে সমগ্রভাবে জনসাধারণও তাদের কর্মতৎপরতা হারিয়ে ফেলেছে।

কি করে আমরা আমাদের দেশকে রাজনৈতিক এই অচলাবস্থা থেকে উদ্ধার করব, আন্তর্জাতিক সঙ্কটকে ভারতের স্বার্থে কাজে লাগিয়ে নিজেদের জন্য স্বাধীনতা অর্জন করব? এই মূহূর্তে এইটেই প্রধান সমস্যা।

এক একটা দিন চলে যাচ্ছে, অসহায় আক্রোশে নিজেদের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। দেরি হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ভারতকে রক্ষা করার জন্য কিছুই কি করা যাবে না? ভারতের শৃঙ্খলিত জনতা কি আলস্য ত্যাগ করে নিজেদের মধ্যেকার তুচ্ছ বিরোধ মিটিয়ে ফেলে এই প্রাচীন ও মহান দেশের স্বাধীনতা দাবি করতে-একসঙ্গে উঠে দাঁড়াবে না?

এই সঙ্কটমুহূর্তে আমরা আমাদের যতটুকু সাধ্য দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত আছি, যদি তাতে আমরা যা খুইয়েছি এখনও তা উদ্ধার করতে পারি এবং অর্জন করতে পারি আমাদের জাতীয় মুক্তি। কংগ্রেসের সর্বোচ্চ পরিচালকরা সংগ্রাম শুরু করার জন্য জাতিকে আহ্বান করুক। সেই বিরাট ও মহৎ কর্তব্য পালনে আমরাও তাদের অনুগামী হব। জাতীয় সংগ্রামের সক্রিয় কার্যক্রমের

ভিত্তিতেই কংগ্রেসের ভিতরে একতা সম্ভব। এবং চিরস্থায়ী ও পাকাপাকি ভিত্তিতে তখনই আমরা হিন্দু-মুসলমান একতা সম্ভব করার জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা করতে পারি।

ইওরোপ যখন অনিশ্চিত অবস্থায় বিভ্রান্ত, তখন পঁয়ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর সম্মিলিত দাবিকে কে প্রতিরোধ করবে? স্বাধীনতা প্রায় আমাদের নাগালের মধ্যে এসে গেছে। আমাদের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে কেবল তা করায়ত্ত করলেই হয়। আমরা কি তা করব?

কাজে তৎপর হও

১৮ই মে, ১৯৪০ ফরওয়ার্ড ব্লকএ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

আমাদের বিগত সংখ্যায় আমরা আমাদের সম্পাদকীয় স্তম্ভে আন্তর্জাতিক সঙ্কটের উল্লেখ করে আমাদের দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছি তাঁরা যেন অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে সাহসে ভর করে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন। আমরা কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের কাছেও আবেদন জানাই এবং তাঁদের অনুরোধ করি তাঁরা যেন জাতীয় সংগ্রামের সক্রিয় এক কার্যক্রমের ভিত্তিতে সব কংগ্রেসকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করেন। সেই সঙ্গে আমরা এ কথাও জানিয়ে দিই যে এই জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যপালনে আমরাও অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। যে মৌলিক প্রশ্নে হাই কমাণ্ড থেকে আমাদের আলাদা হয়ে যেতে হয় তা জাতীয় সংগ্রামের প্রশ্ন এবং হাই কমাণ্ড যদি এই প্রশ্নে আমাদের সন্তুষ্ট করতে পারে তাহলে অতীতে আমাদের মধ্যে যতই বাদবিসম্বাদ হয়ে থাক তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাতে আমাদের কোন বাধা নেই। গ্রেট ব্রিটেনের বিভিন্ন দল যদি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অতীত বৈরিতার কথা ভুলে গিয়ে "জাতীয়তাবাদী" কেবিনেট গঠন করতে পারে, তাহলে যে কংগ্রেস সদস্যরা একই রাজনৈতিক লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত বলে জাহির করে থাকেন তাঁরা অভূতপূর্ব এক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েও কি সবাইকে দলবদ্ধ করতে অপরাগ হবেন? আমাদের যদি স্বাজাত্য ও সম্মান-বোধ থাকে, আমাদের তা করা উচিত।

ফরওয়ার্ড ব্লক তার জন্মক্ষণ থেকে জাতীয় সংগ্রামের যে কার্যক্রমের কথা বলে আসছে, তা এখন ন্যায্য প্রতিপন্ন হয়েছে। তা যদি না হত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বহু আগেই গান্ধীজির পদাঙ্ক অনুসরণ করে ব্রিটিশ সরকারকে বিনাশর্তে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিত। আমরা সাফল্যের সঙ্গে আপস ও আত্মসমর্পণের নীতি প্রতিরোধ করেছি

এবং তার পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আমরা সংগ্রামও শুরু করে দিয়েছি। যত দিন যাবে সেই সংগ্রাম শক্তিতে ও আকারে সুনিশ্চিত-ভাবে উত্তরোত্তর বেড়ে চলবে।

ইওরোপের সঙ্কট যতই ঘনীভূত হবে, পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ক্রমে ক্রমে ততই দুর্বল হয়ে পড়বে। সেই অনুপাতে আমাদের কাজও উত্তরোত্তর হালকা হয়ে যাবে। এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যদি শেষ পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়, জাতীয় সংগ্রামের সমস্যার কোন গুরুত্বই তখন থাকবে না। যুদ্ধের বিপর্যয়ের ফলে যদি রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি হিসেবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অস্তিত্ব লোপ পায় তাহলে কার সঙ্গে আমরা লড়াই করব?

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, যে নতুন পরিস্থিতির দ্রুত বিকাশ ঘটছে তার ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াইয়ের সমস্যা থেকে ধীরে ধীরে হলেও অনিবার্যভাবে অনুপূরক আরেকটা সমস্যা দেখা দেবে, তা আভ্যন্তরিক একতা ও সংহতির সমস্যা। আমরা কয়েক যুগ ধরে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিলাম এখন তা আমাদের নাগালের মধ্যে। কি করে আমরা তা আয়ত্তে আনব? এবং একবার তা অর্জন করার পর কি করেই বা তা রক্ষা করব?

আমাদের ভবিষ্যতে কী আছে সে সম্পর্কে আজ আমাদের সামনে তমসাচ্ছন্ন অনিশ্চয়তা। কিন্তু তা নিমিষে উধাও হবে যদি আমরা দুটি জিনিস করতে পারি—কংগ্রেসে কর্মীদের মধ্যে একতা এবং হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নের মীমাংসা। তাহলেই আমরা সহজে স্বরাজ অর্জন করতে পারব এবং যে স্বরাজ অর্জন করব তা রক্ষা করতেও পারব।

আমাদের হাতে সময় অত্যন্ত অল্প এবং আমাদের যদি কাজ করতেই হয় অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। ইওরোপে বিদ্যুৎগতিতে ঘটনা ঘটে চলেছে এবং ঘটনার গতির সঙ্গে যদি আমরা তাল রাখতে চাই, আমাদেরও সমান তৎপর হতে হবে। সময় থাকতে আমরা যেন তৈরি হই। বিলম্ব সর্বদা বিপজ্জনক এবং আজ একথা বেশি করে সত্য।

বাংলা, এগিয়ে চল !

১লা জুন, ১৯৪০ ফরওয়ার্ড ব্লকএ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

বাংলার বাইরে সচরাচর কেউ জানে না যে, ইওরোপে যুদ্ধ বাধবার পর এই প্রদেশে আপৎকালীন অর্ডিনান্স জারী করা হয়েছিল যা কার্যত এখানকার জনজীবনের কণ্ঠরোধ করেছিল। কঠোরতা ও নির্মমতার দিক থেকে বাংলায় যে "অর্ডিনান্স রাজ" প্রবর্তন করা হয়েছিল তার সঙ্গে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী-শাসিত অন্যান্য প্রদেশের "অর্ডিনান্স রাজে"র বিন্দুমাত্রও তুলনা চলে না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি পাঁচ মাস অপেক্ষা করল যদি বাংলা সরকার তার মতিগতি বদলায় এবং প্রভাবশালী মহল থেকে বস্তুতপক্ষে তাদের সেইমত পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। এই পাঁচ মাসের মধ্যে অর্ডিনান্সগুলির প্রতিবাদে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবার অনুমতি পাবার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে তিনবার আবেদন জানাতে হয়েছিল।

জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছয় এবং মাস শেষ হবার আগে তারা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবার সিদ্ধান্ত নেয়। "অর্ডিনান্স রাজে"র সবচেয়ে আপত্তিকর দিক হল বাংলা প্রদেশের সর্বত্র সাধারণ সভা, শোভাযাত্রা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা। তার ফলে জনজীবন সম্পর্কিত কার্যকলাপ কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। অর্ডিনান্সকে অমান্য করে প্রথম সাধারণ সভা আমি ৩১শে জানুয়ারি আহ্বান করি কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে। রাজনীতি-সচেতন বাংলা সেদিন উত্তেজনায় ফেটে পড়ছিল—সবাই ভেবেছিল পাইকারী হারে গ্রেপ্তার করা হবে এবং সরকার বলপ্রয়োগ করে আন্দোলন দমন করবে।

সেই রকম কিছুই ঘটল না। রহস্যজনক কারণে সরকার নতি

স্বীকার করল এবং সব কিছু শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হল। সেইদিন থেকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও তাদের সমর্থকরা বাংলা দেশের সর্বত্র অর্ডিনান্সকে অমান্য করেছে। তার ফলে সেপ্টেম্বরের আগে যে অবস্থা ছিল আপনিই তা ফিরে এল এবং যুদ্ধ বাধবার আগে এই পরাধীন দেশে যতটুকু নাগরিক স্বাধীনতার অস্তিত্ব ছিল জনগণ তা পুনরুদ্ধার করল। বি. পি. সি. সি.র সাফল্যের পরিমাণ ছিল অভাবিত ও অভূতপূর্ব। উল্লিখিত অর্ডিনান্স বলে গ্রেপ্তারের সংখ্যা তুলনায় ছিল খুবই কম। হয়ত এই কারণেই বি. পি. সি. সি. যে সাফল্য অর্জন করেছিল তা যথেষ্ট হলেও চমকপ্রদ হয়নি।

গত জানুয়ারি থেকে বি. পি. সি. সি. এইভাবে কাজ করে চলেছিল। কিন্তু গান্ধীবাদীরা ও নব্য গান্ধীবাদীরা অর্থাৎ আমাদের ন্যাশনাল ফ্রন্টওয়ালারা কী করছিল ? খবরে প্রকাশ হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায় গান্ধীবাদীদের একটা কনফারেন্স সরকারী কর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ করে এবং স্থানীয় গান্ধীবাদীরা সেই আদেশ অমান্য করার চিন্তাও করে না। নদীয়া জেলায় নব্য গান্ধীবাদীরা একটা সভার অনুষ্ঠান করতে চায়। কিন্তু সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যখন অনুমতি পাওয়া গেল না তখন তারা সে পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে প্রমাণ দিল বিপদে গা বাঁচিয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। মে দিবসে সরকারী অনুমতি নিয়ে প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস কলিকাতায় এক সমাবেশের ব্যবস্থা করে কিন্তু ঐ দিনই বি. পি. সি. সি. যে সভা ও সমাবেশের আয়োজন করে সরকারী কর্তৃপক্ষকে তা জানানোই হয়নি।

মে মাসে বাংলায় নতুন এক উদ্যমের প্রয়োজন ছিল। নাগরিক স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হয়। এড-হক কমিটি (কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সৃষ্ট), হিন্দুমহাসভা এবং বেইমান সংবাদপত্র "অমৃতবাজার পত্রিকা" ও "যুগান্তর"-এর মত প্রতিক্রিয়াশীলদের তরফ থেকে বি. পি. সি. সি.কে হেয় করার প্রয়াস নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। জনসাধারণ সাগ্রহে নতুন পথের দিশার জন্য প্রতীক্ষা করছিল।

এই পথনির্দেশ দেবার জন্য ২৫শে ও ২৬শে মে ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের বিশেষ অধিবেশন বসে। এই কনফারেন্স আহ্বান করার পরিকল্পনা বাস্তবিকই অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছিল। যোগদানকারী ডেলিগেটদের সংখ্যা ভালই হয়েছিল, তাঁরা ছিলেন প্রায় ৬০০ জন এবং তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে এসেছিলেন। ২৫শে মে ঢাকায় আমাকে ও নির্বাচিত প্রেসিডেণ্টকে বিপুলভাবে সংবর্ধিত করা হয়। আসল কনফারেন্সে দর্শকদের বিরাট সমাগম হয় এবং আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলিও, যেমন ছাত্র কনফারেন্স, শ্রমিক কনফারেন্স, কিষাণ কনফারেন্স, নারী সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়। ঢাকা থেকে সবাই আশা, বিশ্বাস ও অফুরন্ত প্রত্যাশা নিয়ে ফিরে আসে।

ঢাকা কনফারেন্সে যারা যোগদান করেছিল তাদের কী অনুপ্রাণিত করে? সেখান থেকে যে দৃঢ় ও স্পষ্ট পথনির্দেশ দেওয়া হয় তাই। ঢাকার আহ্বান ছিল সংগ্রামকে তীব্র করার ও সংগ্রামী ফ্রণ্টকে ব্যাপক করার আহ্বান। আবেদন পরাধীন জাতির কাছে ছিল না। গত কয়েক মাসে ভারতের চেহারার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। যে জনগণের কাছে যুদ্ধের ডাক গেছে তারা তাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা ফিরে পেয়েছে এবং স্বাধীন জাতির মত চিন্তা করতে, অনুভব করতে ও কাজ করতে শুরু করেছে।

কনফারেন্স তাই জনসাধারণকে বলে, নবজাগ্রত স্বাধীন ভারতের চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিহীন রাজনৈতিক দাসত্বের যা কিছু চিহ্ন বর্তমান সে সব তারা যেন ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কলিকাতার হলওয়েল মনুমেণ্টযা শহরের বুকের উপর দাঁড়িয়ে বাঙালীর দাসত্বকে প্রচার করছে, তাকে এবারে যেতে হবে। আমাদের পরাধীনতার আরও একটা নিদর্শনকে এবারে বিদায় নিতে হবে, যেমন, জেলে বা নিয়ন্ত্রণাধীনে রাজনৈতিক কর্মীদের বন্দীদশা। এবং এই কাজ মুক্ত ও মহান্ ভারতের বুকের থেকে বিগত দুই শতাব্দীর কলঙ্কলেখা মুছে ফেলবার ভূমিকামাত্র।

ঢাকা কনফারেন্স ভারতের জনসাধারণকে অত্যাবশ্যক আরেকটি সাবধানবাণী শুনিয়েছে। রাজা ও রাজ্যের রাতারাতি যখন বিলোপ

ঘটছে, ক্ষমতা তখন দৃষ্টির ও হাতের নাগালের মধ্যে। এই ক্ষমতাকে আয়ত্তে আনতে এবং আয়ত্তে এনে চিরদিনের জন্য বজায় রাখতে জাতীয় একতা ও জাতীয় সংহতি একান্ত প্রয়োজন ও অপরিহার্য। অতএব কংগ্রেসের মধ্যে একতা ফিরিয়ে আনবার জন্য এবং হিন্দু-মুসলিম সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য আবেদন প্রচার করা হয়। এক কথায়, প্রাদেশিক কনফারেন্সের নির্দেশ ছিল "সংগ্রাম এবং একতা"—বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং নিজেদের মধ্যে একতা—যদি স্বাধীনতা অর্জন করে তা রক্ষা করাই আমাদের কাম্য হয়।

এই সব মহৎ ও বিরাট প্রয়াস চালাতে হবে একটি সর্বাত্মক ধ্বনিকে সামনে রেখে "ভারতের জনগণকে সব ক্ষমতা দিতে হবে।" "সব নেব, নয়ত কিছুই না" এই হবে আমাদের নীতি এবং আপসের বা মাঝপথে দাঁড়াবার কোন অবকাশ নেই।

এ কি ন্যায়সঙ্গত ?

৮ই জুন, ১৯৪০ ফরওয়ার্ড ব্লকএ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

শয়তানও যদি তার প্রাপ্য পাবার অধিকারী হয়, ফরওয়ার্ড ব্লকই বা হবে না কেন ? আমরা এটা করিনি ওটা করতে পারিনি বলে আমাদের দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী বন্ধুরা ক্রমাগত আমাদের ক্রটি বার করে চলেছে। কিন্তু তাঁরা কি একবারও এটুকু ভেবে দেখেছেন কী প্রচণ্ড প্রতিকূলতার সঙ্গে আমাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হচ্ছে ? একবারও কি তাঁরা আমাদের সাহায্য করতে নেমে এসেছেন ? তা করা দূরের কথা, বরঞ্চ আমাদের কাজকর্ম যাতে পণ্ড হয় তারই জন্য তাঁরা উঠে-পড়ে লেগেছেন। তাঁদের যদি যথার্থ অন্তর্ঘাতী কাজের জন্য দায়ী করি তাহলে আমরা অন্যায়ও করব না, বাড়াবাড়িও করব না। জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার এবং তা তীব্র ও ব্যাপক করার দুরূহ কর্তব্যসাধনে গান্ধীবাদী বা র‍্যাডিকাল লীগ বা কংগ্রেস সোস্যালিস্ট বা ন্যাশনাল ফ্রন্টবাদী—কারও কাছ থেকে আমরা কোন সাহায্য, কোন সহানুভূতি পাইনি। অধ্যাপক রঙ্গ ও স্বামী সহজানন্দের কিষাণ-সভা এবং ফরওয়ার্ড ব্লককে সম্পূর্ণ নিজস্ব সহায়সম্বলের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। দক্ষিণের ও বামের উল্লিখিত দলগুলি অন্ততপক্ষে যদি নিরপেক্ষও থাকত, তাহলে তাই আমরা সৌভাগ্য বলে গণ্য করতাম। কিন্তু বিভিন্ন মহল থেকে আমরা যা পেয়েছি তা সুচিন্তিত শত্রুতা। সংগ্রাম শুরু করার আগে আমাদের নামে প্রায়ই অভিযোগ করা হয়েছে আমরা কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সমালোচনা করে থাকি এবং নিজেদের তরফ থেকে কিছুই করি না। যখন সংগ্রাম শুরু হল এই অভিযোগ পরিণত হল বিদ্রূপে, সংগ্রামকে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেওয়া হল এবং জনসাধারণকে বলা হল গান্ধীবাদীদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এ সংগ্রামের ফল কিছুই হবে না। কিন্তু

গান্ধীবাদীদের আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য বোঝাবার কোন প্রকার চেষ্টা করা হল না।

আশ্চর্যের কথা, যখনই আমাদের কর্মীদের গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করা হয়েছে আমাদের বলা হয়েছে, তা গণসংগ্রাম নয়। বড়জোর তাকে বলা যেতে পারে গান্ধীবাদী-মার্কা সংগ্রাম। যখন অধিক সংখ্যায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়নি, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যা হয়েছিল, আমাদের বলা হল সবকিছু শান্ত ছিল এবং কোন লড়াই হয়নি। এবং এই সব অদ্ভুত যুক্তির উপরে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ।

সম্পূর্ণ স্থির ও আবেগহীন দৃষ্টিতে আমরা কী করেছি তার একটা হিসাব নেওয়া যাক। প্রথমত হয়ত আমরা দাবি করতে পারি যে, এতদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস এবং ইংরেজ সরকারের যুদ্ধপ্রয়াসের সঙ্গে সহযোগিতা আমরাই ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছি। যে কেউ সহজেই কল্পনা করতে পারে, আমাদের নিয়মিত আপসবিরোধী আন্দোলন যদি না চলত তাহলে হাই কমাণ্ড এতদিনে দেশকে কোন রসাতলে নিয়ে যেত। দ্বিতীয়ত, হয়ত আমরা দাবি করতে পারি দেশের মধ্যে এবং বিশেষ করে কংগ্রেসের কর্মীদের মধ্যে সংগ্রামের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছি। গত আঠারো মাস ধরে জাতীয় সংগ্রাম শুরু করার পরিকল্পনাকে মহাত্মা গান্ধী নিয়মিতভাবে বিরুদ্ধতা করা সত্ত্বেও, এবং অত আগে, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, তিনি যুদ্ধপ্রয়াসে ইংরেজদের সহযোগিতা করার পক্ষে থাকা সত্ত্বেও আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস সংগঠনগুলিকে "সত্যাগ্রহ" কমিটিতে রূপান্তরিত হবার আদেশ দিচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রদেশের "নেতা"দের নির্দেশ দিচ্ছে তারা যেন সার্ট প্যান্ট পরে কুচকাওয়াজ শুরু করে। অদ্ভুত এই রূপান্তর কি সম্ভব হত, দেশে যদি ফরওয়ার্ড ব্লক না থাকত এবং ১৯৪০-এর মার্চ মাসে রামগড়ে যদি আপসবিরোধী সম্মেলন না হত ?

শেষ হলেও যা তুচ্ছ নয়, তা এই যে, হয়ত আমরাই দাবি করতে পারি, যেটুকু শক্তি ও সম্বল আমাদের আয়ত্তাধীনে আছে তাই নিয়ে

আমরাই যথার্থ জাতীয় সংগ্রাম শুরু করেছি। আজ ফরওয়ার্ড ব্লক-এর নিখিল ভারত ওয়ার্কিং কমিটির আটজন সদস্য কারারুদ্ধ। দেশের বিভিন্ন অংশের অসংখ্য বন্ধু ও সহকর্মী আজ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। বিহারে, যুক্তপ্রদেশে আন্দোলন পুরোদমে চলেছে। বাংলাদেশে নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে দেখা গেল বাংলা সরকার কার্যত নতি স্বীকার করেছে। আমাদের সংগ্রাম শুরু করার পর থেকে যুদ্ধকালীন অর্ডিনান্সের অনেকগুলিকে অকার্যকর করে দেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরের আগে দেশের যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থার বেশ কিছুটা ফিরিয়ে আনা গেছে। গত ২৫শে ও ২৬শে মে প্রাদেশিক কনফারেন্সের ঢাকা অধিবেশন থেকে অনুপ্রেরণাপূর্ণ নির্দেশ পাবার পর বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এখন সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

ভারতের মত বিরাট দেশে অহিংস গণ-সংগ্রাম গড়ে তুলতে সর্বদাই সময় লাগে এবং তাতে যে প্রয়াস দরকার হয় তা নেহাত কম নয়। কিন্তু এই কাজ হাজার গুণ কঠিন হয়ে ওঠে যখন কেবলমাত্র দক্ষিণপন্থীরা নয় তথাকথিত বামপন্থীরাও সুচিন্তিতভাবে শত্রুতা করে চলে। এর পরেও আছে অ-কংগ্রেসী ও কংগ্রেসবিরোধী সব সংগঠন, যাদের বিরোধিতার সম্মুখীন আমাদের হতে হচ্ছে এবং মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এবং সবার উপরে রয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জগদ্দল, এবং সেই সঙ্গে তার ইংরেজ ও ভারতীয় মিত্ররা। তার সঙ্গেও আমাদের লড়াই চলেছে। যে বাধা আমাদের অতিক্রম করতে হয়েছে এবং যে প্রচণ্ড প্রতিকূলতার সঙ্গে আমাদের যুঝতে হয়েছে, তা ভাবলে, আমরা যা করেছি তা মোটেই অকিঞ্চিৎকর নয়। শত্রুতা, বিদ্রূপ, পরিহাস সত্ত্বেও যত দিন যাবে আমাদের আন্দোলনের শক্তি ও আয়তন তত বৃদ্ধি পাবে। যারা আমাদের সাহায্য করবে না তারা অন্তত দয়া করে যেন চুপ করে থাকে। কার্যক্ষেত্রে আমাদের প্রয়াসের ফল যাই হোক না কেন, অথবা ব্যক্তি হিসেবে আমরা যতই অযোগ্য হই না কেন, আমাদের আদর্শ যে উন্নত এবং আমাদের প্রচেষ্টা যে

মহান তাতে কোনই সন্দেহ নেই। আমরা যদি জয়লাভ করি—আমাদের উদ্দেশ্য যদি সার্থক হয়—দেশই তাতে লাভবান হবে, ব্যক্তিগতভাবে আমরা হব না। অগ্রগামী সৈনিকরা! আমরা যদি আমাদের পদ্ধতিতে বা কর্মকৌশলে একমত না হই, নিজেদের মতপার্থক্য মেনে নিতে আমরা কেন একমত হতে পারব না? পরস্পরের উদ্দেশ্যের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা পোষণ করার এবং পরস্পরের শুভকামনা করার ঔদার্যটুকু কেন আমাদের থাকবে না?

অস্থায়ী জাতীয় সরকার

৮ই জুন ১৯৪০, কার্শিয়ং থেকে প্রদত্ত সম্পূর্ণ বিবৃতি।

মহামহিম বড়লাটের সাম্প্রতিক বিবৃতি, কমাণ্ডার-ইন-চিফ-এর উক্তি এবং প্রাদেশিক গভর্ণরদের চালচলন থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, অবশেষে ব্রিটেনের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার ভারতকে কাজে লাগানোর সত্যিকার একটা প্রয়াস করতে যাচ্ছে এবং এই প্রয়াস করা হবে ভারতের স্বাধীনতার দাবি পূরণ না করেই।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, ইংরেজ সরকার এই নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করার সাহস পেয়েছে মহাত্মা গান্ধীর সাম্প্রতিক উক্তিগুলি থেকে যাতে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পরিষ্কার বলেছেন যে গ্রেট ব্রিটেনকে বিপদের সময় ব্যতিব্যস্ত করা ঠিক হবে না। এই অভিমত কেবলমাত্র গান্ধীবাদী নেতারাই সমর্থন করেন না, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও করেন। অতএব যদি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নতুন কার্যপদ্ধতির জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিই পরোক্ষভাবে দায়ী তাহলে বিশেষ ভুল হবে না।

যতদূর আমি বুঝতে পারছি, এইদিকে ইংরেজ সরকার তাদের প্রয়াস সহজে আলগা করবে না। ফলে, হরিপুরা কংগ্রেসের যুদ্ধ প্রস্তাবকে যারা ধরে আছে তাদের কাছে একটা গুরুতর পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। ভবিষ্যতে যদি গ্রেট ব্রিটেনের সশস্ত্র বাহিনীর আরও বিপর্যয় ঘটে, তাহলে ভারতের জনমত যাই বলুক তা অগ্রাহ্য করে ইংরেজরা যে অনিবার্যভাবে উত্তরোত্তর ভারতকেই আঁকড়ে ধরবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু ভারত যতদিন পরাধীন থাকবে ততদিন ইওরোপীয় ব্যাপারে আমাদের কী আগ্রহ থাকতে পারে? আমরা আমাদের স্বাধীনতা চাই এবং তা চাই অবিলম্বে। সরকার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি, যে

প্রতিশ্রুতি কোন এক ভবিষ্যৎকালে পূরণ করা হবে, আমাদের জনগণের মনে কোনই রেখাপাত করবে না। আমরা ইংরেজকে বিচার করব এখনই এবং এই মুহূর্তে আমরা কি পাচ্ছি তার ভিত্তিতে। রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে কেবলমাত্র ভঙ্গ করার জন্য—এ রকম প্রচুর অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। বাকচাতুর্যে ভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকার যেন আবার আমাদের ধোঁকা দিতে না আসে।

সম্প্রতি কয়েক বৎসর ব্রিটিশ পররাষ্ট্র নীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে অদূরদর্শিতা। আর সব কারণের থেকে এই কারণেই গ্রেট ব্রিটেনের সর্বনাশ সাধিত হয়েছে। আশঙ্কা হচ্ছে একই অদূরদর্শিতা ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের ঘাড়ে ভর করে রয়েছে। তারা এখন ভারতের সাহায্যে ইংলণ্ডকে বাঁচানোর কথা চিন্তা করছে। কিন্তু পরাধীন ভারত কি করে ইংলণ্ডকে, তাই কেন, যে কোন দেশকে, বাঁচাতে পারে?

ভারতকে প্রথমে নিজেকে বাঁচাতে হবে। এবং নিজেকে তা বাঁচাতে পারে একমাত্র তখনই যখন হিন্দু ও মুসলিমরা অস্থায়ী সরকারের জন্য সম্মিলিত দাবি পেশ করবে এবং সেই অস্থায়ী সরকারের কাছে অবিলম্বে সব ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে। ইতিহাসের প্রতিটি বৈপ্লবিক সঙ্কটে এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ১৯৩৫-এর ভারত সরকার আইনের আনুষঙ্গিক কিছু পরিবর্তন সাধন করে বর্তমান গঠনতন্ত্রের আওতার মধ্যেই কেন্দ্রে এই অস্থায়ী জাতীয় সরকারকে গঠন করা যায়। কিন্তু অস্থায়ী জাতীয় সরকারের হাতে সম্পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা দিতে হবে। কিছুকাল পরে, বর্তমান সঙ্কট যখন পার হয়ে যাবে, ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে অস্থায়ী জাতীয় সরকার ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতার সঙ্গে তাল রেখে যাতে বিশদভাবে ভারতের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পারে সেইজন্য একটি কন্‌স্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্ব্লি আহ্বান করবে।

অস্থায়ী জাতীয় সরকারের প্রথম কর্তব্য হবে, ভারতের নিরাপত্তা

যাতে সর্বাবস্থায় সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে সেইজন্যে ভারতীয় জনগণকে সাধ্যমত পুরোপুরি অস্ত্রসজ্জিত করা এবং মিত্রভাবাপন্ন বৈদেশিক শক্তিদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। এই পন্থাগুলি যদি অবলম্বন করা হয়, তাহলে আমাদের আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে আতঙ্কিত হবার আর কোন কারণ থাকে না। ইওরোপে নাৎসীদের সামরিক সাফল্যলাভের ফলে ভারতের উপর কোন প্রতিকুল প্রভাব পড়তে পারে এরকম আশঙ্কাও আমাদের থাকবে না। ভারত যখন স্বাধীন হবে এবং নিজেকে রক্ষা করার মত যথেষ্ট শক্তি অর্জন করবে, তখন সে অন্যান্য মিত্র দেশগুলিকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে পারে।

অতএব ভারতীয়দের ঠিক এই মুহূর্তের কর্তব্য "ভারতের জনগণকে সব ক্ষমতা দিতে হবে" এই শ্লোগানের জন্য এক হয়ে দাঁড়ানো এবং সম্পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন এক অস্থায়ী সরকারের দাবি করা। এই দাবি দুর্নিবার হয়ে উঠবে যদি তা ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মিলিত দাবি হয়। এই প্রশ্নে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ কি একমত হতে পারবে? যদি পারে, তারা ভারতকে চিরতরে রক্ষা করবে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই দাবি যদি প্রত্যাখ্যাত হয়, তখন ভারতের জনগণকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বলা ছাড়া আমাদের আর গত্যন্তর থাকবে না।

সসম্মানে আমি ব্রিটিশ সরকারকে সাবধান করে দিতে চাই, ভারত যতদিন পরাধীন থাকবে, তারা যেন ভারতের সহায়সম্বল নিজেদের কাজে লাগাবার চেষ্টা না করে। মহাত্মা গান্ধীর বা কোন গান্ধীবাদী নেতার বা নেতাদের সান্ত্বনার বাণীতে তারা যেন নিজেদের বিপথচালিত না করে। এই নেতারা যখন আপস ও সহযোগিতার কথা বলে, তারা তখন ভারতীয় জনতার বা ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধিত্ব করে না। কোন কোন মহলে ইদানীং বলা হচ্ছে যে নাৎসীদের সাফল্যের দরুন বর্তমান যুদ্ধ আর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয়।

একথা নিতান্তই শিশুসুলভ এবং এদেশের কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে তা প্রভাবিত করতে পারবে না।

পরিশেষে ইংরেজ সরকারকে আমি ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি, যদি তারা পরাধীন ভারতের সহায়সম্বল নিয়ে তাই দিয়ে ব্রিটেনকে রক্ষা করার প্রয়াস করে তাহলে তার ফল কী দাঁড়াবে। এই পন্থায় ইংলণ্ড পরিত্রাণ পাবে না অথচ তা ভারতের পক্ষে আরও সর্বনাশা হতে পারে। স্বাধীন, শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ ভারত যে কোন প্রকার বিপদ থেকে অপরের সাহায্য বিনা শুধু নিজেকেই রক্ষা করবে না, তা ব্রিটেন সমেত মিত্রভাবাপন্ন অন্যান্য রাষ্ট্রেরও বিপদের সহায় হতে পারবে। আমাদের আন্তরিক এত আবেদন সত্ত্বেও যদি ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞরা বিবেচনাবোধবিরহিত হয়, তাহলে, মহাত্মা গান্ধী যাই বলুন বা করুন না কেন, ভারত সরকার যে নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করতে যাচ্ছে তাতে আমাদের সমর্থন নেই।

দেশবন্ধু দীর্ঘজীবী হোন

১৫ই জুন, ১৯৪০, ফরওয়ার্ড ব্লকএ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আমাদের এই ধরাধাম ত্যাগ করে যাবার পর দীর্ঘ পনেরো বছর অতিবাহিত হয়েছে। তিনি তাঁর স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হতে দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু তখনকার মত কিছু কিছু পরিকল্পনায় তিনি সাফল্যলাভ করেছিলেন। ঠিক যে সময় জনসাধারণ তাঁর কাছ থেকে আরও বড় কিছু আশা করছিল, তখনই মৃত্যুর নির্মম হাত তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। তিনি তাঁর দেশবাসীর অকৃপণ ভালবাসা লাভ করেছিলেন। তারা তাঁকে তাদের হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সেইজন্য তাঁর তিরোধানের শোক যেমন সর্বাত্মক তেমনিই আন্তরিক হয়েছিল। তাঁর অকাল মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত, তবু আমাদের একথা ভোলা উচিত হবে না যে, পরম গৌরবের মধ্যে তাঁর জীবনাবসান হয়েছে। সেইসব হতভাগ্যদের একজন তিনি ছিলেন না যারা জীবনের মহত্ত্বের কাল অতিক্রম করেও বেঁচে থাকে, যারা জীবনের ভাটার টানের পরেও টিকে থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াপন্থী হয়ে দাঁড়ায়।

আজ, তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীর প্রাক্কালে আমাদের মনে একটি চিন্তাই জাগছে—"হে দেশবন্ধু! ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ এই দুঃসময়ে তোমাকে ভারতের দরকার।" আদর্শবাদ ও বাস্তববাদের সেই দুর্লভ সমন্বয় যা নেতৃত্ব গঠনের মূল উপকরণ, এবং তাঁর অসামান্যতার যা গোপন রহস্য, তার প্রয়োজন এখন আমরা যত বোধ করছি, আগে কখনও তত বোধ করিনি। আমরা সেই উদার ভালবাসা চাই যা তাঁকে জনসাধারণের বন্ধু করেছিল এবং মুসলমান ও অনগ্রসর শ্রেণীর লোকদের তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এনেছিল।

আমরা চাই সেই কর্মোদ্যম যা তাঁকে বিশ্রাম নিতে দেয়নি এবং

সংগ্রামের পর সংগ্রামে তাঁকে ঠেলে নিয়ে গেছে। সর্বশেষে আমরা চাই স্বাধীনতার সেই সর্বগ্রাসী উন্মাদনা, আর সব প্রেরণার যা উৎস, আর সব কর্মের যা চালক।

তাঁর পবিত্র স্মৃতির প্রতি আমরা আমাদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার বাৎসরিক অর্ঘ নিবেদন করছি। যারা মহৎ হতে চায়, মহত্তের যেখানেই দর্শন হোক, তার অর্চনা করে তাদের জীবন শুরু করতে হবে। যারা বীর হতে চায় প্রথমে তাদের বীরপূজা করতে শিখতে হবে। সেইজন্য ১৬ই জুনের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে এবং সেই উপলক্ষ্যে জনসাধারণের সকল অংশের সমবেত হওয়া কর্তব্য।

আমি দেশবন্ধুর একজন অনুগত শিষ্য ছিলাম। স্বর্গতঃ সেই মহাত্মার কথা বলতে গেলে, নিজেকে সংযত রেখে কিছু বলা দুষ্কর। যে ঋণে আমি তাঁর কাছে ঋণী তা কখনই পরিশোধ করা যাবে না। প্রকৃতপক্ষে, দেশবন্ধুর শিক্ষা তার অস্তিত্বের সঙ্গে এক হয়ে গেছে।

প্যারিসের পর

১৫ই জুন, ১৯৪০, ফরওয়ার্ড ব্লকএ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

এই সেদিন নাৎসীবাহিনী যখন মুখে "নাখ্ পারিস্" ("প্যারিস চলো") আওয়াজ করতে করতে জার্মান সীমান্ত অতিক্রম করে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে অনুপ্রবেশ করল, তখন কে ভাবতে পেরেছিল তারা এত শীঘ্র তাদের লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে? আমাদের চোখের সামনে সামরিক রণকৌশলে এ যেন এক অলৌকিক ঘটনা। এর সঙ্গে তুলনা চলতে পারে নেপোলিয়নের যুদ্ধাভিযান কিংবা ১৮৭০-এর ফ্রাঙ্কো-রুশিয়ান যুদ্ধে সিডানে বিপর্যয়। ফরাসী হাই কমাণ্ড যাই বলুক না কেন, প্যারিসের পতনের পর যন্ত্রচালিত যানবাহন, অসংখ্য ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমানের সামনে উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ আর সম্ভব নয়। ট্রেন্‌চ্ থেকে যুদ্ধ করার দিন শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু এর পরে কী? একথা সুস্পষ্ট যে রেন'র সরকার গ্রেট ব্রিটেনকে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে জার্মানির সঙ্গে আলাদা-ভাবে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করবে না। কিন্তু কতদিন তিনি ফরাসী জনসাধারণের আস্থাভাজন হয়ে থাকতে পারবেন? তাঁর কেবিনেটের পতন, জার্মানি ও ইটালির কাছ থেকে লোভনীয় প্রস্তাব, ঐসকল শর্তে শান্তিচুক্তি করতে প্রস্তুত এমন একটি নতুন কেবিনেট—এই সব ঘটনা একেবারে অসম্ভব বলে অগ্রাহ্য করা যায় না। এই সেদিন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিস্টার উইনস্টন চার্চিল তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতায় এই বিষয়ে অশুভ ইঙ্গিত করেছেন।

এবং ইংলণ্ড? ফ্রান্স থাক বা যাক ইংলণ্ড কী করবে? এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে ব্যাখ্যাতীত সেই শক্তি—"জনসাধারণের মনোবল"। দুর্ভাগ্যবশত ব্রিটিশ জনগণের মনোবল বেশ মোক্ষম ধাক্কা খেয়েছে এবং তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের বক্তৃতা।

ব্রিটিশ জনগণকে তাদের একথা বলার দরকার হচ্ছে কেন, তারা শ্মশানযাত্রীর মত গম্ভীর মুখ করে যেন ঘুরে না বেড়ায় ? ছুনিয়াকে এ-কথা বলার দরকার হচ্ছে কেন যে, গ্রেট ব্রিটেন যদি নাৎসী-অধ্যুষিত হয়, তবু সাম্রাজ্য লড়াই চালিয়ে যাবে এবং যথাকালে সেদিন দেখা দেবে যখন নয়া ছুনিয়া সাবেকী ছুনিয়াকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসবে ? ইংরেজরা তাদের একরোখা নাছোড়বান্দা স্বভাব ও নিঃশঙ্ক মনোবলের জন্য বিখ্যাত। সম্ভবত তারা আজ তাদের ইতিহাসের কঠিনতম অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। দেখা যাক কীভাবে তারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

তরুণ জেনারেল ও সামরিক কুশলীদের উদ্ভাবিত নতুন এক সামরিক টেকনিকের সহায়তায় নাৎসীরা অঘটন ঘটাতে সমর্থ হয়েছে। মিত্রশক্তি বয়োবৃদ্ধ সেকালের যুদ্ধখ্যাত জেনারেলদের উপর নির্ভর করেছে। দেখা গেল জেনারেলরা পেরে উঠছেন না। নাৎসী জেনারেলরা তাদের নতুন টেকনিক কি নিঃশেষ করে ফেলেছে ? মিত্রপক্ষের কি সামরিক কোন গুপ্ত রহস্য আছে অথবা কোন নতুন টেকনিক কি জানা আছে ? এই ছুটি প্রশ্নের উত্তরের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করবে।

জার্মান সেনাবাহিনীর রাসায়নিক প্রস্তুতির কথা আমরা অনেক শুনে আসছি। সত্যই কি তারা রাসায়নিক যুদ্ধের নতুন কোন ত্রুটিহীন টেকনিক উদ্ভাবিত করেছে ? যদি তারা তা করে থাকে, তাহলে আগামী দিনে আমরা তার প্রমাণ পাব। এবং তখন দেখা যাবে নতুন অবস্থার মধ্যে মানুষের মনোবল কী করে টিকে থাকে। তা কি ভেঙে পড়বে, যেমন ইটালীয়ানদের বিমানের আক্রমণে সাহসী আবিসি-নিয়ানদের মনোবল ভেঙে পড়েছিল ? অথবা আত্মিক শক্তি জড়শক্তিকে পরাহত করবে ?

বাস্তব দিক থেকে বিচার করলে. গ্রেট ব্রিটেন-অধ্যুষিত হবার পর যুদ্ধ কী করে চলতে পারে, সত্যিই ভেবে ঠিক করা কঠিন। পাছে জাপান সুদূর প্রাচ্যে গোলমাল বাধায়, সেইজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে

মিত্রপক্ষকে সাহায্য করার একটা সীমা অতিক্রম করা সম্ভব নয়। এবং এমন কোন আশা নেই যে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ জার্মানি ও সোভিয়েত রাশিয়াকে বিভক্ত করতে সমর্থ হবে। অনেক বেশি সম্ভব বলে মনে হয়, একদিকে সোভিয়েত রাশিয়া এবং অপরদিকে জার্মানি ও ইটালির মধ্যে নিশ্চিত মতৈক্য রয়েছে। সেই মতৈক্যের শর্ত কী হতে পারে আমাকে যদি কল্পনা করতে বলা হয়, আমি তাহলে নিম্নলিখিত মত আন্দাজ করতে পারি :

(১) বলকান অঞ্চল বাদ দিয়ে ইওরোপীয় মহাদেশের উপর জার্মানির একাধিপত্য থাকবে।

(২) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইটালীর একাধিপত্য থাকবে।

(৩) বলকান ও মধ্যপ্রাচ্য হবে রুশ প্রভাবিত অঞ্চল।

(৪) আফ্রিকার সম্পদ ও সম্বল বৃহৎ শক্তিরা সকলে ভাগ করে নেবে।

যেহেতু জার্মানি ও ইটালী উভয়েই—এবং সম্ভবত সোভিয়েত রাশিয়াও—আপাতত গ্রেট ব্রিটেনকে পয়লা নম্বরের সাধারণ শত্রু বলে গণ্য করে, সেইজন্য খুবই সম্ভব, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভাগ করে নেবারও তাদের এক পরিকল্পনা আছে। তারা জানে ডাচ ইণ্ডিজ থেকে অস্ট্রেলিয়া অবধি সমগ্র দ্বীপবহুল সমুদ্রখণ্ডের উপর জাপানের লুব্ধ দৃষ্টি সর্বদা রয়েছে, সেইজন্য এই কার্যোদ্ধারে তারা জাপানেরও সাহায্য ও সহযোগিতা চাইতে পারে।

এইসব পরিকল্পনার মধ্যে ভারতের স্থান কোথায় থাকছে এবং কীভাবে থাকছে? যাঁরা ভারতের জনগণের নেতা বলে নিজেদের দাবি করেন তাঁরা এর জবাব দিন।

নাগপুরে স্বাগত

১৫ই জুন, ১৯৪০, ফরওয়ার্ড ব্লকএ স্বাক্ষরিত সম্পাদকীয়।

মুসলিম লীগের এবং কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ের পরে কিংবা সেই সময়েই নাগপুরে ১৮ই জুন ফরওয়ার্ড ব্লক-এর নিখিল ভারত কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। নিখিল ভারত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হওয়া এখন সময়োচিত, একথা ছাড়াও বর্তমান যে সঙ্কট ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘনীভূত ও আরও খারাপ হয়ে উঠছে সেই-জন্যও অবিলম্বে অধিবেশন অত্যন্ত প্রয়োজন।

এই কনফারেন্সের কর্তব্য কী হবে? গত বারো মাসের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করে নিঃসন্দেহে আমাদের অনেক হিসাবনিকাশ করতে হবে, নিজেদের কার্যকলাপ বিচার-বিবেচনা করতে হবে, অতঃপর আমাদের বর্তমান নীতি ও কার্যক্রম অনুমোদন করতে হবে কিংবা যদি প্রয়োজন হয় তা সংশোধনও করতে হতে পারে। কিন্তু তার থেকেও বেশি জরুরী, ইংরেজ সরকার বনাম আমাদের নীতি ও কার্যক্রম কী হওয়া দরকার তা স্থির করা। মার্চ মাসে রামগড়ে যে সংগ্রামের সূত্রপাত হয়েছে তা আরও তীব্র ও আরও ব্যাপকক্ষেত্রে প্রসারিত করতে হবে। একই সঙ্গে আমাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য আমাদের কাজ করে যেতে হবে। ওই দুটি বিষয় থেকে স্বভাবত অনেক প্রশ্ন দেখা দেবে। সেই সব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে হবে।

এই প্রসঙ্গে ভারতসচিব মিস্টার এমেরি দি হিন্দুস্থান টাইম্স্-এর লণ্ডন সংবাদদাতার কাছে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা শিক্ষাপ্রদ। তা থেকে আবার সুস্পষ্ট হচ্ছে যে সাম্রাজ্যবাদীরা কখনও ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করবে না। জার্মানরা যখন প্যারিসের দ্বারপ্রান্তে তখন এই বিবৃতিটা প্রচার করা হয়।

স্বদেশে বিপদের সম্মুখীন হয়ে ইংরেজ সরকার এখন ভারত ও তার সহায়সম্পদের উপর নির্ভর করতে উদ্‌গ্রীব। যেন পরাধীন ভারত, দরিদ্র শোষিত ভারত বর্তমান সঙ্কটে সাম্রাজ্যবাদী ইংলণ্ডকে রক্ষা করতে সমর্থ! যেখানে নেতারা মানসিক ও নৈতিক অবসাদে আচ্ছন্ন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে কোনপ্রকার উত্ত্যক্ত না করতে কৃতসংকল্প, সেক্ষেত্রে ভারতের ভবিষ্যৎ সত্যিই অন্ধকারাচ্ছন্ন।

কিন্তু আমরা কি হতাশায় হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকব? কারান্তরালে আমাদের বন্ধুরা জানলার গরাদের ভিতর দিয়ে বাইরের জগতের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তাদের আমরা কী বলব?

বাংলায় এবং বাংলার বাইরে ফরওয়ার্ড ব্লক-এর উপর সাম্রাজ্যবাদী হামলা উত্তরোত্তর নির্মম হয়ে উঠছে। একই সঙ্গে স্বাধীন ভারতকে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে শোষণ করবার জন্য সারা দেশে যুদ্ধকমিটি গঠন করা হয়েছে। আমরা যখন ইতিহাসের এইরকম অভূতপূর্ব সঙ্কটের সম্মুখীন তখন আমরা সম্পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে আমাদের সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের জানিয়ে দিচ্ছি: "আমরা তোমাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছি। তোমরা যা খুশি করতে পার কিন্তু স্বাধীনতার পথে আমাদের অগ্রগতিকে প্রতিহত করতে পারবে না।"

নাগপুর অভিভাষণ

১৮ই জুন, ১৯৪০, নাগপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রদত্ত প্রেসিডেন্টের অভিভাষণ।

কমরেডগণ,

১৯৩৯ সালের মে মাসের প্রথম দিকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির গুরুত্বপূর্ণ এক অধিবেশনের পরে কলিকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ফরওয়ার্ড ব্লক-এর পত্তন হয়। ১৯৩৯ সালের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে বোম্বাইয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক-এর নিখিল ভারত কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানেই ব্লক-এর গঠনতন্ত্র ও কার্যক্রম গৃহীত হয়। তারপর এক বছর পার হয়ে গেছে— এই বছরটি শুধু ভারতের ইতিহাসে নয়, সারা পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমাদের এই সমাবেশ সেইজন্য অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছে এবং ঠিক যে সময়ে হওয়া উচিত তার একদিনও আগে হয়নি। আমাদের অনেক হিসাবনিকাশ করতে হবে, আমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনেক বিচার-বিবেচনা করতে হবে। যে সঙ্কট আজ ভারত ও দুনিয়াকে অভিভূত করেছে, যা শুধু দিনে দিনে নয়, ঘণ্টায় ঘণ্টায় তীব্র হয়ে উঠছে ও বিকটাকার ধারণ করছে, সেই সঙ্কটে আমাদের কর্মপন্থা কী হবে অতঃপর আমাদের তা নিরূপণ করতে হবে।

আপনাদের সামনে আমি প্রথম যে প্রশ্নটি তুলে ধরতে চাই তা এই: "আমাদের নীতি ও কর্মপন্থা কি সঠিক হয়েছে? এবং ফরওয়ার্ড ব্লক পত্তন করে আমরা কি দেশের সর্বাধিক স্বার্থকে রক্ষা করতে পেরেছি?" এই প্রশ্নে আমার জবাব: "নিশ্চয় ঠিক এবং আমরা তা পেরেছি।" আপনাদের আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, চারটি বিষয় বিবেচনা করে আমরা ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করতে বাধ্য হই। দক্ষিণ-

পন্থীরা সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের জানিয়ে দেয় যে ভবিষ্যতে তারা বামপন্থীদের সহযোগিতায় কাজ করবে না এবং আমরা যে মিশ্র কেবিনেটের দাবি করেছিলাম তা তারা প্রত্যাখ্যান করে। দ্বিতীয়ত, মহাত্মা গান্ধী এবং দক্ষিণপন্থীরা আমাদের জানিয়ে দেন যে, নিকট ভবিষ্যতে জাতীয় সংগ্রামের কথা উঠতেই পারে না। তৃতীয়ত, কংগ্রেসের মধ্যেকার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও প্রগতিবাদীদের বামপন্থী ব্লক-এর নামে সংহত করার প্রয়াস সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্টরা বর্জন করে। অতএব বামপন্থী-সংহতির জন্য পরবর্তী প্রয়াস কেবল-মাত্র আমাদের দ্বারাই সম্ভবপর ছিল এবং সেইজন্য ফরওয়ার্ড ব্লক-এর প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। চতুর্থত গান্ধীবাদীরা বা দক্ষিণপন্থীরা আগে থেকেই নিজেদের গান্ধী সেবাসঙ্ঘের আওতায় সংহত করেছিল এবং আমাদের তরফে আরও দেরি করলে ফল হত এই যে, কংগ্রেসের ভিতরে যারা বামপন্থী ছিল দক্ষিণপন্থীরা তাদের কণ্ঠরোধ করত।

১৯৩৯ সালে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, ১৯২০ ও ১৯২১ সালে বামপন্থী হয়ে যারা কংগ্রেসে প্রবেশ করেছিল এবং প্রায় দুই দশক ধরে কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিজেদের করায়ত্ত রেখেছিল, তারা বিপ্লবী থাকা দূরের কথা এমন কি প্রগতিবাদীও আর নেই। এইরকম অবস্থায় রাজনৈতিক প্রগতির পথে আরও অগ্রসর হতে হলে আগে দরকার দেশের মধ্যে এবং বিশেষ করে কংগ্রেসের মধ্যে যত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, মৌলিক সংস্কারবাদী ও প্রগতিশীল শক্তি আছে সবার সংহতি।

১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসের শেষাশেষি আমি যখন কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের পদ ত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করার কথা গভীরভাবে চিন্তা করছি তখন কংগ্রেসের অত্যন্ত নামজাদা এক বামপন্থী নেতার সঙ্গে আমার গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য এক আলোচনা হয়। সেই নেতা অবশ্য পরবর্তীকালে গান্ধীবাদীদের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি আমাকে উভয় পন্থা থেকে বিরত হতে উপদেশ দেন এবং তিনি সেইসঙ্গে এও জানান, যেহেতু আন্তর্জাতিক ঝড়ের সঙ্কেত দেখা

দিচ্ছে আমাদের এমন কিছুই করা উচিত হবে না যাতে কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন দেখা দেয়। আমি জবাবে বলি, যেহেতু নিকট ভবিষ্যতে যুদ্ধ অনিবার্য, এইজন্যই তো আরও বেশী বামপন্থীদের আগে থেকে প্রস্তুত ও সংগঠিত থাকা উচিত যাতে যুদ্ধপরিস্থিতিতে দক্ষিণপন্থীরা যদি এগিয়ে যেতে নারাজ হয়, আমরা নিজেরাই অন্তত কিছু একটা করতে পারি। দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থীদের মধ্যে মতপার্থক্য এত মৌলিক হয়ে উঠল যে একটা ভাঙন, তা স্থায়ীই হোক, সাময়িক হোক, অপরিহার্য হল। অবস্থা যখন এইরকম, বাইরের অথবা আন্তর্জাতিক সঙ্কট আমাদের আচ্ছন্ন করার আগে আভ্যন্তরিক সঙ্কটের সম্মুখীন হওয়া এবং তাকে অতিক্রম করা বাঞ্ছনীয় ছিল। আমি একথাও বলেছিলাম যে, যদি আমি আমার বন্ধুর উপদেশ মেনে নিয়ে আপাতত চুপ করে থাকি, তাহলে আন্তর্জাতিক সঙ্কট যখন দেখা দেবে তখন অবস্থার পরিণতি আরও ঘোরতর হবে। সেই সঙ্কটে আমরা দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে কখনোই একমত হতে পারব না। কিন্তু তখন যদি আমরা নিজেদের মতে চলতে চেষ্টা করি অনেকেই আমাদের দোষ দেবে যে আমরা ভাঙন ধরাচ্ছি। তাছাড়াও, স্বাধীনভাবে আমরা যদি চলতেও চাই, আমাদের পিছনে তখন নির্ভর করার মত কোন সংগঠনও থাকবে না। অতএব, আমার বন্ধুর যুক্তিতে আমার বক্তব্যই জোরদার হয়েছিল।

বিগত বারো মাসের দিকে তাকিয়ে আমরা কি দাবি করতে পারি না যে, আমাদের নীতি ও কর্মপন্থা যে সঠিক ঘটনাবলী থেকেই তা প্রমাণিত হয়েছে? স্বামী সহজানন্দ ও অধ্যাপক রঙ্গের কিষাণ সভা, কমরেড যাজ্ঞিক ইত্যাদি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক ছাড়া আজ দক্ষিণ-পন্থীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত আর কে আছে? ১৯৩৯-এর জুন মাসে ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের পর যে বামপন্থী সংহতি কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা এখন ভেঙে গেছে। রায়পন্থীরা (অথবা র‍্যাডিকাল লীগ দলীয়রা), কংগ্রেস সোশ্যালিস্টরা এবং কমিউনিস্টরা (অথবা ন্যাশনাল ফ্রন্টপন্থীরা) একে একে বামপন্থী-সংহতি কমিটি ত্যাগ করেছে এবং

এদেশের বামপন্থী আন্দোলনের সূচীমুখ হিসেবে কাজ করে চলেছে কেবলমাত্র কিষাণ সভা এবং ফরওয়ার্ড ব্লক। ১৯৪০-এর মার্চ মাসে রামগড়ে আমরা যখন নিখিল ভারত আপসবিরোধী সম্মেলনের অনুষ্ঠান করি, তখনই একথা সুস্পষ্ট হয়। সেখানে আমরা দেখতে পাই রায়পন্থীরা, কংগ্রেস সোশ্যালিস্টরা এবং ন্যাশনাল ফ্রন্টপন্থীরা সম্মেলন বয়কট করে এবং গান্ধীবাদীদের সঙ্গে হাত মেলায়।

আজ সন্দেহের সামান্যই অবকাশ আছে যে, যদি কিষাণ সভার, ফরওয়ার্ড ব্লক-এর অস্তিত্ব না থাকত, তাহলে গান্ধীবাদীরা গত বারো মাস ধরে যে নীতি ও কর্মপন্থা অনুসরণ করে চলেছে তার প্রতিবাদ করার মত একটি কণ্ঠস্বরও শোনা যেত না।

আমাদের আরও একটি প্রশ্ন বিবেচনা করতে হবে: "গত এক বছরে আমরা বাস্তবিক কী কাজ করতে পেরেছি।"

প্রথমত, আমরা দাবি করতে পারি, কংগ্রেস দলের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিকতা ও আপসের যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল আমরা তা সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করেছি। আমাদের উদ্যোগ ছিল বলেই ইংরেজ সরকারের নীতির প্রতিবাদে কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। যদি তারা বাধ্য না হত, তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দালাল হয়ে তাদের ভারত সরকারের যুদ্ধনীতিকে কার্যকর করে যেতে হত। আজ অবধি সর্বপ্রকার প্রয়াস সত্ত্বেও ইংরেজ সরকারের সঙ্গে এখনও পর্যন্ত কোন আপসে আসা যে সম্ভব হয়নি এই জন্য আমরা বিধিসঙ্গতভাবে কিছু কৃতিত্ব দাবি করতে পারি।

দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ চালাবার ব্যাপারে কংগ্রেসের সহযোগিতালাভের সর্বপ্রকার প্রয়াস এযাবৎ আমরা ব্যর্থ করেছি। বন্ধুদের স্মরণে আছে, ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর মাসে মহামান্য বড়লাট যখন যুদ্ধপরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে সিমলায় আমন্ত্রণ করেন, তখন মহাত্মাজী জানান যে তাঁর অভিমত এই যে, বর্তমান যুদ্ধ চলাকালে গ্রেট ব্রিটেনকে ভারতের বিনাশর্তে সাহায্য করা উচিত। উল্লিখিত সাক্ষাৎকারের পরেই সংবাদপত্রের এক বিবৃতিতে মহাত্মাজী

ওই কথারই পুনরুক্তি করেন। এতৎসত্ত্বেও, যে-কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে, তা এখনও পর্যন্ত এইরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে তাঁর অভিমত অগ্রাহ্য করেছে। কিষাণ সভা ও ফরওয়ার্ড ব্লক না থাকলে তা কি ঘটত ?

তৃতীয়ত, সম্ভবত আমরা দাবি করতে পারি যে আমরা সংগ্রামের একটা পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছি। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি কংগ্রেস নেতারা সার্ট প্যাণ্ট পরে কুচকাওয়াজ করছে এবং কংগ্রেস কমিটিগুলিকে 'সত্যাগ্রহ কমিটি'তে রূপান্তরিত করা হয়েছে। তাছাড়া দক্ষিণপন্থী নেতাদের মুখে সর্বদা সংগ্রামের বুলি শোনা যাচ্ছে। এই সব কি সম্ভব হত যদি ফরওয়ার্ড ব্লক না থাকত এবং রামগড়ে আপসবিরোধী সম্মেলন যদি না বুঝিয়ে দিত জনমতের হাওয়া কোন্ দিকে বইছে ? আজ সংগ্রামের কথায় আকাশ-বাতাস যে ভরে উঠেছে এতে কোন সন্দেহ নেই। এবং আমাদের দেশবাসী যতই এই বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবে ততই তারা আপসের পথ থেকে দূরে সরে যাবে।

পরিশেষে আমরা দাবি করতে পারি যে, আমাদের যতটুকু শক্তি ও সহায়সম্বল ছিল সব নিয়ে রামগড়ে আমরা আমাদের সংগ্রাম শুরু করি। গত তিন মাসে আমাদের সহকর্মীদের অনেকে, তাঁদের মধ্যে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও আছেন, গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ হয়েছেন। ফরওয়ার্ড ব্লক-এর নিখিল ভারত ওয়ার্কিং কমিটির নজন সদস্য বর্তমানে কারাবাসে কিংবা অন্তরীণ অবস্থায়। তাঁরা ছাড়াও, স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী, অধ্যাপক রঙ্গের মত কিষাণ সভার আরও অনেক নেতা এখন কারান্তরালে।

রামগড়ে আমরা যে জাতীয় সংগ্রাম শুরু করেছি তা ক্রমশ শক্তিশালী হচ্ছে ও প্রসারলাভ করছে। বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে তা বেশ প্রবল হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে এই সংগ্রামের সূত্রপাত হয় ১৯৪০-এর জানুয়ারি মাসে নাগরিক স্বাধীনতার প্রশ্নে। ১৯৩৯-এর সপ্টেম্বর মাসে সরকার কতকগুলি কঠোর অর্ডিনান্স জারী করে

নাগরিক স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে। বাংলা কংগ্রেস যে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে তার দাক্ষিণ্যে ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরের আগে যে 'স্থিতাবস্থা' ছিল তার অনেকটা ফিরিয়ে আনতে আমরা সমর্থ হই। ১৯৪০-এর ২৫শে ও ২৬শে মে ঢাকায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক কনফারেন্সের যে বিশেষ অধিবেশন হয় সেখানে প্রদেশের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয় এবং সংগ্রাম তীব্রতর করারও ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রসারিত করার একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এই পরিকল্পনাকে কার্যে রূপায়িত করবে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আমাদের বিরুদ্ধে নিয়ত যে সমালোচনা হয়ে থাকে তার দু-একটি উল্লেখ করব। যেমন, আমাদের বলা হয় আমরা কংগ্রেসে ভাঙন ধরিয়েছি। আসলে কিন্তু বামপন্থীদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে গান্ধী-বাদীরাই ভাঙন এনেছে। আমরা বরাবরই মিলিতভাবে কাজ করার সপক্ষে এবং যাতে মিলিতভাবে কাজ সুনিশ্চিত হয় সেইজন্য মিশ্র কেবিনেট গঠনের পক্ষে দৃঢ় অভিমত জানিয়ে এসেছি।

আমাদের আরও বলা হয়ে থাকে, আমরা বামপন্থীদের দলে বিভেদ এনেছি। কিন্তু বিভেদ বা অনৈক্য আমরা আনিনি। রায়-পন্থীরা, কংগ্রেস সোশ্যালিস্টরা এবং ন্যাশনাল ফ্রণ্টবাদীরাই (অথবা কমিউনিস্টরা) একে একে বামপন্থী সংহতি কমিটি ত্যাগ করেছে। বারো মাস আগে আমরা যেখানে ছিলাম আজ ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি। এই কয়েক মাসের মধ্যে দিয়ে আমাদের এক অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। নির্যাতন, নিগ্রহ, বিদ্রূপ—এই শুধু আমাদের ভাগ্যে জুটেছে। কিন্তু অত্যন্ত অবিচলিতভাবে আপসহীন সংগ্রামের পথে আমরা এগিয়ে চলেছি। আমাদের অসংখ্য সহকর্মী কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের হাতে নিগৃহীত হয়েছে এবং বঙ্গপ্রদেশে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে স্বীকৃতি না দেবার ফলে, যে সব কংগ্রেস কর্মী আমাদের মত চিন্তা করে তাদের কার্যত কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে।

এই পর্যায়ে যে প্রশ্ন স্বভাবত দেখা দেবে তা এই : "বামপন্থীরা ও অন্যান্যরা আমাদের ত্যাগ করল কেন ?". যতখানি আমি বুঝেছি, কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হবার ভয়ে তারা ভীত এবং হয়ত তারা মনে করে, একবার কংগ্রেসের বাইরে এলে, তারা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আমার কাছে যা কৌতুকপ্রদ মনে হয় তা এই যে, এই কমরেডরা আশা করেছিল দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে তারা লড়াই করবে, অথচ এটুকু তাদের মাথায় আসেনি যে, বামপন্থীদের হাতে পরাজিত হবার আগে দক্ষিণপন্থীরা যা কিছু খারাপ করতে পারে তা করবে এবং কংগ্রেসে তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে সাধ্যমত চেষ্টা করবে। দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করতে হলে যে মেরুদণ্ড, যে দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা থাকা দরকার এইসব বামপন্থী (অথবা এদের কি ভুয়ো-বামপন্থী বলব) কমরেডদের তা নেই। আমরা আমাদের সংগ্রামের এমন একটা পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি যখন ইতিহাস আমাদের সবাইকে পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যাচাই করে নেবে এবং ভারতে যথার্থ বামপন্থী কারা দুনিয়ার কাছে তা জানিয়ে দেবে।

আমাদের আরও বলা হয়েছে যে গান্ধীবাদীদের সাহায্য বিনা আমরা যে সংগ্রাম শুরু করেছি তা ব্যর্থ প্রমাণিত হবে। এই অভিযোগ সম্পর্কে আমাদের জবাব এই। আমাদের সংগ্রাম সাফল্য-মণ্ডিত হবে কি হবে না সে সম্পর্কে এত আগে কিছু বলা চলে না। জনগণের তাতে যোগ দেওয়া না দেওয়ার উপর তা নির্ভর করছে। অহিংস সংগ্রামের পতাকাতলে জনতাকে জমায়েত করা সর্বদাই কিছুটা সময়সাপেক্ষ। অতএব আমাদের পক্ষে কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা ভালো।

কিন্তু, তর্কের খাতিরে যদি ধরেই নেওয়া হয় যে সংগ্রাম ব্যর্থ হবে, তার অর্থ কি এই যে, তা শুরু করা উচিত হয়নি ? অন্য দিক থেকে আমরা কি এই যুক্তি দিতে পারি না যে, ১৯২১, ১৯৩০ ও ১৯৩২-এর আন্দোলন শুরু করা উচিত হয়নি যেহেতু তার দ্বারা আমাদের স্বরাজ লাভ হয়নি ? ব্যর্থতা প্রায়শই সাফল্যের প্রস্তুতি।

সেইজন্য চতুর্থবারেও আমরা যদি ব্যর্থ হই, তাতেই বা কী এসে যায়! চেষ্টা করে সার্থক না হওয়ার থেকে একেবারে চেষ্টা না করা অনেক বেশী অসম্মানজনক। সারা দুনিয়া আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। দুনিয়ার স্বাধীন জাতিগুলি আমাদের সম্পর্কে কী ভাববে আমরা যদি আমাদের সামনে যে সুবর্ণ সুযোগ দেখা দিয়েছে—যে সুযোগ যে কোন জাতির জীবৎকালে দুর্লভ—তা হেলায় হারাই? কিন্তু আমরা যদি লড়াই করে ব্যর্থ হই, কেউ আমাদের সম্বন্ধে খারাপ কিছু ভাববে না।

আরেকটা দিক আছে যা আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না। আজ আমরা যদি দৃঢ়তার সঙ্গে দায়িত্ব পালন না করি, আজ থেকে বিশ বা পঞ্চাশ বছর পরে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের আমাদের সম্পর্কে কী ধারণা হবে আমরা কি তা ভেবে দেখব না? ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ সালের মধ্যে যে নেতারা দেশকে বিপথে চালিত করেছিল তাদের সম্পর্কে আজকের জনসাধারণ কী ভাবে? সেইজন্য একথা আমি জোরের সঙ্গে বলতে চাই, আমরা যদি দেশের ডাকে সাড়া দিতে না পারি এবং অবিলম্বে সংগ্রামে যোগ না দিই, তাহলে ইতিহাস বা ভবিষ্যৎ দেশবাসী কেউই আমাদের ক্ষমা করবে না।

বারো মাস আগে ফরওয়ার্ড ব্লক যখন গঠিত হয় তখন আমরা আসন্ন সংগ্রামের ভাবনায় এবং তার জন্য কী করে আগে থেকে তৈরী হওয়া যায় সেই চিন্তায় প্রায় অভিভূত হয়েছিলাম। সে সময়ে আমরা জানতাম না আমাদের পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করার প্রয়াসে বাইরের ঘটনাবলী এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাসন্নিবেশ যদি একান্তই আমাদের সাহায্য করে তা কতখানি করবে। সুতরাং আমাদের জীবনে ও কর্মে 'আত্মনির্ভরতা'কে আমরা আমাদের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। আজ পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। বৈরী সাম্রাজ্যবাদগুলির মধ্যে যে যুদ্ধ চলেছে তাতে যারা পুরনো তারা সত্যিই নাকালের একশেষ হচ্ছে। প্রথম কয়েক সপ্তাহে জার্মানরা বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ চালিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে কত রাজা ও

রাজত্বের পতন ঘটেছে এবং জার্মান সেনাবাহিনী প্যারিসের দ্বারদেশে উপনীত হয়ে সব শহরের সেরা এই শহরকে এমনভাবে দখল করে নিল যা সাধারণ লোকের কাছে সামরিক যুদ্ধপরিচালনায় অঘটন বলে মনে হয়েছে। দূরবিনের চোখে দেখা বিচিত্র দৃশ্যপটের মত ইওরোপে যা ঘটে যাচ্ছে তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া ভারতের উপরেও পড়েছে। ইওরোপে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদী পরাক্রমের উপর প্রতিটি আঘাত আমার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে এবং অধীনস্থ রাজ্যগুলিতে ব্রিটেনের দৃঢ়মুষ্টি শিথিল হতে বাধ্য। আমরা ভারতে কী করছি সেদিকে একেবারে দৃকপাত না করে ইতিহাসের চাকা ঘুরেই চলেছে। অতএব একটা শিশুরও বোঝা উচিত, আজকের পরিবর্তিত অবস্থায় পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করতে হলে বারো মাস আগে আমাদের যে প্রচেষ্টা ও স্বার্থত্যাগ করা দরকার ছিল এখন তার থেকে অনেক কম প্রয়োজন হবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী আমাদের সামনে যে সুযোগ এনে দিয়েছে তা পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করতে হলে আমাদের নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট একতা ও সংহতি থাকা একান্ত দরকার। সারা ভারত যদি আজ সমস্বরে নিজের কথা বলতে পারত তাহলে আমাদের দাবি প্রায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠত। এর থেকে দাঁড়াচ্ছে, আমাদের যেমন জাতীয় সংগ্রামকে তীব্রতর করার ও ব্যাপকতর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার কথা ভাবতে হবে, একই সঙ্গে আমাদের জাতীয় একতা ও সংহতিকে যতদূর সম্ভব বিকশিত করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। কিন্তু যে কোন অবস্থাতেই সংগ্রাম অবশ্যক। বিনা সংগ্রামে আমাদের শাসকরা সহজে নোয়াবে না। আমরা অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে সাম্রাজ্যবাদীরা ইতিহাস থেকে কখনই শিক্ষা লাভ করে না। তাছাড়া জাতীয় সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে বামপন্থীরা যে চাপ দিয়ে চলেছে তা যদি প্রত্যাহৃত হয় আমাদের নিজেদের নেতারাই হয়ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপসরফা করতে প্রলুব্ধ হবে। অতএব সংগ্রামকে তীব্রতর ও প্রসারিত করতে এবং একই সঙ্গে জাতীয় একতা ও সংহতির বিকাশ ঘটাতে কী কী ব্যবস্থা আপনাদের এখনই অবলম্বন করা উচিত আপনাদের তা বিবেচনা করতে হবে।

জাতীয় একতার আগে দরকার সংগ্রামের সক্রিয় কার্যক্রমের ভিত্তিতে কংগ্রেসের ভিতরে একতা এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মত অন্যান্য সংগঠনের মধ্যেও একতা।

সময় থাকতে আমরা যদি আমাদের মধ্যে যথেষ্ট একতা ও সংহতির বিকাশ ঘটাতে পারি, আমরা তাহলে ভালোমত আশা করতে পারি, দেশের মধ্যে সংগ্রাম চললেও এবং ইওরোপ যদি দারুণ দুর্যোগের কবলিত হয় তাহলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে ভারতের জনগণের কাছে ক্ষমতার হস্তান্তর শান্তিপূর্ণ উপায়েই হবে। ভারতের বিপ্লবকে রক্তাক্ত বিপ্লব হতেই হবে অথবা সেই বিপ্লবকে কিছুকাল বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে, এমন কোন কথা নেই। বরঞ্চ যতটা সম্ভব তা শান্তিপূর্ণ হওয়াই বাঞ্ছনীয় এবং শান্তিপূর্ণ রূপান্তর কেবলমাত্র তখনই সুনিশ্চিত হতে পারে যখন জনগণ একতাবদ্ধ এবং তাদের স্বাধীনতা লাভ করতে তারা দৃঢ়সংকল্প হবে।

আপনাদের কাছে আমার নিজের প্রস্তাব এই যে, আমাদের এখনই দেশময় একটি আওয়াজ তুলে সকলকে এক লক্ষ্যে টেনে আনতে হবে। সে আওয়াজ—"ভারতের জনগণকে সব শক্তি দিতে হবে।" এই আওয়াজ জনতাকে মুহূর্তের মধ্যে নতুন চেতনায় সঞ্জীবিত করবে। এই দাবিকে কার্যকরভাবে ও দুর্নিবারভাবে উপস্থাপিত করার জন্য জাতীয় ঐক্যলাভের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা আমাদের করতে হবে। এই প্রয়াসের জন্য এমন একটি সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়োজন হবে যা সকল অবস্থায় জনগণের মধ্যে সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবে। সর্বদলীয় ভিত্তিতে সংগঠিত নাগরিক প্রতিরক্ষা সংস্থা এই রকম সংগঠনের প্রয়োজন পূরণ করবে। কিন্তু এই রকম সংস্থা সরকারী নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে এবং পরাধীন ভারত রক্ষার কাজে ব্যাপৃত থাকবে না। আমাদের নাগরিক প্রতিরক্ষা সংস্থার একমাত্র লক্ষ্য হবে আভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় রাখা। যতদিন ভারত পদানত থাকবে অন্য কোন শক্তি বা ক্ষমতার হাত থেকে দেশকে সামরিকভাবে রক্ষা করার প্রশ্ন কেবলমাত্র সরকারের ভাবনার

বিষয়, জনসাধারণের নয়। আমাদের দাসত্বকে বজায় রাখার জন্য যে লড়াই তাতে আমাদের কী স্বার্থ থাকতে পারে, কারণ পরাধীন ভারতকে রক্ষার জন্য লড়াই করার অন্তর্নিহিত অর্থ একমাত্র এই।

এই ভাষণের উপসংহারে থাকবে আজকের ও আগামীকালের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর বিচার-বিবেচনা। তার আগে আমি আপনাদের ফরওয়ার্ড ব্লক-এর ঐতিহাসিক ভূমিকা কী তা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। ঐতিহাসিক প্রয়োজনের ফলে ব্লক-এর আবির্ভাব ঘটেছে। কোন একজন ব্যক্তির বা একাধিক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত কোন গোষ্ঠীর তা সৃষ্ট নয়। যতদিন তার দ্বারা ঐতিহাসিক কোন উদ্দেশ্য সাধিত হবে, আভ্যন্তরিক বা বাহিরিক সকল বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তা বেঁচে থাকবে এবং তার বিকাশ ঘটবে। আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে, আমাদের ইতিহাসের সংগ্রামপরবর্তী পর্যায়ে ফরওয়ার্ড ব্লক-এর পালনীয় একটি ভূমিকা আছে। স্বাধীনতাকে জয় করে আনার পর তাকে রক্ষা করার দায় তার এবং গণতন্ত্র স্বাধীনতা ও সমাজ-তন্ত্রের চিরন্তন নীতির ভিত্তিতে তাকে গড়ে তুলতে হবে নতুন এক ভারত, এক সুখী ভারত। আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করার পর আমাদের ব্রত উদ্‌যাপিত হয়েছে এই রকম চিন্তা করে আমরা যেন মারাত্মক ভুল না করি। যে সংগঠন বা পার্টি স্বাধীনতা জয় করে আনবে যুদ্ধপরবর্তী পুনর্গঠনের দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। কেবলমাত্র এই উপায়েই প্রগতির অবিচ্ছিন্নতা বজায় থাকবে।

আজ আমরা যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছি এবং সম্ভবত আগামী কাল তার যা রূপান্তর ঘটবে এবারে তাই আমাদের বিবেচ্য বিষয়। উইনস্টন চার্চিল ও পল রেনঁর খোলাখুলি বিবৃতিগুলি পড়বার পর যুদ্ধের ত্বরিত গতি থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রধান যে দিকগুলি প্রকট হয়ে উঠছে সে সম্পর্কে আমরা চোখ বুজে থাকতে পারি না। চেম্বার অফ ডেপুটিস্-এ এম. পল রেনঁ পরিস্থিতি সম্পর্কে যে বিজ্ঞপ্তি দেন (মিত্রশক্তির জয় কেবলমাত্র অলৌকিক শক্তিতেই সম্ভবপর) তা যে তদানীন্তন সামরিক অবস্থার নির্ভুল চিত্র, প্রতিদিন তা সুস্পষ্টভাবে

বোঝা যাচ্ছে। সে চিত্রে তখনই যদি নিরাশার অন্ধকার থাকে, তার পর থেকে অন্ধকার আরও ঘনীভূত হয়েছে। আজ আশার সম্ভাবনা নিঃসন্দেহে ক্ষীণ। এবং এই যুদ্ধ সর্বাত্মক যুদ্ধ এই কথা মনে রাখলে আমরা বুঝতে পারি যারা হারছে তারা কী অসম্ভব পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে।

আমরা মেনে নিতে রাজী আছি যে, মসিয়ঁ রেনঁর "সংগ্রাম তীব্রতর করার···এবং হাল ছেড়ে না দেবার" সোচ্চার প্রস্তাব সাহস ও সংকল্পব্যঞ্জক এবং তাঁর কথাগুলো শূন্যগর্ভ বাগাড়ম্বর নয়। এসব সত্ত্বেও তাঁর কথায় প্রত্যয় হয় না যখন তিনি বলেন: "আমরা আমাদের প্রদেশগুলির মধ্যে কোন একটিতে নিজেদের আবদ্ধ করে রাখব এবং যদি সেখান থেকে বিতাড়িত হই আমরা উত্তর আফ্রিকায় চলে যাব, এবং প্রয়োজন হলে আমেরিকায় আমাদের অধিকারভুক্ত যে সব জায়গা আছে সেখানে যাব।"

যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে নিশ্চয় এ উপায় খুব প্রশস্ত নয়। মিত্রপক্ষ ইওরোপে যদি তিষ্ঠোবার ঠাঁই না পায়, আফ্রিকা থেকে, এশিয়া থেকে, এমন কি আমেরিকা থেকেও লড়াই চালানো তাদের পক্ষে সম্ভব; কিন্তু তাদের চরম লক্ষ্য যদি হয় যুদ্ধজয়, তাহলে তা অনর্থক।

যুদ্ধ যেভাবে বিস্তৃত হয়েছে তার কঠিন বাস্তব দিকগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত স্বচ্ছ আলোয় আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে না উঠছে, তাদের পরীক্ষা করে দেখার সকল অধিকার আজ আমাদের আছে। ফরাসী ও ইংরেজ জননেতারা খোলা মনে সব কথা বলেছেন। আমাদেরও নিজেদের কাছে খোলাখুলিভাবে সব বলতে হবে।

মিত্রশক্তির ক্রমাগত পরাজয়ের কারণ আজ বোধ হয় তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে কোথাও নিহিত আছে। যতদূর বিশ্বাস মিস্টার ক্লিমেণ্ট অ্যাটলি বিরোধীপক্ষের আসন থেকে তাঁর শেষবারের ভাষণে বলেছিলেন, এই ব্যবস্থা সঙ্কটের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে। যে ব্যবস্থায় দাসত্ব এবং স্বাধীনতা পাশাপাশি অবস্থান করে সেই ব্যবস্থার

মৌলিক এই দুর্বলতার ফলেই প্রচারের ক্ষেত্রে ব্রিটেনকে "মোক্ষম-ভাবে মার খেতে হয়েছে।" **ডেইলি মেল** সংবাদপত্রের মতে যা ঘটেছে তা এই। মার্চের শেষের দিকে ওই সংবাদপত্র লিখছে যে, জার্মানি থেকে বেতারে যা প্রচার চালানো হয় তা "কেবলমাত্র ব্রিটেনের অসামরিক নাগরিকদেরই প্রভাবিত করেনি, তা সশস্ত্র বাহিনীকেও প্রভাবিত করেছে।" ওই সংবাদপত্রের দৃঢ় অভিমত "গোয়েব্‌ল্‌স সবাইকে হারিয়েছে।"

কিন্তু একটা বিশেষ পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা ততটা আগ্রহী নই যতটা কর্মের মূল নীতি সম্পর্কে। এবং আমাদের মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতির জন্য আমাদের যে দাবি, মূল প্রশ্নগুলিকে অস্পষ্ট করে এবং "বিশ্বাসঘাতক" বলে আওয়াজ তুলে তা আদায় করা থেকে আমাদের নিরস্ত করা যাবে না। সুচতুর সাম্রাজ্যবাদী প্রচারে আমরা বহুকাল যাবৎ প্রতারিত হয়ে আসছি।

আন্তর্জাতিক এই পরিবর্তনের প্রবাহে আমাদের স্থান কোথায় নিজেদের এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে আমরা পারি না। মিত্রশক্তির রাষ্ট্রনীতিবিদ ও রাষ্ট্রকুশলীদের বিষণ্ণ চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে আমরা নিজেদের এ প্রশ্ন না করে পারি না, ব্রিটিশ প্রতিরোধ যদি ভেঙে পড়ে তখন আমাদের কী কর্তব্য হবে? এই বিপর্যয় মোটেই অসম্ভব নয়। এমন কি প্রধানমন্ত্রী মিস্টার চার্চিলও ব্রিটেনের পরাজয়ের কথা ভেবে ইতিমধ্যে কথা বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী রেনঁ এখন যেভাবে কথা বলছেন সেইমত তিনি অনেক আগেই নিজেকে ব্যক্ত করেছেন—সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য সাম্রাজ্যের সুদূর প্রান্তে তিনি পাড়ি দিতে চান। মনে হয় আমাদের রাষ্ট্রনীতি-বিশারদদের মধ্যে কেউ কেউ একটা স্বপ্নের ঘোরে রয়েছেন, তাঁরা স্বপ্ন দেখছেন ভারতকে ডিক্টেটারদের বাহিনীর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রতিরোধের দুর্গে পর্যবসিত করা হয়েছে। কী অদ্ভুত কল্পনা!

ইংলিশ প্রণালীর ফ্রান্সের দিককার উপকূলের প্রায় সবটাই জার্মানদের অধিকারে। তার ফলে সাধারণ যোগাযোগ রক্ষা করা দুরূহ

ও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে এবং সেনাবাহিনীর চলাচল অসম্ভব হয়েছে বলা চলে। ফ্রান্সের সেরা সেরা কয়েকটি শিল্প-অঞ্চল দখলকারীদের হাতে। ফ্রান্সের প্রাণকেন্দ্র প্যারিসের প্রাণের চাঞ্চল্য থেমে গেছে। অবশিষ্ট ফ্রান্স থেকে ম্যাজিনো লাইনকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্য শাঁপেন্ অঞ্চলে,শক্তিশালী এক জার্মান আক্রমণের তোড়জোড় চলছে। দক্ষিণ-পূর্বে সদ্য-অবতীর্ণ শক্তিশালী ইটালীয় বাহিনী চাপ দিয়ে যাচ্ছে, এবং সর্বত্র হটে আসা ফরাসীবাহিনী সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ জার্মান সেনাবাহিনীর সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ বিমানবলের আক্রমণে নাকালের একশেষ হচ্ছে। ইওরোপে মিত্রশক্তির এই নৈরাশ্যজনক অবস্থা। উত্তর মেরু থেকে আটলান্টিক পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন রেখায় নাৎসী ঈগল তার পাখা বিস্তার করে রয়েছে। আমাদের যে বলা হচ্ছে আশান্বিত হবার কোন কারণ নেই, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

এই সেদিন নাৎসীবাহিনী যখন মুখে "নাখ্ পারিস" ("প্যারিস চলো") আওয়াজ করতে করতে জার্মান সীমান্ত অতিক্রম করে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে অনুপ্রবেশ করল, তখন কে ভাবতে পেরেছিল, তারা এত শীঘ্র তাদের লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে? আমাদের চোখের সামনে সামরিক রণকৌশলের এ যেন এক অলৌকিক ঘটনা। এর সঙ্গে তুলনা চলতে পারে নেপোলিয়নের যুদ্ধাভিযান কিংবা ১৮৭০-এর ফ্রাঙ্কো প্রুশিয়ান যুদ্ধে সেডানে বিপর্যয়। ফরাসী হাই কমাণ্ড যতই বলুক না কেন, প্যারিসের পতনের পর যান্ত্রিক যানবাহন, অসংখ্য ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমানের সামনে উল্লেখযোগ্য প্রতিরোধ আর সম্ভব নয়। ট্রেঞ্চ থেকে যুদ্ধ করার দিন শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু এর পরে কী? একথা সুস্পষ্ট যে রেনঁর সরকার গ্রেট ব্রিটেনকে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে জার্মানির সঙ্গে আলাদা-ভাবে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করবে না। কিন্তু কতদিন তিনি ফরাসী জনসাধারণের আস্থাভাজন হয়ে থাকতে পারবেন? তাঁর কেবিনেটের পতন, জার্মানি ও ইটালীর কাছ থেকে লোভনীয় প্রস্তাব, ঐ প্রস্তাব মেনে নিয়ে শান্তিচুক্তি করতে প্রস্তুত এমন একটি নতুন কেবিনেট—

এই সব ঘটনা একেবারে অসম্ভব বলে অগ্রাহ্য করা যায় না। এই সেদিন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিস্টার উইনস্টন চার্চিল তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতায় এই বিষয়ে অশুভ ইঙ্গিত করেছেন।

এবং ইংলণ্ড ? ফ্রান্স থাক বা যাক, ইংলণ্ড কী করবে ? এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে ব্যাখ্যার অতীত সেই কারণ—"জনসাধারণের মনোবল"। দুর্ভাগ্যবশত ব্রিটিশ জনগণের মনোবল বেশ মোক্ষম ধাক্কা খেয়েছে এবং তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের বক্তৃতা। ব্রিটিশ জনগণকে এ কথা বলার দরকার হচ্ছে কেন, তারা যেন শ্মশানযাত্রীর মত গম্ভীর মুখ করে ঘুরে না বেড়ায় ? দুনিয়াকে এ কথা বলার দরকার হচ্ছে কেন যে, গ্রেট ব্রিটেন যদি নাৎসী-অধ্যুষিত হয় তবু সাম্রাজ্য লড়াই চালিয়ে যাবে এবং যথাকালে সেদিন দেখা দেবে যখন নয়া দুনিয়া সাবেকী দুনিয়াকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসছে ? ইংরেজরা তাদের একরোখা নাছোড়বান্দা স্বভাব ও নিঃশঙ্ক মনোবলের জন্য বিখ্যাত। সম্ভবত তারা আজ তাদের কঠিনতম অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। দেখা যাক তারা কীভাবে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

তরুণ জেনারেল ও সামরিক কুশলীদের উদ্ভাবিত নতুন এক সামরিক টেকনিকের সহায়তায় নাৎসীরা অঘটন ঘটাতে সমর্থ হয়েছে। মিত্রশক্তি বয়োবৃদ্ধ সেকালের যুদ্ধখ্যাত জেনারেলদের উপর নির্ভর করেছে। দেখা গেল জেনারেলরা পেরে উঠছেন না। নাৎসী জেনারেলরা তাদের নতুন টেকনিক কি নিঃশেষ করে ফেলেছে ? মিত্রপক্ষের কি সামরিক কোন গুপ্ত রহস্য আছে অথবা কোন নতুন টেকনিক জানা আছে ? এই দুটি প্রশ্নের উত্তরের উপর অনেক কিছুই নির্ভর করবে। জার্মান সেনাবাহিনীর রাসায়নিক প্রস্তুতির কথা আমরা অনেক শুনে আসছি। সত্যিই কি তারা রাসায়নিক যুদ্ধের নতুন কোন ত্রুটিহীন টেকনিক উদ্ভাবিত করেছে ? যদি তারা তা করে থাকে তাহলে আগামী দিনে আমরা তার প্রমাণ পাব। এবং তখন দেখা যাবে ঐ নতুন অবস্থার মধ্যে মানুষের মনোবল কী করে

টিকে থাকে। তা কি ভেঙে পড়বে, যেমন ইটালীয়ানদের বিমানের আক্রমণে সাহসী আবিসিনিয়ানদের মনোবল ভেঙে পড়েছিল? অথবা আত্মিক শক্তি জড়শক্তিকে পরাহত করবে?

বাস্তব দিক থেকে বিচার করলে, গ্রেট ব্রিটেন অধ্যুষিত হবার পর যুদ্ধ কী করে চলতে পারে ভেবে ঠিক করা কঠিন। পাছে জাপান সুদূর প্রাচ্যে গোলমাল বাধায়, সেইজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে মিত্রপক্ষকে একটা সীমা অতিক্রম করে সাহায্য করা সম্ভব নয়। এবং এমন কোনই আশা নেই যে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্‌ জার্মানি ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে বিভেদ আনতে সমর্থ হবে। অনেক বেশি সম্ভবপর যে, একপক্ষে সোভিয়েত রাশিয়া এবং অপরপক্ষে জার্মানি ও ইটালী—এই দুই পক্ষের মধ্যে নিশ্চিত চুক্তি হয়েছে। সেই চুক্তির শর্ত কী হতে পারে আমাকে যদি কল্পনা করতে বলা হয়, আমি তাহলে এই মত আন্দাজ করব:

(১) বলকান অঞ্চল বাদ দিয়ে ইওরোপীয় মহাদেশের উপর জার্মানির একাধিপত্য থাকবে।

(২) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ইটালীর একাধিপত্য থাকবে।

(৩) বলকান ও মধ্যপ্রাচ্য হবে রুশ-প্রভাবিত অঞ্চল।

(৪) আফ্রিকার সহায় সম্বল বৃহৎশক্তিরা সকলে ভাগ করে নেবে।

যেহেতু জার্মানি ও ইটালী উভয়েই এবং সম্ভবত সোভিয়েত রাশিয়াও আপাতত গ্রেট ব্রিটেনকে পয়লা নম্বরের সাধারণ শত্রু বলে গণ্য করে, সেইজন্য খুবই সম্ভব, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভাগ করে নেবারও তাদের এক পরিকল্পনা আছে। তারা জানে ডাচ্‌ইণ্ডিজ থেকে অস্ট্রেলিয়া অবধি সমগ্র দ্বীপবহুল সমুদ্রখণ্ডের উপর জাপানের লুব্ধ দৃষ্টি সর্বদা রয়েছে। সেইজন্য এই কার্যোদ্ধারে তারা জাপানেরও সাহায্য চাইতে পারে।

পরিস্থিতি যখন এই, ব্রিটেন যদি জার্মান ইটালিয়ানদের আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে ও তার সাম্রাজ্যকে বাঁচাতে না

পারে, সেক্ষেত্রে মিস্টার চার্চিল যে আশা করছেন সাম্রাজ্য নিজেকে রক্ষা করবে এবং তদোপরি ব্রিটেনকেও, সে আশা হবে নিতান্তই দুরাশা। অতএব সাম্রাজ্যের সহায়তা নিয়ে অথবা ভারতের সহায়তা নিয়ে ব্রিটেনকে রক্ষা করার কথা আমরা আর যেন না বলি। এই দারুণ সঙ্কটে ভারতকে অবশ্যই তার নিজের কথা প্রথমে চিন্তা করতে হবে। তা যদি এখন স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে এবং অতঃপর নিজেকে রক্ষা করতে পারে, তাহলেই তা মানবতার আদর্শকে সবচেয়ে ভালোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে। অস্থায়ী জাতীয় সরকার মারফত ভারতের জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার দাবি অবিলম্বে জানানোর দায়িত্ব ভারতের জনসাধারণের। এই দাবি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ইংরেজ সরকার কোন শাসনতান্ত্রিক বাধাবিপত্তির কথা তুলতে পারে না, কারণ এর জন্যে প্রয়োজনীয় বিধান পার্লামেন্টে অনুমোদন করাতে চব্বিশ ঘণ্টাই যথেষ্ট। ভারতের অভ্যন্তরে ও বাইরে অবস্থা যখন শান্ত হবে তখন অস্থায়ী জাতীয় সরকার এ দেশের জন্য পূর্ণাবয়ব এক সংবিধান রচনার জন্য কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্ব্লি আহ্বান করবে।

বন্ধুগণ, এইগুলি আমার আজকের কিছু কিছু চিন্তা ভাবনা ও প্রস্তাব। আমি আশা করি এবং বিশ্বাস করি, আপনারা এগুলি যথোচিত বিচার-বিবেচনা করে দেখবেন। যাই হোক, আপনাদের কাছে আমার আবেদন, আসন্ন ভবিষ্যতে পূর্ণ স্বরাজ অর্জন করার মত বাস্তব কোন কর্মপরিকল্পনা না পাওয়া পর্যন্ত আপনারা নাগপুর ত্যাগ করে যাবেন না।

আসুন, আরেকবার আমরা ঘোষণা করি—"এখানে এবং এই মুহূর্তে ভারতের জনগণকে সব ক্ষমতা দিতে হবে।"

দেশের সামনে কর্তব্য

২৯শে জুন, ১৯৪০, নিম্নলিখিত বিবৃতি ফরওয়ার্ড ব্লক-এ প্রকাশিত হয়।

বিশ্বপরিস্থিতি এমনই এক পরিবর্তনের স্রোতের মধ্যে দিয়ে চলেছে যে কোন কোন মহলে ভাবনাচিন্তা বন্ধ করে দিয়ে ঘটনা-প্রবাহে ভেসে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে, যা ঘটেছে বা ঘটছে তা আকস্মিক নয়, তা সযত্ন পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির ফল। আমাদের পক্ষে মারাত্মক ভুল হবে যদি আমরা মনে করি, আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্যে উপনীত হবার পক্ষে যেহেতু পরিস্থিতি আমাদের অনুকূল, সেইজন্য পাকা ফলের মত স্বরাজ আমাদের হাতে খসে পড়বে।

দশদিন আগে কলিকাতা ত্যাগ করার পর থেকে বিভিন্ন প্রদেশের ফরওয়ার্ড ব্লক-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে ছাড়া ভারতের অগ্রগণ্য অনেক রাজনীতিবিদ ও নেতার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। আমার আলোচনায় ফরওয়ার্ড ব্লক-এর নীতি ও কার্যক্রম উপস্থাপিত করতে এবং বিনিময়ে নিজেও উপকৃত হতে প্রয়াস করেছি। যদিও আমি দাবি করতে পারি না সর্ববিষয়ে আমাদের মতৈক্য হয়েছে, তবু সানন্দ বিস্ময়ের সঙ্গে আমি দেখেছি অনেক বিষয়ে আমরা একমত হয়েছি। এর ফলে, আমাদের সামনে যে কর্তব্য রয়েছে সে সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা নিয়ে আমি ফিরে এসেছি।

প্রথমত, একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার মারফত ভারতের জনসাধারণের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য সময় নষ্ট না করে ইংরেজ সরকারের কাছে আমাদের মিলিত দাবি পেশ করতে হবে। ভারতের জনগণ একবাক্যে যদি এই দাবি জানায়, তাহলে এ দাবি অপ্রতিরোধ্য হতে বাধ্য। কোন প্রতিশ্রুতিতে, এমনকি ক্ষমতার আংশিক হস্তান্তরেও এখন আমাদের প্রলুব্ধ হলে চলবে না, কারণ

আমাদের সুস্পষ্ট স্লোগান—"ভারতের জনগণকে সব ক্ষমতা দিতে হবে।"

কেন্দ্রে জাতীয় মন্ত্রিসভার সঙ্গে প্রদেশগুলিতেও জাতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করতে হবে। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার স্বভাবত আনুগত্য থাকবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রতি। অধিকন্তু পালা-বদলের সময় আভ্যন্তরিক শান্তি ও শৃঙ্খলা তারা সুনিশ্চিত করবে এবং হিন্দু-মুসলিম সমস্যার স্থায়ী মীমাংসার সূচনা করবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান অসম্ভব নয়। এই সমাধান তখনই দেখা দেবে যখন আমরা বাস্তব, প্রত্যক্ষ বিষয়গুলির উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে শুরু করব এবং তত্ত্বগত কিংবা অবাস্তব প্রশ্ন নিয়ে আমাদের শক্তি বা সময়ের যদি অপচয় না করি। সম্ভবপর সকল ক্ষেত্রে এখনই হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সহযোগিতার সূচনা হলে ভবিষ্যতে এইপ্রকার সহযোগিতার ক্ষেত্র অনিবার্যভাবে বিস্তৃত হবে।

এই প্রসঙ্গে বিবেচ্য প্রশ্ন, ঠিক এই মুহূর্তেই কেন্দ্রে জাতীয় মন্ত্রিসভা যদি আমরা গঠন করতে নাও পারি, প্রদেশগুলিতে জাতীয় মন্ত্রিসভা নিয়ে পরীক্ষা চালানোর চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে উচিত হবে কিনা। এই প্রশ্নে আমার জবাব "হ্যাঁ, উচিত হবে।" বর্তমান গতিশীল পরিস্থিতিতে প্রদেশগুলিতে জাতীয় মন্ত্রিসভা কেবলমাত্র আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে, কেবলমাত্র হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতেই মস্ত সহায় হবে না, স্বরাজলাভের পথে যদি বাধা দেখা দেয় তাহলে কেন্দ্রেও ক্ষমতালাভের সহায়ক হবে।

নাগরিক প্রতিরক্ষা সংস্থার যে পরিকল্পনা আমাদের আছে তাও আমাদের কার্যকর করতে হবে। কিন্তু জনসাধারণকে আমাদের বোঝানো দরকার যে এই সংস্থা ইংরেজ সরকার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এর কাজ হবে কেবলমাত্র আভ্যন্তরিক শান্তি, শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বজায় রাখা, যাতে ভারতবাসীদের যে সময়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে একাগ্র হওয়া উচিত সেই সময় তারা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ না করে।

রামগড়ে আমরা যে সংগ্রাম শুরু করেছি কোনক্রমেই তাতে আমাদের শৈথিল্য যেন না আসে, আমাদের এই প্রত্যয়ের উপর এই প্রসঙ্গে আমি জোর দিতে চাই। আমরা বিশ্বাস করি না যে স্বরাজ আপনাআপনি বিনা সংগ্রামে আসবে। যে মুহূর্তে সংগ্রাম পরিত্যাগ করা হবে, সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠবে এবং সাম্রাজ্য-বাদের সঙ্গে আপসের প্রবণতা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। অতএব আমরা যে সংগ্রাম শুরু করেছি তা তীব্রতর করার এবং তার ক্ষেত্র প্রসারিত করার সঙ্কল্প আমরা নিয়েছি।

এই সঙ্কট মুহূর্তে যখন আমাদের চোখের সামনে ইতিহাস রচিত হচ্ছে তখন সবচেয়ে বেশি যা দরকার তা এই যে, আমাদের একমাত্র চিন্তা হোক, কোন দল নয়, কোন সাম্প্রদায়িক স্বার্থ নয়, 'কেবলমাত্র ভারত, ভারত ছাড়া কিছু নয়। ভারতের মুক্তিযজ্ঞে ব্যক্তি বা দলের কোন স্বার্থত্যাগই যথেষ্ট বলে গণ্য হতে পারে না।

হলওয়েল মনুমেণ্ট

২৯শে জুন, ১৯৪০, ফরওয়ার্ড ব্লক-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ।

এই সংখ্যা বার করতে অপরিহার্য কারণে দেরি হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি, বাংলা সরকারের কৃপাদৃষ্টির দয়ায় একটা সপ্তাহ নষ্ট করতে আমরা বাধ্য হয়েছি। আমাদের আপিসে তল্লাসী চালানো হয় এবং আমাদের জামিন বাজেয়াপ্ত হয়েছে। পরবর্তী সংখ্যা বার করার আগে নতুন করে আরও দু হাজার টাকার জামিন আমাদের জমা দিতে হয়েছে।

এতে ভালোই হয়েছে। আমাদের মেরুদণ্ড খাড়া করে দিয়েছে। অতএব আমাদের যে কার্যক্রম স্থির আছে তা আমাদের অনুসরণ করে যেতে হবে. আরও প্রেরণা আরও উদ্দীপনার সঙ্গে তা রূপায়িত করতে হবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের নির্দেশ অনুযায়ী হলওয়েল মনুমেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন এখনই শুরু করতে হবে। ৩রা জুলাই, ১৯৪০, বাংলার শেষ স্বাধীন রাজ্যেশ্বরের সম্মানে বাংলাদেশে সিরাজদ্দৌলা দিবস পালিত হচ্ছে। হলওয়েল মনুমেণ্ট শুধুমাত্র নবাবের স্মৃতিকে অকারণে কলঙ্কিত করেনি, তা বিগত দেড়শো বছর বা তারও বেশিদিন ধরে আমাদের দাসত্ব ও অবমাননার প্রতীক হয়ে কলকাতার বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ওই স্মৃতিসৌধকে এবার বিদায় নিতে হবে।

আগামী ৩রা জুলাই থেকে ওই মনুমেণ্টের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান শুরু হবে এবং লেখক সেইদিন স্বেচ্ছাসেবকদের প্রথম দলের পুরোভাগে নিজে থাকবে স্থির করেছে।

ফরওয়ার্ড ব্লক-এর নিখিল ভারত কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় নাগপুরে ১৮ই ও ১৯শে জুন। কনফারেন্স অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব সেখানে গৃহীত হয়। কনফারেন্সের

কার্যধারায় সারা দেশের জনমত প্রভাবিত হয়েছে। এমন কি তার প্রভাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির উপরও পড়েছিল, যাদের মিটিং একই সময়ে সেখানে চলছিল। নাগপুর কার্যত ঢাকার আহ্বানকেই পুনরায় ব্যক্ত করেছে। নাগপুরে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির সারমর্ম এইভাবে দেওয়া যেতে পারে।

(১) "ভারতের জনগণকে সব ক্ষমতা দিতে হবে"—এই স্লোগান সামনে রেখে সংগ্রাম তীব্রতম কর এবং তার ক্ষেত্র বিস্তৃত কর।

(২) অস্থায়ী জাতীয় সরকার মারফত ভারতের জনগণের কাছে অবিলম্বে সম্পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ইংরেজ সরকারের কাছে দাবি জানাও।

(৩) একই সঙ্গে জাতীয় ঐক্য এবং বিশেষ করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য কাজ করে যাও।

(৪) পালাবদলের সময় আভ্যন্তরিক একতা ও সংহতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নির্দলীয় ভিত্তিতে নাগরিক প্রতিরক্ষা সংস্থা সংগঠিত কর।

নাগপুরের সিদ্ধান্তগুলির পরে এবং তারই অনুবর্তনে লেখক সাম্প্রতিক এক বিবৃতিতে কেন্দ্রে একটি জাতীয় মন্ত্রিসভা, সেইসঙ্গে প্রদেশগুলিতে জাতীয় মন্ত্রিসভা গঠনের পক্ষে অভিমত দিয়েছে।

আজকের পরিস্থিতি গতিশীল, এবং তা ঠিকমত আয়ত্তে আনতে হলে গতিশীল এক নীতিরও প্রয়োজন। ইতিহাস আমাদের পরীক্ষার মধ্যে ফেলেছে। তাতে যেন আমরা অকৃতকার্য না হই। এখন আমাদেরই হাতে নির্ভর করছে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা বা নস্যাৎ করা।

ফরওয়ার্ড ব্লকের পটভূমি

[নেতাজীর নিজের হাতে ইংরাজীতে লেখা এই অসমাপ্ত প্রবন্ধটি 'Forward Bloc in Perspective' তাঁর শেষ কারাবাসের সময়কার (জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৪০) কাগজপত্রের মধ্যে সম্প্রতি পাওয়া গেছে। এই লেখাটির সঙ্গে পাঠক নিশ্চয়ই কাবুলে লেখা এবং "ভারতের মুক্তিসংগ্রাম ১৯২০-১৯৪২"-এর ২য় খণ্ডে প্রকাশিত 'Forward Bloc—its justification'-এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করবেন। বোঝা যায়, নেতাজী এই প্রবন্ধটি লেখার সংকল্প প্রেসিডেন্সী জেলেই করেছিলেন। কাবুলে তিনি এটি নতুন করে লেখেন এবং শিরোনামেব কিছু পবিবর্তন করেন।—শ. ক. ব.]

একটা জীবন্ত গাছের সঙ্গে যে কোন আন্দোলনের বিকাশ তুলনা করা যেতে পারে। কোন ক্ষেত্রেই বিকাশ সরল রেখায় হয় না। সেখানেও গতিভঙ্গ ও দ্বিভাজনের সমগোত্রীয় অন্তর্নিহিত উৎক্ষেপ ও বিরোধ থাকে। কিন্তু বিকাশের অন্যতম মৌলিক ধর্ম ধারাবাহিকতা। এই ধারাবাহিকতা থাকে বলেই একটা জীবন্ত শাখা একটা পরগাছা থেকে আলাদা। একটি জীবন্ত গাছের প্রতিটি অংশ জৈবসূত্রে মূলের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যে মূল মাটির গভীরে সম্প্রসারিত। একটা পরগাছা সম্পর্কে একথা বলা চলে না।

জৈব অভিব্যক্তির এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

যখনই কোন আন্দোলনের গতি রুদ্ধ হয়ে যায় অথবা তার গতি রোধ করা হয় সচরাচর তখনই ভিতর থেকে বিদ্রোহ বা বিপ্লব প্রকট হয়ে ওঠে। ১৯২১ সালে আমার কংগ্রেসে যোগদান করার পর কংগ্রেসের মধ্যে বিদ্রোহের প্রথম লক্ষণ দেখা দেয় ১৯২২ সালে, বর্দোলীতে মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার অব্যবহিত পরে। এই বিদ্রোহ এক বৎসর পরে স্বরাজ্য পার্টির নামে সংগঠিত হয়ে রূপ পরিগ্রহ করে।

স্বরাজ্য পার্টিতে নানা ধরনের লোকের সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁদের সবাই যে দৃষ্টিভঙ্গীতে বা চরিত্রে বৈপ্লবিক বা আমূল পরিবর্তন-পন্থী ছিলেন তা নয়। তবে "ন্যূনতম যে সাধারণ নীতিসূত্র" সবাইকে এক করে বেঁধে রেখেছিল তা রাজনীতিতে যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গী এবং পরিবর্তনের জন্য আকাঙ্ক্ষা। এইকারণে সাংগঠনিক যে কংগ্রেস পার্টি নির্ভেজাল গান্ধীবাদকে মেনে নিয়েছিল তার নামকরণ হয় "নো-চেঞ্জ পার্টি"। এতদিন পরেও অনেকেরই মনে পড়তে পারে যে, মূল বিরোধের বিষয় ছিল আইন সভায় যোগদান করা নিয়ে, 'নো-চেঞ্জাররা' বা গোঁড়া গান্ধীবাদীরা ছিল তার ঘোরতর বিরোধী।

কিছুকাল বিদ্রোহের পর দুইপক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া হল ও সমন্বয় ঘটল। এর সূত্রপাত হয় ১৯২৪ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ জীবিত থাকাকালে, যখন গান্ধী-দাশ-নেহরু চুক্তি সম্পাদিত হয়। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর কংগ্রেস ও স্বরাজ্য পার্টি কার্যত এক হয়ে যায়। কংগ্রেস ১৯২৫ সালের কানপুর অধিবেশনে স্বরাজ্য পার্টির কর্মনীতি গ্রহণ করে এবং কংগ্রেস স্বরাজ্যবাদীদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এই অবস্থা ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত লাহোর অধিবেশন পর্যন্ত চলতে থাকে। ১৯২৯ সালে মহাত্মা গান্ধীর মনোনয়নের ফলে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু লাহোর কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হন। ঠিক এই সময়ে স্বরাজ্যদলীয় সর্বাধিনায়ক পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সরে দাঁড়ান, তার ফলে স্বরাজ্যদলীয় কর্মনীতি বাতিল হয়ে যায় এবং দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে "নো-চেঞ্জাররা" আবার ক্ষমতাসীন হয়। কিন্তু আইনসভা পরিত্যাগের প্রশ্ন ১৯৩০ সালে ছিল একেবারে অবান্তর। একে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করবার কোনই প্রয়োজন ছিল না।

বিকাশের সাধারণ নিয়ম অনুসারে পরবর্তী অন্তর্বিপ্লব স্বরাজ্য পার্টির ভিতর থেকেই, অর্থাৎ ওই পার্টির প্রগতিশীল অংশ থেকে প্রত্যাশিত ছিল। কার্যত কী হয়েছিল দেখা যাক।

কংগ্রেস যাতে পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য গ্রহণ করে সেই উদ্দেশ্যে

১৯২৮ সালে লক্ষ্ণৌতে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের পত্তন করা হয়। এই ব্যাপারে যাঁরা নেতৃত্ব করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, বর্তমান লেখক এবং আরও কয়েকজন। ওই বৎসরই ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে যখন কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসে তখন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বাধীনে সাংগঠনিক পার্টির সঙ্গে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সদস্যদের সংঘর্ষ হয়। প্রধান প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন মহাত্মা গান্ধী, তাতে আমি এই মর্মে একটি সংশোধন যোগ করার জন্যে প্রস্তাব আনি যে, কংগ্রেসের লক্ষ্য "পূর্ণ স্বরাজ" সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করতে হবে। সংশোধনী প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হয়, কিন্তু ভোটে দেখা গেল সংখ্যালঘু যাঁরা তাঁরা শক্তিমান ও প্রভাবশালী।

গান্ধিজী সম্ভবত তা বুঝতে পেরেছিলেন, কারণ পরের বৎসর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে লাহোরে যখন বার্ষিক অধিবেশন বসে তখন তিনি (গান্ধিজী) কলিকাতা কংগ্রেসে যে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন ও যা বাতিল করেছিলেন তা তিনি নিজেই উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় বটে, কিন্তু তার দ্বারা বোঝায় না যে, লাহোরে কংগ্রেসের মধ্যে এই নিয়ে দলাদলি হয়নি। ১৯২৮ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে সর্বপ্রথম বামপন্থীদের সুস্পষ্ট আবির্ভাব ঘটে এবং সেখানে আদর্শ বা লক্ষ্য নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে শক্তি পরীক্ষাও হয়ে যায়। লাহোর কংগ্রেসে স্বরাজ অর্জন করার পদ্ধতি বা কর্মকৌশলের পরিকল্পনা নিয়ে সংঘর্ষ বাধে। মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশমত ওয়ার্কিং কমিটি আনুষ্ঠানিকভাবে যে পরিকল্পনা পেশ করে বিষয়নির্বাচনী (সাবজেক্ট্স্) কমিটি তা বাতিল করে দেয়।

বামপক্ষের তরফ থেকে আমি বিকল্প যে পরিকল্পনা পেশ করি সেই কমিটি তাও অগ্রাহ্য করে। ফল দাঁড়াল এই যে, যদিও কংগ্রেস সর্বসম্মতিক্রমে স্বরাজের লক্ষ্য স্বীকার করে নিয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে তা রূপায়িত করার কোন পরিকল্পনা স্থির না করেই কংগ্রেসের অধিবেশন

ভেঙে গেল। সমাবেশের মনোভাব থেকে কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল, কংগ্রেসের সদস্যেরা সাধারণভাবে সংগ্রামী কর্মপন্থা চেয়েছিল।

লাহোরে গান্ধিজী নিঃসন্দেহে অসাধারণ কূটনীতির পরিচয় দিয়েছিলেন। কলিকাতায় দেখা গিয়েছিল কংগ্রেস রাজনীতিতে বামপন্থী আর নগণ্য শক্তি নয়, কিন্তু এক বৎসর পরে মহাত্মা এমন চাল চাললেন যা অনেকের কাছেই মনে হয়েছিল মোক্ষম আঘাত। কংগ্রেসের অধিবেশনের আগেই পণ্ডিত জওহরলালকে ভাঙিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং সেই কংগ্রেসে গান্ধিজী নিজে স্বরাজের প্রস্তাব উত্থাপন করে উগ্রপন্থীদের যা কিছু সংকল্প সব প্রায় বানচাল করে দিলেন। তৎসত্ত্বেও, যদিও সংখ্যার দিক থেকে কলিকাতার থেকে তাদের শক্তি হ্রাস পেয়েছিল, তবু লাহোরে যখন তারা মিলিত হয় তারা তখন অনেক বেশি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অনেক বেশি অভিজ্ঞ, এবং এই সত্যটি মহাত্মার নজর এড়ায়নি। লাহোরে থাকার সময় ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে মহাত্মার মনে কিছুই ছিল না, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই ১৯৩০ সালের এপ্রিলে তিনি আইন অমান্য অভিযান শুরু করে দিলেন। এ কথা ঠিকই, এই অভিযান রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির চূড়ান্ত অভিব্যক্তি, তবু দু'বৎসর ধরে, বিশেষত লাহোর কংগ্রেসের সময় বামপন্থীরা ক্রমাগত যে চাপ দিয়ে চলেছিল তা যদি না দেওয়া হত তাহলে এই অভিযান একান্তই হত কি না, অন্তত পক্ষে আমার মনে এ বিষয়ে গভীর সন্দেহ আছে।

যদিও ভবিষ্যৎ কর্মকৌশলের পরিকল্পনা নিয়েই সাংগঠনিক পার্টির সঙ্গে বামপন্থীদের প্রধান সংঘর্ষ বেধেছিল, খণ্ডযুদ্ধও কম হয়নি। তাতে নির্ভুলভাবে জানা যায় যে লাহোরে কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর মহলে কর্তৃত্বের মোহ বেশ দানা বেঁধে উঠেছিল। এই রকম কোন একটি খণ্ডযুদ্ধে "মঞ্চাধিকারী"দের স্বৈরাচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বাংলাদেশের ডেলিগেটদের সঙ্গে আমি অধিবেশন ত্যাগ করে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হই। তৎক্ষণাৎ প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার, ডাঃ আলম, স্বামী গোবিন্দানন্দ ও আরো

অনেকের নেতৃত্বাধীনে অন্যান্য প্রদেশের বামপন্থীরা তাঁদের সঙ্গে এসে যোগ দেন। স্থির হয় অসংবদ্ধ বামপক্ষকে পার্টিরূপে সুসংবদ্ধ করতে হবে, এবং একমাত্র এই উপায়েই "মতের স্বৈরাচার" দমন করা যেতে পারে। এই পার্টির নামকরণ হয় কংগ্রেস ডেমক্র্যাটিক পার্টি এবং লাহোরে নবগঠিত এই পার্টির পরিচালকদের যথারীতি নির্বাচিত করা হয়।

আপাতত আমাদের একটু থামতে হবে, কারণ পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর দিকে দৃকপাত করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে নিশ্চয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দেশবন্ধু দাশের মৃত্যুর পর থেকে স্বরাজ্যদলীয় নেতৃত্বের উপর মহলে সক্রিয়তার অভাব দেখা দিতে শুরু করেছিল। ১৯২৮ সালে এবং তার পরে গান্ধীবাদীদের দিক থেকে মিটমাটের জন্য যখন আরও প্রস্তাব আসতে লাগল, তখন স্বরাজ্যবাদী নেতৃত্বের সঙ্গে পুরোপুরি মিলন হয়ে গেল। মহাত্মা গান্ধী লাহোর কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট পদের জন্য পণ্ডিত জওহরলালের প্রার্থীতা সমর্থন করে এই মিলনকে দৃঢ় করেন। এর পরে যে সকল বৈপ্লবিক বা মৌলিক পরিবর্তনবাদীরা কোন অবস্থাতেই আপস মেনে নিতে রাজী ছিল না তারা ছাড়া আর সবাই নতুন এই গান্ধীবাদী-স্বরাজ্যবাদী-জওহরবাদী নেতৃত্বের আওতায় সমবেত হল। এমন কি কিছু কিছু বামপন্থীও পণ্ডিত জওহরলালের ব্যক্তিগত প্রভাবে পড়ে একই পথ অনুসরণ করল। পণ্ডিত জওহরলাল প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচিত হবার পর তাঁর নিজের সৃষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের সঙ্গে কার্যত সব সম্পর্ক ছিন্ন করে সে সময়-কার নতুন কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে চলতে শুরু করলেন।

এইভাবে স্বরাজ্য পার্টির অস্তিত্ব তার নিজের অধিনায়কের হাতেই লোপ পায় এবং তার কর্মপন্থাও বাতিল হয়ে যায়। অনুরূপভাবে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগও তার অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতার বিশ্বাসঘাতকতায় লোপ পায়। গান্ধীবাদী, জওহরবাদী ও স্বরাজ্যবাদী অনেকের মিলিত কঠিন ব্যূহের সামনে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসের মধ্যে যারা প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক নীতির সমর্থক ছিল, যাদের অধিকাংশই স্বরাজ্য পার্টির সঙ্গে

যুক্ত ছিল, তারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এসব সত্ত্বেও দুটি গুরুতর বাধার সম্মুখীন না হলে বামপক্ষের অগ্রগতি অব্যাহত থাকত। প্রথমত, সমস্ত বামপন্থীদের মিলনক্ষেত্র হবে বলে যে কংগ্রেস ডেমক্র্যাটিক পার্টির পত্তন হয়েছিল, তার অকালমৃত্যু। দ্বিতীয়ত, নতুন কংগ্রেস নেতৃত্ব ১৯৩০ সালের এপ্রিলে বিরাট আকারে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে বামপন্থী ভূমিকা গ্রহণ করল।

লাহোর কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই রাজদ্রোহের অভিযোগে আমি কারারুদ্ধ হই। গান্ধিজীর সঙ্গে মতভেদ হওয়ার দরুন শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার কংগ্রেস ত্যাগ করে গেলেন। ডাঃ আলম ধীরে ধীরে সাংগঠনিক কংগ্রেস নেতৃত্বের দিকে সরে যেতে লাগলেন। অতঃপর ১৯৩০-এর এপ্রিলে যখন গণ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়ে গেল, বামপন্থীরা সকলেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যতদিন সেই আন্দোলন চলছিল, নতুন পার্টি গঠনের কথা কেউ ভাবতেই পারেনি। এই অবস্থায় কংগ্রেস ডেমক্র্যাটিক পার্টির টিকে থাকা অসম্ভব হল।

১৯৩০-এর আন্দোলনের পরিণতি হল ১৯৩১ মার্চের গান্ধী-আরউইন চুক্তি। এই চুক্তি থেকেই বোঝা গেল কংগ্রেস নেতৃত্ব কখনই যথার্থ বামপন্থী ভূমিকা পালন করবে না। অতএব, এই দিক থেকে বিবেচনা করে দেখলে, বামপন্থী কার্যকলাপ আবার শুরু করার উপযুক্ত সময় এখনই। কিন্তু অন্যদিকে চুক্তির পরে জনসাধারণের মধ্যে গান্ধীর প্রভাব তখন আকাশচুম্বী। তাছাড়া লণ্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক যখন শেষ হয়ে গেল তখন প্রত্যেকে আশা করেছিল আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবে। অতএব ১৯৩১-এর মার্চ থেকে ১৯৩২-এর জানুয়ারী—এই সময়টাকে বামপক্ষ সংগঠিত করার কাজে লাগানো যায়নি। এই সময়ে ব্যক্তিগতভাবে বামপন্থীরা আইন অমান্য আবার যাতে শুরু হয় সেইজন্য জনসাধারণকে প্রস্তুত করার কাজে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল।

১৯৩২ সালে যে আন্দোলন হয় আসলে তা ১৯৩০-এর আন্দোলনেরই জের। তা সত্ত্বেও সন্দেহের অবকাশ আছে, এই

আন্দোলন একান্তই হত কিনা, যদি সীমান্ত প্রদেশে, যুক্ত প্রদেশে বাংলায় বামপন্থীরা সক্রিয় না থাকত। এই সব বামপন্থী কার্যকলাপের উদ্দেশ্য ছিল না নতুন পার্টি সংগঠিত করা, তার উদ্দেশ্য ছিল পুনরায় আইন অমান্যের জন্য দেশকে প্রস্তুত করা।

যতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস মরণ-বাঁচন সংগ্রামের মধ্যে লিপ্ত ছিল এবং মোটের উপর তার নেতৃত্ব ছিল সক্রিয়, ততদিন অভ্যন্তরীণ বিভেদ বৈষম্যগুলি চাপা ছিল এবং বামপক্ষের পক্ষে সুসংবদ্ধ হওয়া অসম্ভব ছিল। পিছু হঠার প্রথম লক্ষণ স্পষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ভিতর থেকে বিক্ষোভ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। ১৯৩২ সালের শেষাশেষি গান্ধিজী তখন জেলে এবং সেখান থেকেই হরিজন আন্দোলন শুরু করলেন। এই আন্দোলন এমন নতুন কোন ঘটনা নয়—আসলে হিন্দুদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য যে আন্দোলন ছিল তাকে জোরদার করা বা জাগিয়ে তোলার জন্যেই এই আন্দোলন। কিন্তু দেশ যখন রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রাণান্তকর অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলেছে তখন এই আন্দোলন শুরু করে গান্ধিজী আসল রাজনৈতিক সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে গেলেন। হরিজন আন্দোলন ছিল মূল সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদে গান্ধিজী যে অনশন করেছিলেন তারই অনুফল। তাঁর প্রতিবাদের কারণ ছিল বাঁটোয়ারা অনুন্নতশ্রেণী ও তপশীল জাতিগুলিকে মূল হিন্দু সমাজ থেকে পৃথকভাবে গণ্য করেছিল। এই অনশনের ফলে সাধারণের মন আইন অমান্য আন্দোলন থেকে অন্যত্র নিবিষ্ট হয় এবং স্বভাবত সেই আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। অনশন ও তার অনুফল হরিজন আন্দোলন থেকে বিচক্ষণ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা সন্দেহ পোষণ করেন যে, গান্ধিজী নিজের কাছেই হার মানতে শুরু করেছেন এবং এমন একটা নতুন পথের হদিস খুঁজছেন যা হরিজন আন্দোলনের মত অপ্রধান কোন ব্যাপারের মাধ্যমে জনসাধারনের উপর তাঁর প্রভাব বজায় রাখতে সক্ষম হবে।

তাঁরা খুব ভুল করেননি। ১৯৩৩ সালের মে মাসে মহাত্মা গান্ধী

আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করলেন। দক্ষিণে মোড় ফেরার এবং বামপক্ষের বিদ্রোহের এই সঙ্কেত পাওয়া গেল। স্থগিত রাখার ফলে মূল প্রশ্নগুলি বিশদ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ তীব্র হয়ে উঠল। দক্ষিণ পক্ষের মুখপাত্র হলেন নব্য সংসদ-পন্থীরা, যেমন মিস্টার ভুলাভাই দেশাই এবং ডাঃ আনসারি এবং প্রাচীন স্বরাজ্যবাদীরা, যেমন ডাঃ বি. সি. রায় এবং মিস্টার আসফ আলি।

আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার পর কংগ্রেস কিছুকাল অচৈতন্য অবস্থায় রইল। সংসদপন্থীদের মতে এই অচলাবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়, আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার আগে ১৯৩০-এর জানুয়ারিতে যে সংসদীয় পদ্ধতিকে পরিহার করা হয়েছিল তাতেই আবার ফিরে যাওয়া। যেহেতু গান্ধিজীর কোন বিকল্প পরিকল্পনা ছিল না তিনি সংসদপন্থীদের চাপে পড়ে তাদেরই মেনে নিলেন এবং সেই সময় মনে হয়েছিল কংগ্রেস বিশুদ্ধ নিয়ম-তান্ত্রিক এক সংস্থায় পরিণত হতে চলেছে।

কংগ্রেসের আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বামপন্থী একটা বিদ্রোহের অনিবার্য প্রয়োজন ছিল। ১৯৩৪ সালে লাগসই এক সময়ে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টিরূপে ও এই পার্টির নামে সেই বিদ্রোহ দেখা দিল। এখন, এই পার্টি কাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল? ১৯২৮-এর ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগপন্থীরা এবং ১৯২৯-এর কংগ্রেস ডেমক্র্যাটরা কি এই দলে যোগ দিয়েছিল?

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি যখন প্রথম পত্তন করা হয় তখন তার আবেদনের ক্ষেত্র অত্যন্ত ব্যাপক ছিল এবং তা সক্রিয় ও সম্ভাব্য সব বামপন্থীদেরই সহানুভূতি ও সমর্থন লাভ করেছিল। যে সব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগপন্থী ও কংগ্রেস ডেমক্র্যাট তখনও পর্যন্ত অবসর নেয়নি বা অন্যত্র চলে যায়নি স্বভাবত তারাও এতে যোগ দিল। কিন্তু এই সঙ্গে বিপুলসংখ্যক প্রভাবশালী প্রাক্তন গান্ধীবাদীদের এই দলভুক্ত হতে দেখা গেল। গান্ধীবাদের সাম্প্রতিক পর্যায়, তত্ত্ব ও পদ্ধতি উভয় দিক থেকে যথেষ্ট মোহভঙ্গ ঘটিয়েছে। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট

পার্টি একটা উচ্চ আদর্শ নিয়ে নেমেছিল। যে গান্ধীবাদ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে বলে প্রতিপন্ন হয়েছে এই পার্টি তার স্থলে দেশকে নতুন তত্ত্ব ও নতুন এক পদ্ধতি দিতে চেয়েছিল।

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছিল দুটি প্রশ্নের উত্তরের উপর। প্রথমত, তা কি দেশকে নতুন কোন তত্ত্ব, সেইসঙ্গে নতুন কোন পদ্ধতিও দিতে পারবে, এবং আপাতত ও শেষ পযন্ত তার কী ভূমিকা হবে সে বিষয়ে কি কোন বিশদ ধারণা দিতে সক্ষম হবে? দ্বিতীয়ত, নব গঠিত পার্টিতে বহুদিন আগে থেকে যারা বামপন্থীর ভূমিকা পালন করে আসছে তাদের সঙ্গে ভূতপূর্ব গান্ধী-বাদীরা কি হাত মিলিয়ে কাজ করতে পারবে?

শেষ পরিণতি যাই হোক কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি আরম্ভ করেছিল ভালভাবেই। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের তা একটা পরগাছা ছিল না, বিদেশ থেকে আমদানী কোন গাছের কলমও নয়। নিঃসন্দেহে তা দেশের ভিতর থেকেই উঠেছিল এবং এর সংগঠনে এমন ব্যক্তিদের দেখা গিয়েছিল যারা কংগ্রেস আন্দোলনের আগের পর্যায়গুলি পার হয়ে এসেছে এবং তার ফলে তারা অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। কিন্তু তার ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথে প্রথম থেকেই প্রধান অন্তরায় হয়ে দেখা দিল গান্ধীবাদ এবং সেই সঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মত কিছু স্বনামধন্য ও প্রভাবশালী নেতাদের সম্ভাব্য প্রভাব। পণ্ডিত নেহরু পার্টিতে যোগদান না করা সত্বেও তিনি যে এই পার্টির কয়েকজন নামকরা নেতাদের উপর তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করে পার্টিকে যথেষ্ট উৎসাহ অনুপ্রেরণা ও শক্তি দিয়েছিলেন একথা কারও কাছে গোপন নেই। কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি যদি এই বাধাবিপত্তি অতিক্রম করতে না পারে তাহলে তা আপাতত ও শেষ পর্যন্ত কী ভূমিকা পালন করবে, তার বিশদ ধারণা দিতেও যেমন সক্ষম হবে না, তেমনই নতুন কোন তত্ত্ব ও নতুন কোন পদ্ধতির প্রবক্তারূপে ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে তার আবির্ভাবের যৌক্তিকতাও তা বোঝাতে পারবে না।

১৯৩৪ সালে পার্টির যখন পত্তন হয়, আমি তখন ইওরোপে।

আমি "দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল্ ১৯২০-৩৪" বইটি ১৯৩৪-এর নভেম্বরে লেখা শেষ করি এবং বইটি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। সেই বইয়ে আমি পার্টিকে আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছিলাম। ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারিতে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণেও আমি আরো জোরের সঙ্গে এই মনোভাব ব্যক্ত করি।

বিশ্লেষণ করে দেখলে আমরা দেখতে পাই যে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি বাস্তবিকপক্ষে দেশকে নতুন কিছু দেয়নি। ১৯২৮ সাল থেকে পণ্ডিত জওহরলাল, লেখক এবং তাঁদের মত আরো অনেক বামপন্থী এই রকম সমাজবাদের কথা আগে থেকেই বলে আসছেন। অন্যান্য গোষ্ঠী ও দলের ভিতর দিয়ে এই বামপন্থার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী দিকটা ভারতীয় রাজনীতিতে অনেক আগে থেকেই প্রকট হয়েছে। এতৎ সত্ত্বেও সি. এস. পি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এক উদ্দেশ্য সাধন করেছিল। তা সমস্ত বামপন্থীদের সংহত হবার জন্য ডাক দিয়েছিল, এবং তার উদ্ভব হয়েছিল ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে এক শুভমুহূর্তে। ঘটনার সন্নিবেশ এমন সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল যে মনে হয়েছিল যে-ক্ষেত্রে অপরেরা আগে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে এই পার্টি তার ব্রত উদ্‌যাপনে সফল হবে। কতদিন আগে, ১৯২৮ সালে, আমি বুঝতে পারি দক্ষিণ-পন্থী সাংগঠনিক কংগ্রেস পার্টি দিনে দিনে বিপদের কারণ হয়ে উঠবে এবং একটা বামপন্থী পার্টি গঠন করা জরুরী প্রয়োজন। কিছুটা জেনে কিছুটা না জেনেই আমি অপর অনেকের সঙ্গে সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে কাজ করে গিয়েছি কিন্তু সার্থক হইনি। ১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সোশ্যালিস্টদের প্রয়াসে আরও আশাপ্রদ লক্ষণ দেখে স্বভাবত তা সোৎসাহ অভিনন্দনের যোগ্য বলেই মনে হয়েছিল।

১৯৩২-এর জানুয়ারি থেকে ১৯৩৭-এর মার্চ অবধি আমাকে হয় জেলে, না হয় নির্বাসনে কাটাতে হয়েছিল। ১৯৩৭ সালে আমি যখন আবার জনসেবায় আত্মনিয়োগ করার মত স্বাধীনতা লাভ করি, তখন কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি বেশ কিছুটা পরিণতি লাভ করেছে। ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮-এ নিজ চোখে দেখে মনে হয়েছে,

কিছুকাল থেকে সি. এস. পি,র অগ্রগতি একেবারে থেমে গেছে। লক্ষণ আশঙ্কাজনক, কারণ এগিয়ে চলার উদ্দীপনার অভাব মানেই অবক্ষয়ের সূত্রপাত। ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হরিপুরা কংগ্রেসের ঠিক পরেই সি. এস. পি,র অগ্রগণ্য সদস্যদের সঙ্গে আমার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। এবং সেই সময়ে তাঁদের সদস্য হিসাবে ন্যাশনাল ফ্রন্ট গোষ্ঠীর সদস্যরাও ছিলেন। কথা ওঠে এবং বিশদ আলোচনার পর সবাই মেনেও নেয়, পার্টির কাজে গুরুতর কোন ত্রুটি রয়ে গেছে, তখনকার কাজের পরিকল্পনাতেও কিছু ফাঁক রয়েছে, এবং অবিলম্বে ত্রুটিগুলি দূর করা দরকার। কংগ্রেসের মধ্যে এমন অনেক বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি রয়ে গেছে যারা সাংগঠনিক দলে নেই এবং যাদের টেনে আনা হয়নি যদিও তাদের দলে আনা একান্ত দরকার ছিল।

তখন পর্যন্ত সি. এস. পি. ব্যাপকভাবে সমাজতান্ত্রিক প্রচার চালিয়ে এসেছে। এই কাজটা ভালই হয়েছিল। কংগ্রেস কমিটির সভাসমিতিতেও তারা তাদের উপস্থিতি বুঝিয়ে দিত এবং পার্টির সদস্যরা যখন যেখানে সম্ভব হত মূল প্রস্তাব ও সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করে তাদের উগ্র মনোভাব জানিয়ে দিত। এতেও উপকার হত, কারণ কংগ্রেসীদেরও চাঙ্গা করার দরকার ছিল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কতকগুলি লক্ষণীয় ত্রুটি থেকে গিয়েছিল। প্রথমত, জনসাধারণ সি. এস. পি.র সদস্য ছিল না। এটি বরঞ্চ বাছা বাছা কয়েকজন ব্যক্তির পার্টি ছিল, অনেকটা গ্রেট ব্রিটেনের সোশ্যালিস্ট লীগ ও অনুরূপ সংগঠনের মত। দ্বিতীয়ত সাধারণ মানুষের মধ্যে সাংগঠনিক কাজের উপর তা যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি, যেমন কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে। যখন পার্টির পত্তন হয় তখন হয়ত বিভিন্ন মতাদর্শের কথা ভাবা হয়েছিল, পরে তা বাদ দেওয়া হয়। যাই হোক, ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালের মধ্যে যে সুনির্দিষ্ট পথকে সি. এস. পি. তার বিকাশের পথ বলে ধরে নেয় তাতে স্পষ্টত অনেক ত্রুটি ছিল এবং সেই পথ শেষ পর্যন্ত ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়। এই সব ত্রুটির কারণ ছিল সম্ভবত পার্টির লক্ষ্য ও

উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশদ চিন্তার অভাব এবং পার্টির অব্যবহিত ও চূড়ান্ত ভূমিকা সম্পর্কে বিভ্রান্তি ও বোঝার ভুল।

যতদিন সি. এস. পি. নতুন এক তত্ত্ব ও নতুন এক পদ্ধতির প্রতীক হয়েছিল, ততদিন তার উদ্ভব ও অস্তিত্বের একটা যৌক্তিকতা ছিল। অনেক ব্যর্থতা ও বহু ত্রুটি সত্ত্বেও গান্ধীবাদের একটা তত্ত্ব ও একটা পদ্ধতি ছিল। অতএব পরে যদি দেখা যায় তা অসঙ্গত ও ব্যর্থ, তাহলে নতুন কোন তত্ত্ব ও পদ্ধতি ছাড়া আর কিছু দিয়েই সেই অভাব পূরণ করা যায় না। লেখকের এ কথা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে, যখন সি. এস. পি. প্রথম সৃষ্ট হয় তখন অনেকেরই তা মনে হয়েছিল। কিন্তু পার্টিকে গড়ে তোলার ভার যাদের উপর দেওয়া হল তারা তাকে সম্পূর্ণ ভুল পথে চালিত করেছে। জনসাধারণ মানুষের চোখে সি. এস. পি. গান্ধীবাদের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে এবং সম্ভবত কংগ্রেস সংগঠনকে কিছুটা চাঙ্গা করা ছাড়া বাস্তবিকপক্ষে তার কাছে আর কিছু প্রত্যাশা করারও নেই। কিন্তু কংগ্রেসকে কেবলমাত্র চাঙ্গা করা ছাড়াও আরও অনেক কিছু করবার জন্য কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির সৃষ্টি হয়েছিল এবং যদি তা সেই বৃহত্তর কর্তব্য সম্পাদন না করে, অন্য কোন সংগঠনকে সেই কর্তব্য পালন করতে হবে। কোন কারণেই প্রগতির চাকা এক জায়গায় দীর্ঘকাল আটকে থাকতে পারে না।

কংগ্রেসকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বরাবরের মত এখনও এটি এমন একটি সুনির্দিষ্ট পার্টি যার উপরে একজন নেতা আছেন এবং যার নিজস্ব একটি সংগঠন আছে; তাকে বলা যেতে পারে কায়েমী দল বা গান্ধী পার্টি অথবা দক্ষিণপক্ষ। দলের মধ্যে তার যে নিয়মশৃঙ্খলা তা প্রশংসনীয় এবং জনসাধারণের মধ্যে তার বিপুল প্রভাব, এবং সেই প্রভাব বৃদ্ধির জন্য বরাবর সযত্ন প্রয়াস করা হয়ে থাকে। তার আয়ত্তাধীনে আছে তহবিলের অর্থ এবং কংগ্রেস সংগঠন ছাড়াও আছে সহায়ক নানা সংগঠন যাদের মারফৎ কংগ্রেস কাজ করে। বৎসরের পর বৎসর ধরে এই পার্টি সংহত হয়ে উঠছে এবং এই সংহতি

বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯৩৭ সালে তার সদস্যরা প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করার পর থেকে। ক্ষমতার আস্বাদ পেয়ে এই পার্টি আগের থেকে অনেক বেশী কর্তৃত্বকামী ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েছে তো বটেই, সেইসঙ্গে আরও ক্ষমতালোভী হয়ে উঠেছে।

তাহলে এই পার্টি নতুন ভারত গড়ে তোলার কর্তব্য সম্পাদন করতে সক্ষম হবে, আমরা কি তা বিশ্বাস করব? যদি তাই করি তাহলে আমাদের উচিত হবে সম্পূর্ণভাবে তার প্রতি আমাদের আনুগত্য জানানো এবং যেটুকু বিরোধিতা আমরা করতে পারি তা "বন্ধুসুলভ" সমালোচনা করা। কিন্তু যদি আমরা বিশ্বাস না করি তাহলে উপায় কী? তাহলে নতুন কোন পার্টির দরকার হবে, যে পার্টি বিকল্প তত্ত্ব ও নতুন পদ্ধতি দিতে পারবে। এইরকম পার্টির দুটি ভূমিকা পালন করতে হবে—একটি এখনকার জন্য, আরেকটি দূর ভবিষ্যতের জন্য। এই ভূমিকা দুটি পালন করার জন্য নতুন পার্টিকে গণভিত্তিক হতে হবে এবং গান্ধীবাদীরা আজ যতখানি গণভিত্তি দাবি করতে পারে তার চেয়েও আরও ব্যাপক করতে হবে সেই গণভিত্তি। এই গণভিত্তি একমাত্র তখনই সম্ভব যদি সেই পার্টি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার চালায় এবং জনসাধারণকে সদস্যভুক্ত করে। গ্রেট ব্রিটেনের সোশ্যালিষ্ট লীগ বা ভারতের বর্তমান সি. এস. পি.র মত কোন সংগঠনের পক্ষে গণআন্দোলনের উদ্যোক্তা বা মুখপাত্র হওয়া কখনই সম্ভব নয়। তা শূন্যস্থিত এমন একটা পদার্থ হয়ে থাকবে যার মাটিতে কোন শিকড় নেই।

এই রকম পার্টির কী ভূমিকা হওয়া উচিৎ সে সম্পর্কে যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। বস্তুতপক্ষে এই পার্টিকে দুটি ভূমিকা পালন করতে হবে—একটি অব্যবহিত আরেকটি চূড়ান্ত। অব্যবহিত ভূমিকা আপসহীন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ভূমিকা। চূড়ান্ত ভূমিকার লক্ষ্য সংগ্রাম পরবর্তী সময়। জাতীয় পুনর্গঠনের সেই সময়কার ভূমিকা হবে সমাজতান্ত্রিক ভূমিকা। সংগ্রামের সময় সমাজতান্ত্রিক প্রচার চালান যেতে পারে এবং চালানো উচিত, কিন্তু তখন পার্টির ভূমিকা

সমাজতান্ত্রিক নয়, তা হবে আপসহীন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী। সি. এস. পি. নেতাদের অনেকের মধ্যেই এই ভুল ধারণা আছে যে, পার্টির কাজ হচ্ছে কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক প্রচার চালিয়ে যাওয়া এবং সেই সঙ্গে কংগ্রেস সংগঠনকে চাঙ্গা করে তোলা। অন্যতম প্রধান কারণ এই, যার জন্য পার্টির ভরাডুবি হয়েছে।

গান্ধীবাদে যাদের অন্ধ বিশ্বাস নেই তাদের কর্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তাদের কর্তব্য যথার্থ একটি বামপন্থী পার্টি গড়ে তোলা, তাতে আধুনিক রাজনৈতিক পার্টির বিস্তারিত সব বিধিব্যবস্থা থাকবে। এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হতে হবে যে, যে মুহূর্তে এই প্রয়াস করা হবে তখনই কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের আক্রোশ নেমে আসবে। এর চেয়েও বড় কথা, সদ্যজাত এই পার্টিকে পিষে মারার জন্য সব রকম নীচ, নির্লজ্জ, হিংসাত্মক পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে। গত আঠারো মাসের ঘটনাবলী থেকে বোঝা যায় গণ্যমান্য অনেক বামপন্থী নেতা দক্ষিণপন্থীদের এই ধরণের আক্রমণ আন্দাজ করতে পারেননি। এই ভুল যেন ভবিষ্যতে আর না হয় এবং অতীতের অভিজ্ঞতার শিক্ষায় বর্তমানে সবাই যেন আরও বিজ্ঞ হয়ে ওঠে।

পাঠকদের স্মরণে থাকতে পারে, সি. এস. পি.র সদস্যদের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়েই কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের (অথবা গান্ধীবাদী নেতৃত্বের) সংঘর্ষ বাধে। কংগ্রেস সোশ্যালিস্টদের সমর্থন জানাতে গিয়ে পণ্ডিত জওহরলালকেও নাজেহাল হতে হয়েছিল। ১৯৩৬, ১৯৩৭ সালে যখন তিনি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট তাঁর অবস্থা মোটেই সুখকর ছিল না এবং গান্ধীবাদীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করবার জন্য সি. এস. পি.র প্রতি তাঁর সমর্থনের মাত্রাটা তাঁকে বেশ কমিয়ে আনতে হয়। কংগ্রেস সোশ্যালিস্টদের দিক থেকেও, যখন তারা হাই কমাণ্ডের আক্রোশ মর্মে মর্মে বুঝতে পারল, তারা সাহসের সঙ্গে রুখে তো দাঁড়ায়ইনি, বরঞ্চ তারা জেনে হোক বা না জেনে হোক এমন জায়গায় সরে যেতে লাগল যাতে গান্ধী শিবিরের পাণ্ডাদের কাছে তা তত আপত্তিজনক বলে গণ্য না হয়। গান্ধীবাদীরা তা লক্ষ্য

করে এবং সেই কারণে দ্বিগুণ উৎসাহে বামপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের জেহাদ চালিয়ে যায়।

সি. এস. পি.র পক্ষ থেকে এমন কোন উক্তি করা হয়নি বা বিবৃতি দেওয়া হয়নি যার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের ভবিষ্যতের স্বার্থে এই পার্টি বিপজ্জনক। কংগ্রেস হাই কমাণ্ড যথেষ্ট নিশ্চিন্ত হয়েছিল এবং অতঃপর দেখা গেছে গান্ধীবাদী ব্যক্তি-বিশেষ স্বতন্ত্রভাবে কংগ্রেস সোশ্যালিস্টদের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। উচ্চতম মহল থেকে এই সব প্রশংসা তাদের রাজনৈতিক কবরের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিল। ভোল ফেরানোর ন্যায়সঙ্গত একটা যুক্তি দেখাবার জন্য কংগ্রেস সোশ্যালিস্টরা "ঐক্যের" শ্লোগান আবিষ্কার করে ঢাক পিটিয়ে তাই সবাইকে শোনাতে লাগল—আসলে কিন্তু এটি নিরাপত্তার একটা ফিকির ছাড়া কিছুই নয়। একতার এই নতুন ব্যাখ্যার ফলে সি. এস. পি.কে এমন অবস্থায় আসতে হল যখন আইনসভার মৃদুমন্দ বিরোধিতার ভূমিকা গ্রহণ করতেও তাদের সাহসে কুলাল না—কারণ সংসদীয় বিরোধী পক্ষকেও কোন কোন সময়ে অধিষ্ঠিত সরকারকে গদীচ্যুত করে সরকারি দায়িত্ব নিজেদের নিতে হয়। শেষ পর্যায়ে এমন খোলাখুলিভাবে সি. এস. পি হাই কমাণ্ডের অনুগ্রহ লাভের জন্য তোষামোদ শুরু করে যে, যদি তারা হাই কমাণ্ডের সমালোচনায় একটা কথা বলে ফেলে, তা চাপা দেবার জন্য সমর্থনে একশো কথা বলে এবং উপরন্তু উচ্ছ্বসিত ভাষায় জানিয়ে দেয়, মহাত্মা গান্ধীর উপর তাদের কতখানি আস্থা ও বিশ্বাস আছে।

এখানে বলে রাখা উচিত, সি. এস. পি'র উপর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বরাবর সক্রিয় প্রভাব ছিল। প্রধানত তাঁরই চেষ্টায় ১৯৩৪ সালে পার্টির সৃষ্টি হয় এবং তদবধি পার্টির ভাগ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনিই নিয়ন্ত্রণ করে আসছেন। ১৯৩৭ সালের পর গান্ধীবাদী শিবিরে তাঁর ক্রমিক প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সি. এস. পিও তাঁকে অনুসরণ করেছে। ফলত আমরা দেখছি, পণ্ডিত নেহরুর

এবং সি. এস. পি দলভুক্ত ভূতপূর্ব গান্ধীবাদীদের প্রভাব এত প্রবল যে আজ বলতে ইচ্ছা করে, সি. এস. পি গান্ধীবাদীদেরই একটা শাখা সংগঠন।

অযোগ্য নেতৃত্ব কিভাবে একটা মহৎ পার্টির ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিতে পারে সি. এস. পি তার দৃষ্টান্ত। যদিও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানা মতবাদের বা তত্ত্বের প্রভাবকে তুচ্ছ করা যায় না, তৎসত্ত্বেও মানুষের গুরুত্বকে অগ্রাহ্য করা চলে না। ভাবতে অবাক লাগে, ইওরোপের একালের রাজনৈতিক পার্টিগুলির দশা কী হত যদি তাদের সঙ্গে অনন্যসাধারণ নেতাদের ব্যক্তিত্ব জড়িত না থাকত।

ভবিষ্যতে কেউ যেন বামপন্থী ভূমিকা পালন করার অথবা বামপন্থী পার্টি গঠন করার কথা চিন্তাও না করে যদি সে কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের জঘন্যতম আক্রমণের জন্য প্রস্তুত না হয়। যে বিরোধিতা হাই কমাণ্ডের ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক সেই বিরোধিতাকে পিষে মারার জন্য তারা যে কোন কাজ করতে পারে। এবং তখন তারা "নিয়মানুবর্তিতা"র শ্লোগান আওড়াবে—ঠিক যেমন "ঐক্যে"র বুলির আড়ালে সি. এস. পি কাজ করেছে।

নিরাপত্তার প্রয়োজনে গা-ঢাকা দেবার একই তাগিদ থেকে ১৯৩৯-এর ৯ই জুলাই থেকে কমরেড এম. এন. রায় এবং তাঁর র‍্যাডিক্যাল লীগের যাবতীয় প্রয়াস চলেছিল।

জেলের চিঠি

শেষ কারাবাস থেকে নেতাজীর লিখিত চিঠিগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত সাতটি চিঠি উদ্ধৃত হচ্ছে। এর মধ্যে চারটি তাঁর দাদা শরৎচন্দ্র বসুকে এবং বাকি তিনটি মুকুন্দলাল সরকার, বরদা প্রসন্ন পাইন ও সর্দার শার্দুল সিং কবিশেখরকে লিখিত।

১

'সেন্সরকৃত ও ছাড়প্রাপ্ত'

দুষ্পাঠ্য, ২৮।১০ ছাড়প্রাপ্ত

ডি. সি. এস. বি. পক্ষে দুষ্পাঠ্য ৩০।১০।৪০

লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্নেল, আই. এম. এস.

প্রেসিডেন্সি জেল

কলিকাতা,

২৪. ১০. ৪০

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

মেজদাদা, কদিন আগে তোমার দেরাদুনের ঠিকানায় তোমাকে আমার বিজয়ার প্রণাম জানিয়েছি। এর মধ্যে নিশ্চয় তুমি সে চিঠি পেয়েছ।

তোমাকে লেখা মৌলানা আবুল কালামের চিঠির কথা এই কদিন ধরে ভাবছি। ওই সঙ্গে স্বর্গত শ্রীযুক্ত ভি. জে. প্যাটেলের উইল নিয়ে মৌলানা আবুল কালাম ও সর্দার বল্লভভাইয়ের মধ্যে যে পারস্পরিক তারিফ চলেছে সে কথাও মনে হচ্ছে।

প্রথমটা সম্পর্কে তোমার কী মনে হয়েছে আমি জানি না, তবে আমার যা মনে হয়েছে, তার কদর যাই হোক, তোমাকে জানাচ্ছি। বঙ্গীয় আইন পরিষদের পরবর্তী অধিবেশনের যখন দেরি নেই, আমার মনে হয় পরিষদ থেকে ইস্তফা দেওয়া তোমার উচিত হবে না। তবে 'সুবিধামাফিক সময়ে ইস্তফা দিয়ে তুমি কংগ্রেস হাই কমাণ্ডকে চ্যালেঞ্জ করতে পার, তারা নির্বাচনের শক্তি পরীক্ষায় তাদের সেরা

লোককে তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যেন দাঁড় করায়। সুবিধামাফিক সময় হবে পরের অধিবেশনের শেষ দিন—অবশ্য দেখতে হবে যাতে পরবর্তী অধিবেশনের আগে আরেকবার নির্বাচনের সময় পাওয়া যায়। যদি বোঝ তাহলে সুবিধামাফিক সময়ে তোমার পদত্যাগ করার কথা আগেই জানিয়ে দিতে পার।

আর সবের তুলনায় এটা অবশ্য সামান্য ব্যাপার। যে প্রশ্নটা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ তা এই, আমরা কোথায় চলেছি—আমরা বলতে কংগ্রেসের কথা বলছি। একে একে লোকেরা—কখনো কখনো বিশিষ্ট লোকেরা, যারা দেশের সেবা করেছে, দুঃখকষ্ট সয়েছে, ত্যাগ-স্বীকার করেছে,—তারা বিরক্ত হয়ে কংগ্রেস ছেড়ে দিচ্ছে। এর ফলে যে ক্ষতি হয়েছে অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে তা পূরণ করা সম্ভব হয়নি, নিকট ভবিষ্যতে সেরকম কোন সম্ভাবনা আছে বলেও মনে হয় না। তাছাড়া, কোন নতুন লোক কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছে, আমার নজরে পড়েনি।

মহাত্মা গান্ধী সম্ভবত বুঝতে পেরেছেন, তাঁর দলের পক্ষে এই ভাঙনের ফল হবে মর্মান্তিক, এবং সেইজন্যই বিনা শর্তে সহযোগিতা করার যে মনোভাব তাঁর প্রথমে ছিল তা ত্যাগ করে তার বদলে বাছাই করা কয়েকজনকে দিয়ে আইন অমান্য শুরু করে নিজেকে ও তাঁর দলের লোকদের মুখ রক্ষা করতে চেয়েছেন। কিন্তু তা কি চোখে ধুলো দেওয়া নয়? এ সহযোগিতাও নয়, গণসংগ্রামও নয়। এতে কেউই খুশি নয় এবং এর ফলে আমরা যেখানে ছিলাম সেখানেই থাকব। তাছাড়া স্বরাজের সঙ্গে এই আন্দোলনের কোন যোগ নেই। এতে আমাদের দেশবাসীর একটা অংশকে শুধু ধোঁকা দেওয়া চলতে পারে যারা সরল বিশ্বাসে মনে করে গান্ধিজী যখন আছেন তিনি কাজের কাজ কিছু একটা করছেন।

সহযোগিতা বোঝা যায়। যতই অসঙ্গতি থাক রায়পন্থাও বোঝা যায়। গণসংগ্রামও বোঝা যায়। কিন্তু এটা কি? এও নয়, ও-ও নয়, কী যে, বোঝা ভার।

গান্ধীবাদের হালফিল পর্বে দেখা যাচ্ছে ধর্মের খোলসে ঢাকা ভণ্ডামি (প্যাটেলের উইলের ব্যাপার), গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ এবং রাজনীতির দুর্বিপাক থেকে উদ্ধারের অদ্ভুত ও দুর্বোধ্য সব নীতি নির্দেশ (হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রজাদের কাছে দেওয়া উপদেশ)। এসব সত্যিই পীড়াদায়ক। বাধ্য হয়ে ভাবতে হয় ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে বড় বিপদ কোন্‌টা—ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র, না, গান্ধীবাদী মোড়লিতন্ত্র। যে আদর্শবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বাস্তবের সম্পর্ক নেই এবং ধর্মীয় ভাবাবেগে ভরা ফাঁকা বুলি ছাড়া যার মধ্যে আর কিছু নেই তার কাছ থেকে কখনো সুফল পাওয়া যেতে পারে না।

এই ধোঁকাবাজি কাউকেই ঠকাতে পারবে না—সরকারকেও না, জনসাধারণকেও না—কারণ দুনিয়াটাকে আমাদের এদেশী মোড়লরা যতটা বোকা বলে মনে করে তা ততটা নয়। দৃঢ়সংকল্প নিয়ে আমাদের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। সেদিন দূরে নেই যখন এই ধরনের গান্ধীবাদের খোলস খসে পড়বে। মৌলানার হুমকিকে তুমি সমুচিত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যে অগ্রাহ্য করেছ, এতে আমি খুশি হয়েছি।

আশা করি ওখানে তোমাদের সকলের, বিশেষ করে মেজবৌদির, স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে। তোমরা ফিরছ কবে ? তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, আগে শরীরটা সারিয়ে তোল। দেখছি খবরের কাগজের লোকেরা ওখানেও তোমার কাছে হানা দিয়েছে। ফরওয়ার্ড ব্লক-এর লোকেরাও তোমার কাছে জুটেছে নাকি ? ওই সব অঞ্চলে সাধারণের মধ্যে আমরা অত্যন্ত জনপ্রিয়।

কেন্দ্রীয় আইনসভায় দাঁড়াবার জন্য আমাকে সবাই বিশেষ করে ধরেছে। আমি রাজী হয়েছি। আজ এই পর্যন্ত।

তোমার স্নেহের
সুভাষ

পুনশ্চ : বিজয়ার উপহারের জন্য কিছুদিন আগে মৌলানাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওয়ার্ধায় টেলিগ্রাম করেছি।

সুভাষ

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু
রয়াল হোটেল
দেরাদুন, উত্তর প্রদেশ

২

সেন্সরকৃত ও ছাড়প্রাপ্ত

দুষ্পাঠ্য ৪।১১ ছাড়প্রাপ্ত
ডি. সি. এস. বি.-র পক্ষে দুষ্পাঠ্য
লেফটেন্যান্ট কর্নেল, আই. এম্. এস.
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট,

প্রেসিডেন্সি জেল
কলিকাতা,
৩০. ১০. ৪০

পরম পুজনীয় মেজদাদা,

আমার বিজয়ার চিঠি এবং তার পরে যে চিঠি দিয়েছি নিশ্চয় তুমি পেয়েছ। দেরাদুনে গিয়ে তোমার ও মেজবৌদির কোন উপকার হল কিনা ভাবছি। আশা করি হয়েছে।

কেন্দ্রীয় আইনসভায় আমার নির্বাচনের কথা খবরের কাগজে নিশ্চয় পড়েছ। আশা করি কংগ্রেস হাই কমাণ্ড এর থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা পেতে দেরি করবে না।

কংগ্রেস রাজনীতি সম্পর্কে যত ভাবছি ততই আমি সুনিশ্চিত হচ্ছি, ভবিষ্যতে হাই কমাণ্ডের সঙ্গে লড়াই করতে আমাদের আরও সময় ও শক্তি দিতে হবে। স্বরাজ পাবার পর এইরকম নীচ, প্রতিহিংসাপরায়ণ, বিবেকবর্জিত লোকদের হাতে ক্ষমতা এলে দেশের

হাল কী হবে ? আমরা এখন এদের সঙ্গে লড়াই না করলে, এদের ক্ষমতায় আসা আমরা ঠেকাতে পারব না। আরও একটা কারণে এদের সঙ্গে এখনই আমাদের লড়াই করা উচিত। জাতীয় পুনর্গঠনের কোন ধারণাই এদের নেই। স্বাধীন ভারতকে যদি গান্ধীবাদী, অহিংস নীতিতে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়, তাহলে গান্ধীবাদ স্বাধীন ভারতকে দয়ে মজাবে। তাহলে যে সব শক্তি ওত পেতে রয়েছে, তাদের কাছে ভারত সব সময়ের শিকার হয়ে থাকবে। কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সঙ্গে এখনই লড়াই করার জন্য এবং লড়াই শেষ অবধি চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমাদের একাগ্র হতে হবে, যেখানে এবং যখনই সম্ভব অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে এই উদ্দেশ্যে আমাদের হাত মেলাতে হবে।

কোলন ও এপেণ্ডিক্সের কাছে পেটের একটা ব্যথার দরুন গত সপ্তাহে আমি তেমন সুস্থ ছিলাম না। ব্যথাটা আপাততঃ একটু কমেছে। এই চিঠি আমি উডবার্ন পার্কের ঠিকানায় পাঠাচ্ছি, কারণ আমি জানি না কবে তোমরা ফিরে আসবে। প্রণাম জেনো।

তোমার স্নেহের

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সুভাষ

কলিকাতা।

৩

সেন্সরকৃত ও ছাড়প্রাপ্ত

দুষ্পাঠ্য ২৬।১১

ডি. সি. এস. বি.র পক্ষে

প্রেসিডেন্সি জেল

কলিকাতা,

১৫. ১১. ৪০

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আজ বিমান ডাকে অমিয়কে আমি চিঠি লিখছি, তাতে অল্প কথায় আমার মামলার বিবরণ এবং তাতে যে অবৈধতা ও

অন্যায্যতা রয়েছে তার উল্লেখ থাকছে। তুমিও তাকে এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে একটা চিঠি লিখে বিমান ডাকে পাঠিও। আমি চাই অমিয় এই খবর পার্লামেণ্টের ভিতরে এবং বাইরে আমার যে বন্ধুরা আছেন তাঁদের কাছে পৌঁছিয়ে দিক। মিস্ আগাথা হ্যারিসন, কৃষ্ণ মেনন ও আর আর বন্ধুরা যাঁরা ইণ্ডিয়ান কন্‌সিলেয়েশন গ্রুপ, ইণ্ডিয়া লীগ ইত্যাদিতে আছেন তাঁদের মারফত সহজেই এ কাজ হতে পারে।

অনেক লোকই এ সম্পর্কে দারুণ আগ্রহী হবে—যদি একবার শুধু তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছয়। যেমন ধর, মিঃ থার্টল্, এম. পি., ল্যান্সবেরির জামাই, যিনি কলকাতায় তোমার অতিথি ছিলেন—অথবা মিঃ গ্রীন্‌উড, এম. পি., যিনি এখন কেবিনেটে আছেন এবং ১৯৩৮-এ লণ্ডনে আমাকে সাধারণের তরফ থেকে যে সংবর্ধনা জানানো হয়, সেই অনুষ্ঠানে যিনি সভাপতিত্ব করেন—অথবা নিউজ্ ক্রনিক্‌ল্-এর মিঃ ভেরনন্ বার্টলেট, যাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ক্রনিক্‌ল্ হাউসে স্যার ওয়াল্টার লেটন-এর ভোজসভায় এবং পরে কলকাতায় চায়ের আসরে—অথবা মিঃ সোরেনসেন এম. পি., ভারত বিষয়ে যাঁর কৌতূহলের শেষ নেই এবং যাঁর সঙ্গে লণ্ডনেই আমার পরিচয় হয়।

আমি জানি না আজকাল বিমান ডাকে লণ্ডনে চিঠি পৌঁছতে কত সময় লাগে। যদি তোমার মনে হয় নিশ্চয় দেরি হবে তাহলে বরঞ্চ কেব্‌ল্ করে দিও।

আমি অমিয়কে বলে দিচ্ছি আমার দু-তিনজন বন্ধুর কাছে আমার চিঠিটা পৌঁছিয়ে দেওয়া ছাড়া তাকে আর কিছু করতে হবে না। অমিয়র এই ব্যাপার নিয়ে আর বিব্রত থাকার দরকার নেই।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তোমার স্নেহের
১, উডবার্ন পার্ক সুভাষ
কলিকাতা

৪

সেন্সরকৃত ও ছাড়প্রাপ্ত

দুষ্পাঠ্য ২০।১১
ডি. সি. এস. বি.-র পক্ষে

ছাড়প্রাপ্ত
দুষ্পাঠ্য

প্রেসিডেন্সি জেল
কলিকাতা
১৭. ১১. ৪০

জরুরী

পরম পূজনীয় মেজদাদা,

আমার সিনিয়র অ্যাডভোকেট দুজনই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি বরোদাবাবু ও সন্তোষবাবুর কথা বলছি। আশা করি তাঁরা শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন। আলিপুরে আমার মামলার তারিখ এ মাসের ২৩ তারিখে, সেই মামলায় বরোদাবাবু আছেন। ২৩ তারিখের মধ্যে বরোদাবাবু যদি সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়ে ওঠেন, ওই দিনের অন্য কোন ব্যবস্থা ক'রো।

আশা করি এর মধ্যে তুমি আমার ২৪।১০ ও ৩১।১০ তারিখের চিঠি পেয়েছ। ওয়ার্ধা প্রহসনের দ্বিতীয় দৃশ্য এখন শুরু হয়েছে।

গত ২।৩ দিন থেকে কোমরে সায়টিকার মত একটা ব্যথা বোধ করছি। সহজে চলাফেরা করতে পারছি না, তবে এখনও পর্যন্ত ভাবনার কোন কারণ নেই। আশা করি তোমরা সবাই ভাল আছ। মা কেমন আছেন ?

তোমার স্নেহের
সুভাষ

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু
১, উডবার্ন পার্ক
কলিকাতা।

৫

সেন্সরকৃত ও ছাড়প্রাপ্ত

দ্রষ্টব্য ছাড়প্রাপ্ত

ডি. সি এস. বি.-র পক্ষে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, প্রেসিডেন্সি জেল

লেফটেন্যাণ্ট কর্নেল, আই. এম. এস.

প্রেসিডেন্সি জেল

১১. ১১. ৪০

সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত

প্রিয় মুকুন্দবাবু,

গত পরশু আপনার ১১ই নভেম্বর তারিখের চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। আশা করি এখন ভাল আছেন।

জেলে আমার সঙ্গে আপনি যখন দেখা করতে এসেছিলেন, তখন আমি ভালই বোধ করছিলাম। তার পরে আমার সায়টিকা বা ওই ধরনের একটা কিছু হয়েছে। এখন পর্যন্ত অল্পের উপরেই আছে—যাতে না বাড়ে সেইজন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। আগেও এর জন্য কয়েকবার আমাকে বেশ ভুগতে হয়েছে। সে কথা আমার মনে আছে, আবার সেই ভোগান্তি ভোগবার ইচ্ছা আমার নেই।

আমার যখন স্বাধীনভাবে কিছু করার উপায় নেই, তখন বাইরের বন্ধুদের জন্য কি করে আপনার কাছে বাণী পাঠাব ?

সর্দার শার্দূল সিং-এর চিঠি আমি পেয়েছি, আশা করি তিনিও আমার চিঠি পেয়েছেন। গান্ধীজির কাছে টেলিগ্রামে তিনি যদি আমার কথা উল্লেখ না করতেন তাহলে আমি আরও বেশি খুশি হতাম। নিজে সম্পূর্ণ বুঝিয়ে না বললে ভুল বোঝার সম্ভাবনা থেকে যায়। জেলে থাকাকালে তা করা খুবই মুশকিল।

অনেক দ্বিধা-সংকোচের পর আপনাকে কিছু নির্দেশ দিচ্ছি। যা বলছি, তা সম্পূর্ণ আপনার জন্য, গোপনীয় এবং অপরের জ্ঞাতব্য নয়। আমি মুক্ত থাকলে সাধারণ নির্দেশ দিতে পারতাম, কিন্তু

এখানে থেকে তা করতে পারি না। তাহলে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। আমরা ওয়ার্ধার আদেশে চলি না। অতএব গান্ধিজী যাই করুন না কেন, আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেকে ধরা দেবার কোন বাধ্যবাধকতা আপনার নেই। যেমন চলছেন তেমনই চালিয়ে যান। অতীতে আমরাই খেটেছি, আমরাই কষ্ট সয়েছি এবং অপরে তার সুফল ভোগ করেছে। কিন্তু কতদিন তা চলবে? আজ এই পর্যন্ত।

আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানবেন।

আপনাদের
সুভাষচন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল সরকার
৩৭ কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা।

[[illegible] কংগ্রেসনেতা ও খ্যাতনামা আইনজীবি শ্রীবরদাপ্রসন্ন পাইনকে লেখা এই চিঠিটি এ-যাবৎ [illegible] ছিল। শি. ক. ব.]

প্রেসিডেন্সি জেল
২৯. ১০. ৪০

প্রিয় বরদাবাবু,

আজ সকালের খবরের কাগজ দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল স্বর্গত বাবু সূর্যকুমার সোম-এর কথা। তিনি শুধু আমার মত দেশবন্ধুর একজন শিষ্যই ছিলেন না, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুও ছিলেন। তাঁর মৈমনসিংহের বাড়িতে কতবার যে তাঁর সাদর আতিথ্য গ্রহণ করেছি কখনই আমি তা ভুলতে পারব না। শেষবার যখন আমি মৈমনসিংহ যাই তিনি সপরিবারে শহরের বাইরে ছিলেন, তবু খালি বাড়িতেও আমি সমান আতিথ্য লাভ করি। সূর্যবাবুর অকাল-মৃত্যুতে যে শূন্যতা সৃষ্ট হল তাঁর এলাকায় সে শূন্যতা অপূরনীয় থেকে যাবে।

অন্য প্রসঙ্গে আসার আগে, আপনাকে শ্রীযুক্ত মজুমদার, শ্রীযুক্ত

নিয়োগি ও শ্রীযুক্ত গুহ নির্বাচনে তাঁদের প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে যে ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য আমার তরফ থেকে তাঁদের ধন্যবাদ জানাবেন। আজ সকালের কাগজে শ্রীযুক্ত গুহ যে চিঠিটি প্রকাশ করেছেন তার জন্যে বিশেষ করে শ্রীযুক্ত গুহকে ধন্যবাদ জানাবেন। আন্তরিকতায় ভরা বিবৃতিটিতে হৃদয়ের যে ঔদার্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করছি। আপনি তাঁকে এই কথা বলতে পারেন, কখনই আমার ক্ষেত্রে তিনি এই ঔদার্যের অভাব দেখতে পাবেন না।

বন্দীদশায় থাকার দরুন কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব কিনা সে সম্পর্কে আমার বন্ধু ও সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই এই আকস্মিক সিদ্ধান্তে অনেকেই যদি অবাক হয়ে থাকেন আমি আশ্চর্য হব না। জেলখানা থেকে লেখা চিঠিতে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় কোন কোন বিষয় বিবেচনা করে আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তবে আমি স্থির নিশ্চিত, রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিমাত্রই স্বাভাবিক বোধ থেকে বুঝতে পারবেন কি কারণে আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং বুঝে মনে প্রাণে আমাকে অনুমোদন করবেন। এই চিঠিতে আমার বিবেচনার দু-একটি বিষয়ের কথা শুধু বলছি। মামলাসূত্রে পরের বার আপনার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হবে তখন এই কথা আপনাকে জানাতে পারতাম, কিন্তু তা আমার দিক থেকে সঙ্গত বা সমুচিত হত না। এইসব ভেবে এই চিঠি লিখছি।

আমার নির্বাচনের অন্যতম ফল হবে এই যে, মৌলানা আজাদ এবং আর আর যাঁদের তিনি প্রতিনিধিত্ব করছেন এই থেকে তাঁদের চোখ খুলে যাবে। বি. পি. সি. সি.-র উপর আক্রমণ চালাতে গিয়ে একেবারে নাজেহাল হওয়ায় এবং নিজের অবস্থার পরিণতি হাস্যকর পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে দেখে মৌলানা ভেবেছেন আমাদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আইন পরিষদীয় ফ্রন্টে আক্রমণ চালাবেন, যাতে সাধারণের চোখে আমাদের মাথা নিচু হয়ে যায়।

তাঁর আরও একবার ভুল ভাঙতে বাকি আছে। তাঁর একেবারে সাম্প্রতিক আক্রমণ—আমি এবার নাম দিয়েছি বিজয়ার উপহার—ইতিমধ্যেই দেশের পাঁচজনের কাছে আমাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি বাড়িয়ে দিয়েছে, এবং যারা মুখে সত্য ও অহিংসার কথা বলে অথচ কার্যক্ষেত্রে মিথ্যাচারী, হিংসা দ্বেষ সর্বস্ব, তাদের স্বার্থস্বরূপ আরও বেশি প্রকট করে তুলেছে। এই প্রসঙ্গে কলকাতার প্রাক্তণ মেয়র এবং বঙ্গীয় কংগ্রেস পার্লামেণ্টারি পাটির ডেপুটি লিডার শ্রীযুক্ত সন্তোষ বসুর অকাট্য যুক্তিপূর্ণ চিঠিখানি বারে বারে দেশের সবার পড়া উচিত। মৌলানা সম্পর্কে আমার তিক্ত অভিজ্ঞতার বিষয়ে আপাতত আমি কিছু বলব না। অন্য সময়ের জন্যে তা তোলা রইল। কিন্তু দেশে মৌলানার পিছনে কে আছে তা জানতে চাওয়াটা অপ্রাসঙ্গিক নয়। জননেতা বলে পরিচয় দেবার যোগ্যতা যাঁদের আছে তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের সঙ্গে কিছু অনুগামী কংগ্রেসে নিয়ে আসেন। মৌলানা কাদের তাঁর অনুগামী বলে দাবি করতে পারেন ভেবে পাই না।

মৌলানা এবং কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের সঙ্গে আমাদের যা সম্পর্ক তাই নিয়ে এ যাবৎ দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে আমরা চাইনি, এবং এই নীতিই আমরা অনুসরণ করে চলব। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যে যা কর্তব্য তা আমাদের করতেই হবে। অতএব প্রত্যেকটি আঘাতের বদলে কঠিন প্রত্যাঘাত সইতে হবে—মৌলানা যেন তা খেয়ালে রাখেন। এবং সেই প্রত্যাঘাত আসবে সারা দেশ থেকে, যেখানে আমাদের বন্ধু ও সমর্থকরা আছে সবার কাছ থেকে। হাই কমাণ্ডের সঙ্গে লড়াই যদি দীর্ঘ ও তীব্র হয় আমরা তার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি। দেশে আমাদের স্থান কোথায় আমরা তা জানি। এর উপরে আমাদের পক্ষে আছে যুবশক্তি এবং সেইসঙ্গে অসীম ধৈর্য ও নিগ্রহ সহ্য করার সামর্থ্য। সুতরাং সাফল্য সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দিগ্ধ। বর্তমানে বৃহত্তর সমস্যা নিয়ে আমাদের ব্যস্ত থাকতে হতে পারে, কিন্তু তাই বলে মৌলানা যেন না ভাবেন যেহেতু আমরা এই নিয়ে ব্যস্ত আছি

অতএব হাইকমাণ্ডের যথেচ্ছাচার থেকে নিজেদের ঘর সামলাতে অপারগ হব।

আমার নির্বাচন থেকে আরও বোঝা যাবে যে, কেন্দ্রীয় আইন-সভাকে পরিহার করার নীতির আমি ঘোরতর বিরোধী। সম্ভবত সাধারণ কর্তব্যবোধে কংগ্রেস পার্টির অমানবিক এই অবহেলার দরুন বর্তমান আকারে ভারত রক্ষা আইন প্রচলন করা সম্ভবপর হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় জনগণের কণ্ঠস্বর প্রায় অশ্রুতই রয়ে গেছে। বলা বাহুল্য কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের আত্মঘাতী এই নীতি আমি অন্তত অনুসরণ করব না।

মোট কথা, আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আমার নির্বাচন সঙ্কেতবহ একটা নির্দেশ বলে গণ্য হবে। সেই নির্দেশ এই যে, দেশের প্রত্যেক প্রান্তে প্রতিটি ফ্রণ্টে মৌলানা ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের হুমকির জবাব দিতে আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত। আমরা দাবি করি, ভারতের জনমতের যথার্থ প্রতিনিধি আমরাই এবং যে সব কংগ্রেসীদের পদস্খলন শুরু হয়েছে, আমরা দাবি করি, আমরা তাদের চেয়ে সাচ্চা কংগ্রেসসেবী। এই দাবি যে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত, এর সপক্ষে আরও প্রমাণ যদি আবশ্যক হয় আমরা আমাদের আচরণে তা প্রমাণ করব।

আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ

ভবদীয়

সুভাষচন্দ্র বসু

[ফরওয়ার্ড ব্লক-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং পরবর্তীকালে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সর্দার শার্দুল সিং কবিশেরকে লেখা এই চিঠিটি এতদিন অপ্রকাশিত ছিল. শ. ক. ব.]।

ব্যক্তিগত-প্রকাশের জন্য নয় প্রেসিডেন্সি জেল কলিকাতা

৪. ১১. ৪০

প্রিয় সর্দারজি,

আজ সকালে আপনার কাছে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি, আশা করি যথাসময়ে আপনার কাছে তা পৌঁছবে ঃ

"সর্দার শার্দুল সিং কবিশের
লাহোর

প্রসঙ্গ—আজকের সংবাদপত্রের রিপোর্ট। আশা করি মহাত্মা গান্ধীর অনশনে আপনি ঘোরতর অসম্মতি জানাবেন। পত্র যাচ্ছে।

সুভাষ বোস"

আজকের সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছে মহাত্মা গান্ধী অনশন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সরকারকে সেই মর্মে জানিয়ে দিয়েছেন। এর আগে, গান্ধিজী আবার অনশন করতে পারেন এরকম সম্ভাবনার আভাস সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। অতএব এখনকার পরিণতিতে কেউই তেমন অবাক হবে না।

এই বিষয়ে আমার মতামত কী আপনাকে তা জানাবার জন্যে আমি এই চিঠি লিখছি। আপনি যদি আমার সঙ্গে একমত হন—আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আপনি তা হবেন—আপনি গান্ধীবাদীদের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া হবে সে সম্পর্কে কোনরকম দ্বিধা ও সংকোচবোধ না করে অবস্থানুযায়ী যা করণীয় বিবেচনা করবেন, তাই করতে পারেন।

রাজকোট অনশনের পরেকার বিপর্যয় দেখে আমার মনে হয়েছিল

গান্ধীমার্কা অনশন পর্ব এই সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল। বোঝা যাচ্ছে ভুল ভেবেছিলাম। পর্বতপ্রমাণ ভুলভ্রান্তি করার পরেও মহাত্মাজী শুধরাবেন না! উদ্দেশ্য যদি নৈতিক চাপ না হয় এই অনশন তাহলে কিসের জন্য এবং অহিংসার ঋষিকে কেনই বা এই উপায় গ্রহণ করতে হল? অনশনের কারণকে তিনি অন্তরের আলোকে দর্শন করতে পারেন, কিন্তু তাই বলে হিংসার চরিত্রে কোন হেরফের হয় না। নৈতিক চাপ বা হিংসা তার ফলে অহিংসায় রূপান্তরিত হয় না। আমাদের মত সম্পূর্ণ আলাদা। আমাদের অহিংসার সঙ্গে দর্শনের বা আধ্যাত্মিকতার যোগ নেই, অতএব অনশন বা প্রায়োপবেশনের প্রয়োজনকে আমরা অস্বীকার করি না। প্রকৃতপক্ষে, আমি নিজেই আগে অনশন ধর্মঘট করেছি এবং বাধ্য হলে আবার তা করতে পারি।

যতীন দাস যখন অনশন ধর্মঘট করে জীবনোৎসর্গ করলেন মহাত্মার কাছ থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে একটিও সহৃদয় উক্তি শোনা গেল না। প্রকৃতপক্ষে তিনি এক বন্ধুকে লিখে জানান, তিনি যদি মুখ খুলতেন তাহলে তাঁকে অপ্রীতিকর কিছু বলতে হ'ত। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী নিজের খুশিমত যখন ইচ্ছা অনশন ধর্মঘট করতে পারেন এবং আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, এই উপায়ে তিনি যখন নৈতিক চাপ দেন, তখন তা অহিংসার তুরীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। আমাদের বিশ্বাসপ্রবণতার নিশ্চয় একটা সীমা আছে। এমনকি এককালে যারা সম্পূর্ণ অন্ধ ছিল তাদেরও চোখ খুলতে আরম্ভ হয়েছে।

মহাত্মার এই অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে আমার প্রধান আপত্তি এই যে, সর্বেসর্বা কর্তৃত্ব গ্রহণ করে কংগ্রেসকে ক্লিবত্বে পরিণত করার পর মহাত্মা অনশনকে গণআন্দোলনের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করছেন। আইন অমান্যের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক রাজনৈতিক পদ্ধতির পরিপূরক হিসেবে ব্যক্তিগত বা জাতিগত সম্মান ও ন্যায়বিচার অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে এই অস্ত্রের ব্যবহারে ব্যক্তিগতভাবে আমার আপত্তি থাকত না, কিন্তু সেক্ষেত্রে গণআন্দোলনের বদলে অনশনের কথা উঠত না। রাজকোটের ক্ষেত্রে যেমন দেখেছি, এই ক্ষেত্রেও তেমনি দেখতে পাচ্ছি, গণ-

আন্দোলনকে যখন স্বেচ্ছায় হত্যা করা হয় তখনই অনশন করার দরকার হচ্ছে। এইরকম অনশনের ফলে জনসাধারণ যে আদর্শ বা আন্দোলনের সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত থাকে, তা থেকে তাদের প্রত্যেকের দৃষ্টি অপসৃত হয়ে অনশনকারী ব্যক্তির উপর নিবদ্ধ হয়। আসল প্রশ্নটাকে এইভাবে পাশ কাটিয়ে গেলে দশের স্বার্থ রক্ষা হয় বলে মনে হয় না, যদিও এর ফলে ব্যক্তিবিশেষের জনপ্রিয়তা অথবা তার জন্যে দরদও কিছু বৃদ্ধি পেতে পারে। পরিস্থিতি অন্যরকম হত যদি অপরিহার্য অবস্থাসন্নিবেশের চাপে গণআন্দোলনের ধারায় স্বাভাবিকভাবে অনশনের প্রয়োজন দেখা দিত।

একবার ভেবে দেখা যাক আজ পর্যন্ত মহাত্মাজী অনশন করে কী লাভ করেছেন। নিঃসন্দেহে, দুঃখভোগের মধ্যেই নৈতিক একটা মূল্য আছে—কিন্তু তা বাদ দিলে, তাঁর একাধিক অনশনের ফলে তেমন কিছুই লাভ হয়নি যাকে বাস্তব অবস্থার সুরাহা বলা যেতে পারে। পুণা অনশন তপশিলী শ্রেণীদের জন্য কিছু অধিকার এনে দিয়েছিল বটে কিন্তু মোটামুটিভাবে সাম্প্রদায়িক বণ্টনকে পরোক্ষ ভাবে তিনি মেনে নিয়েছিলেন বলে এবং তপশিলী শ্রেণী সম্পর্কে পৃথক নির্বাচক-মণ্ডলী অংশত স্বীকার করে নেবার ফলে সেই অধিকারও প্রায় লোপ পেয়েছিল। অতএব অনশন মারফৎ তিনি তেমন কিছুই অর্জন করতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও, যতদিন পর্যন্ত অনশন গণআন্দোলনের পরিবর্তে ব্যবহৃত না হয়ে তার সহায় হয়ে ছিল ততদিন তার বিরোধিতার প্রয়োজন দেখা দেয়নি। এখন গণআন্দোলনের সর্বনাশ সাধন করে তাকে হত্যা করে তার জায়গায় বিকল্পরূপে অনশনকে ব্যবহার করা হচ্ছে। অএতব, আমরা যারা গণআন্দোলনে বিশ্বাসী, এতে আমাদের নৈতিক সমর্থন থাকতে পারে না। বরঞ্চ আমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত সুস্পষ্টভাবে এই অনশনের নিন্দা করা; তাতে যদি গান্ধীবাদীরা আমাদের গালমন্দ দেয় বা ভুল বোঝে তবুও আমাদের তা করতে হবে।

প্রকাশ্যে এই বিষয়ে আমার পক্ষে কিছু বলা সমুচিত হবে না, যদিও

আমাকে তা বলবার অনুমতি দেওয়া হয়, যেহেতু আমি এখন স্বাধীন নই। তাছাড়া এই প্রসঙ্গে আমার নাম জড়ানো হোক, আমি চাই না। কিন্তু আমার অনুপস্থিতিতে নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনার এ সম্পর্কে গুরুতর দায়িত্ব রয়ে গেছে এবং জন-সাধারণ স্বভাবত আপনার কাছ থেকে নির্দেশ আশা করবে। আপনাকে আমার এই চিঠি লেখার আরও একটি উদ্দেশ্য, আপনাকে আশ্বাস দেওয়া, এই বিষয়ে আমি মুক্ত থাকলে আমি যা করতাম আপনি যদি তাই করেন আপনি আমার পূর্ণ সমর্থন পাবেন।

আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ
ভ্রাতৃপ্রতিম
সুভাষ চন্দ্র বসু

পুনশ্চঃ আরও একটি কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। মহাত্মা গান্ধী প্রায়ই বলেন ব্রিটিশ সরকারকে তিনি বিব্রত করতে চান না। এই অনশন কি সেই সরকারকে বিব্রত করবে না। এবং সরকারের থেকে জনসাধারণকে কি তা আরও বেশি বিব্রত করবে না, যেহেতু অনশনের সময় তিনি কারাবাসে থাকছেন না ?

সর্দার শার্দুল সিং কবিশের
চেম্বারলেন রোড, লাহোর।

আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ
সু. চ. ব.

আমার রাজনৈতিক প্রতীতি এবং সরকারকে লেখা অন্যান্য চিঠিপত্র

আমাব রাজনৈতিক প্রতীতি এবং জেল থেকে লেখা সবকারের কাছে চিঠিপত্র, অক্টোবর—ডিসেম্বর, ১৯৪০।

১

বাংলা সরকারের
মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
সমীপে—
সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, প্রেসিডেন্সি জেল মারফত।

মহাশয়,

ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর এক ধারাবলে আমি প্রায় চার মাস জেলে আটক রয়েছি। এর জন্য আদালতের বিচার আবশ্যক। এ ছাড়াও গত দু'মাস হল আমি বিচারাধীন বন্দী। উল্লিখিত নিয়মাবলীর এক ধারা অনুসারে বিনা বিচারে আটক এবং ওই নিয়মাবলীর অপর এক ধারা অনুসারে [আদালতে] অভিযুক্ত—প্রশাসনিক হুকুমের ও বিচারিক পদ্ধতির এ এমন এক সংমিশ্রণ যা শুধু অভূতপূর্বই নয়, স্পষ্টত বেআইনী ও অন্যায়।

২। উপরন্তু, বিচারক ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে যখন জামিনের আবেদন করা হয়, পাবলিক প্রসিকিউটাররা সম্ভবত স্থানীয় সরকারের নির্দেশক্রমে তার বিরোধিতা করেন। ফলে আবেদন অগ্রাহ্য হয়। বিচারসংক্রান্ত কার্যধারায় সরকারের অহেতুক হস্তক্ষেপের এটি একটি দৃষ্টান্ত। এই হস্তক্ষেপ আরও আপত্তিকর এই কারণে যে, ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর অধীনে মামলাগুলি সম্পর্কে ভারত সরকার যে নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় সরকার সেই সকল নির্দেশ পালন করছে না।

৩। আমি যখন আদালতে অভিযুক্ত তখন এই প্রকারে আমাকে জোর করে জেলখানায় আটক করে রাখা অসঙ্গত, অন্যায় ও বে-আইনী। একবার যখন আমাকে ভারতরক্ষা নিয়মাবলী লঙ্ঘন করার অভিযোগে আদালতে হাজির করা হয়েছে, তখন আইনকে নিজস্ব ধারায় চলতে দেওয়াই উচিত। ওই একই ভারতরক্ষা নিয়মাবলীতে আবার আমাকে বিনা বিচারে কি করে বন্দী করে রাখা যেতে পারে ?

৪। এই সব ঘটনা "জনপ্রিয়" মন্ত্রিমণ্ডলীর আমলে ঘটে চলেছে বলে বিস্ময় ও বেদনা বোধ করছি। যে সকল নাগরিক ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী—বিশেষ করে যদি তাঁরা মুসলিম লীগের সদস্য হন—তাঁদের ক্ষেত্রে এই মন্ত্রিমণ্ডলী কি রকম আচরণ করছে আমি লক্ষ্য করে চলেছি। সরকারের কাছে এই প্রসঙ্গে অসংখ্য দৃষ্টান্তের উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। শেষ দৃষ্টান্ত ঢাকা জেলার মুড়াপাড়ার মৌলবীকে অকস্মাৎ মুক্তিদান। এই প্রকার প্রতিটি ঘটনা আমি খেয়ালে রাখছি।

৫। এই সব এবং অন্যান্য অসংখ্য বিষয় বিবেচনা করে সরকারের উচিত আমাকে অবিলম্বে মুক্তিদান করা। কেন্দ্রীয় আইনসভায় আমি নির্বাচিত হয়েছি, ৫ই নভেম্বর থেকে তার অধিবেশন আরম্ভ হচ্ছে। এই দিক থেকেও অধিবেশনে যাতে যোগদান করতে পারি আমাকে তার অনুমতি দেওয়া প্রয়োজন—অবশ্য যোগদান করা নির্ভর করে আমার স্বাস্থ্যের অবস্থার উপর। বর্মা সরকার যদি একজন দণ্ডিত বন্দীকে আইনসভার অধিবেশনে যোগদানের অনুমতি দিতে পারে বাংলার "জনপ্রিয়" মন্ত্রিমণ্ডলী এমন একজনকে কি সেই সুযোগ দিতে পারে না যে দণ্ডিত বন্দী নয় ?

৬। পরিশেষে যা বলছি তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমার বর্তমান স্বাস্থ্যের অবস্থায় আমাকে একভাবে আটক রেখে সরকার যে নীতির পরিচয় দিচ্ছে তা প্রতিহিংসামূলক ছাড়া কিছু নয়। কেন এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে তা আমার কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য।

এই চিঠির গুরুত্ব অত্যধিক। আমার প্রার্থনা এই, যে বিবেচনা চিঠির প্রাপ্য তা যেন দেওয়া হয়।

প্রেসিডেন্সি জেল আপনার বিশ্বস্ত

৩০।১০।৪০ সুভাষচন্দ্র বসু

২

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট
প্রেসিডেন্সি জেল
সমীপে

মহাশয়,

জেলে আমাকে একটানা আটক রাখার বিষয়ে আজ আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি। সরকার যদি আটক আদেশ প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করেন তাহলে আমার দিক থেকে তার পরিণামে যা দাঁড়াবে, ওই চিঠির সঙ্গেই সরকারকে তা জানাতে চাই। সেইজন্য আপনাকে এই চিঠি লিখছি এবং এইসঙ্গে অনুরোধ করছি যে, আপনি যতখানি সম্ভব গোপনীয়তা রক্ষা করে এর বিষয়বস্তু সরকারের গোচরে আনবেন। বন্ধ খামে এটি আপনার আপিসে পাঠাচ্ছি যাতে আর কেউ দেখতে না পায়। এই চিঠি ভয় দেখাবার হুমকি নয় এবং আমি আশা করি এই চিঠি সেইভাবে দেখা হবে না। ঘটনার পরিণতিতে শীঘ্রই এমন অবস্থা দেখা দিতে পারে যা থেকে সরে আসা আমার পক্ষে অসাধ্য। সেইগুলি খোলাখুলি জানানোই এই চিঠির উদ্দেশ্য।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে লেখা চিঠিতে যে সব বিবেচনার কথা বলা বা প্রকারান্তরে বোঝানো হয়েছে সরকারের মতিগতির তাতে পরিবর্তন হবে, এরকম আমি আশা করি না। সেইজন্য কী কার্যধারা আমার গ্রহণ করা উচিত গত দু'মাস ধরে আমি তাই ভাবছি। যে কাজ অন্যায় তার বিরুদ্ধে নৈতিক প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা এবং এই প্রতিবাদের প্রমাণ হিসেবে স্বেচ্ছায় অনশন করা ছাড়া আমার

মার গত্যন্তর নেই। "জনপ্রিয়" মন্ত্রিমণ্ডলীর উপর এই অনশন কোন প্রভাব বিস্তার করবে না, যেহেতু আমি ঢাকার মুড়াপাড়ার মৌলবীও নই, কিংবা মুসলমান ধর্মাবলম্বীও নই। অতএব আমার ক্ষেত্রে এই অনশন হবে আমরণ অনশন। আমি জানি সরকার তাতেও বিচলিত হবেন না এবং এ বিষয়ে আমার কোন মোহও নেই। "জনপ্রিয়" মন্ত্রিমণ্ডলী আমলাতান্ত্রিক সরকারের মত সরকারী মর্যাদার প্রশ্ন তুলে চিরাচরিত যুক্তি দেখাবেন যে অনশনের হুমকি দিয়ে সরকারকে বাধ্য করা যায় না। আমি যখন ইংলণ্ডে তখন কর্কের লর্ড মেয়র, টেরেন্স ম্যাকসুইনি অনুরূপ কারণে অনশন করছিলেন। সারা দেশ তাতে বিচলিত হয়েছিল—পার্লামেন্টের সব রাজনৈতিক দল এমন কি রাজা স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে অভিভূত হয়ে পড়েন, কিন্তু লয়েড জর্জ-এর সরকার অটল। ফলে রাজাকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হল যে, কেবিনেটের মনোভাবের দরুন তিনি রাজকায় বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারছেন না। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান ও যুক্তির নিরাবেগ চোখে আমি যে সমস্ত পরিস্থিতিটা পরীক্ষা করে দেখেছি এবং হালকা মনে এ ভাবছি না, আপনাকে ও সরকারকে এইটুকু শুধ্ বোঝাবার জন্য আমি এত সব কথা বললাম।

অতএব, আমার অনশনের থেকে প্রত্যক্ষ কোন ফল ফলবে যদিও এমন কোন প্রত্যাশা আমার নেই, আমার তবু এইটুকু তৃপ্তি থাকবে যে সরকারের অন্যায্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমি নৈতিক প্রতিবাদ জানিয়েছি। ইংরেজরা এবং ব্রিটিশ সরকার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পবিত্র নীতিকে পোষকতা করার কথা বলে থাকে কিন্তু যে নীতি তারা নিজেরা অনুসরণ করে চলেছে, তা তাদের কথার বিপরীত। নাৎসিবাদকে ধ্বংস করার জন্য তারা আমাদের সাহায্য চায়, কিন্তু চরম নাৎসিবাদকে তারা নিজেরা প্রশ্রয় দিচ্ছে। এই দুর্ভাগা দেশে তাদের নীতির পিছনে, সেইসঙ্গে নিজেদের "জনপ্রিয়" বলে থাকেন অথচ কার্যত কোন মুসলমানের প্রশ্ন জড়িত থাকলেই টলানো যায় এমনি এক প্রাদেশিক সরকারের কর্মনীতির আড়ালে, যে ভণ্ডামি রয়েছে

তার স্বরূপ মেলে ধরতে আমার প্রতিবাদ সাহায্য করবে। প্রসঙ্গত, আমার আরও তৃপ্তির কারণ এই হবে যে, আমার অনশন এবং তার পরিণামের প্রতিক্রিয়া ভারতের বাইরেও দেখা দেবে, কারণ এদেশের সীমান্তের বাইরে যে কজন ভারতীয় সুপরিচিত ঘটনাচক্রে আমিও তাদের মধ্যে একজন।

আর একটি মাত্র বিষয় ভাববার আছে। প্রস্তাবিত প্রতিকার ব্যাধির থেকেও মারাত্মক হবে কিনা। এই চিন্তায় আমার অনেক দিন অনেক রাত কেটেছে। আমার দিক থেকে এই প্রশ্নের উত্তর, বর্তমান অবস্থার মধ্যে বেঁচে থাকার বিশেষ কোন মূল্য নেই। এই মরজগতে জীবনের আদর্শ ছাড়া সবকিছুই লুপ্ত হয়ে যায়। এই আদর্শ তখনই অনির্বাণ থাকে যখন লোকে তার জন্য মৃত্যু বরণ করতে দ্বিধা করে না। পবিত্র কোন আদর্শের জন্য ব্যক্তিবিশেষ যখন বিলুপ্ত হয়, তখনও সেই আদর্শের কিন্তু মৃত্যু হয় না—অন্যের মধ্যে তা নতুন রূপে নবজীবন লাভ করে। এবং একমাত্র পরার্থে দুঃখবরণের মধ্যে দিয়েই কোন আদর্শ বড় হতে পারে, বিকাশলাভ করতে পারে। দেহ থেকে যেমন দেহের জন্ম হয়—ঠিক তেমনই আত্মশক্তি একই প্রকার আত্মজ শক্তিকে জন্ম দেয়। অতএব আমার মধ্যে যদি কোন কিছুর মূল্য থেকে থাকে, তাহলে আমার মৃত্যুর ফলে আমার দেশ বা মানব-জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বরঞ্চ, ঈশ্বরের ইচ্ছায়, হয়ত তারা উচ্চতর এক নৈতিক স্তরে উন্নীত হবে—কারণ মানুষের সাধ্যায়ত্ত সবচেয়ে বড় ত্যাগ স্বেচ্ছায় জীবন ত্যাগ, যার জন্য অপরের জীবন হরণ করতে হয় না।

আরেকটা কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। দীর্ঘকাল আমার জেলে কেটেছে এবং আগেও আমি প্রায়োপবেশনে থেকেছি। অনশন ধর্মঘটের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করার জন্য অত্যুৎসাহী সরকারী আমলারা যে সকল পন্থা অবলম্বন করে থাকেন, আমার সব জানা আছে। স্বভাবত আগে থেকেই আমি তার জন্য প্রস্তুত থাকব। তাছাড়া জোর করে খাওয়াতে আমি কিছুতেই দেব না। জোর করে আমাকে

খাওয়ানোর নৈতিক অধিকার কারও নেই। টেরেন্স ম্যাকসুইনির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কেবিনেটের সঙ্গে এবং আরও পরে ১৯২৬ সালে আমাদের অনশন ধর্মঘটের সময় ভারত সরকারের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়ে গেছে। তার পরে জেল কোড বিধান অনুযায়ী কোন সারকুলার যদি চালু হয়ে থাকে, আমার উপরে তার কোন বাধ্যতা থাকবে না।

আমি আবার বলছি, কালীপূজার পবিত্র দিনে লেখা এই চিঠিকে হুমকি বা চরম পত্র বলে গ্রহণ করা উচিত হবে না। এটি একান্ত বিনীতভাবে লেখা নিজস্ব বিশ্বাসের দৃঢ় অভিব্যক্তি মাত্র। এই কারণে এটিকে গোপন দলিলরূপে দেখবেন এবং গোপনভাবেই সরকারের কাছে পাঠাবেন। আমার একমাত্র অভিপ্রায় আমার মনের গতি কোনদিকে চলেছে সরকারকে তা জানানো, যাতে তাঁরা আমার উদ্দেশ্য, সেইসঙ্গে পরিণতিও সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন, এবং আমাকে তাঁদের সিদ্ধান্ত জানান।

আপনি সদাসর্বদা যে সৌজন্য দেখিয়ে আসছেন, তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

প্রেসিডেন্সি জেল — ভবদীয়
কলিকাতা। — সুভাষচন্দ্র বসু
৩০।১০।৪০

৩

গোপনীয় ও জরুরী

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট
প্রেসিডেন্সি জেল
সমীপে,

মহাশয়,

গত ৩০শে অক্টোবর, কালীপূজার দিন আপনাকে আমি যে

গোপনীয় চিঠি লিখি আশা করি যথারীতি তা সরকারের কাছে পেশ করেছেন। সেই চিঠির সূত্রেই এই চিঠিটি লিখছি এবং এই চিঠি দুটি ওই দিনই অর্থাৎ ৩০শে অক্টোবর তারিখে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে যে চিঠি দিই তার সঙ্গেই যেন পড়া হয়।

২। আপনাকে চিঠি লেখবার পর ভারতীয় আইন পরিষদে পণ্ডিত এল. কে. মৈত্র, এম. এল. এ. (কেন্দ্রীয়) যে মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন সেই প্রসঙ্গে ভারত সরকার সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আমাকে গ্রেপ্তার করার ও কারারুদ্ধ রাখার দায়িত্ব একান্তভাবে বাংলা সরকারের, যে-সরকারকে, তাঁদের সমর্থকদের দাবি অনুযায়ী, "জনপ্রিয়" মন্ত্রিমণ্ডলী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকেন। একথাও স্পষ্ট, এই "জনপ্রিয়" সরকার আমার সঙ্গে যে রকম আচরণ করে চলেছেন তা অতুলনীয় এবং এদেশে অভূতপূর্ব। ভারত রক্ষা নিয়মাবলীর মামলা সম্পর্কে ভারত সরকারের যে নির্দেশ আছে তাঁদের আচরণ তা লঙ্ঘন করেছে। এই দেখে আমি বেদনা বোধ করছি যে একটি "জনপ্রিয়" সরকার ভারতরক্ষা নিয়মাবলী প্রয়োগ করছেন ভারত রক্ষার জন্য নয়, এমন এক কার্যপদ্ধতিকে ঢাকবার জন্য যা একই কালে অন্যায় ও অবৈধ।

৩। গতকাল আমার উকীলরা যখন জামিনের জন্য আবেদন করেন ব্যাঙ্কশাল কোর্টের বিচারক ম্যাজিস্ট্রেট সেই আবেদন মঞ্জুর করে এই মন্তব্য করতে বাধ্য হন যে তাঁর আদেশ অকার্যকর হবে যেহেতু সরকার ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর ২৬ ধারা অনুযায়ী বিনা বিচারে আমাকে আটক রেখেছেন। বিচারবিভাগীয় কার্যপদ্ধতিতে শাসনবিভাগের হস্তক্ষেপের এর চেয়ে নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত আমি কল্পনা করতে পারি না। ভারতরক্ষা নিয়মাবলী ভারত রক্ষার জন্যে কি বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল, না, তা করা হয়েছিল অবিচার ও অবৈধতা রক্ষার জন্য ? ভাবলে অবাক হতে হয়।

৪। দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে, এই সরকার আরও একটি অন্যায় কাজ করেছে। তাঁরা আমাকে গ্রেপ্তার করা ও আটক রাখ

সম্পর্কে ভারতসচিবকে ভুল সংবাদ দিয়েছেন। সকলেই জানে, মিস্টার সোরেনসেনের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ভারতসচিব যে সংবাদ পেয়েছেন তার ভিত্তিতে হাউস অফ কমনস্-এ বলেন, হলওয়েল মনুমেণ্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যদি যা সত্য সম্পূর্ণ তা বলা হত তাহলে ইংলণ্ডে সে সম্পর্কে আরও জানা যেত, কারণ পার্লামেণ্টে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেকেই আমার বন্ধু আছেন।

৫। আমি যা আমার বৈধ অধিকার বলে মনে করি তার ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য আমার মাত্র একটি পথই খোলা আছে, যথা, নৈতিক প্রতিবাদ জানিয়েই ক্ষান্ত থাকা—যেহেতু "জনপ্রিয়" সরকারের দয়ায় আমার কাছে আর সব দ্বারই রুদ্ধ হয়ে গেছে। অতএব, ৩০শে অক্টোবর আপনাকে যা জানিয়েছি এবং কালীপুজার দিনে আত্মনিবেদন করে যে সংকল্প আমি গ্রহণ করেছি সেই অনুযায়ী খুব শীঘ্রই আমি অনশন শুরু করছি। সঠিক তারিখ জানিয়ে আমি যথাসময়ে সরকারের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে খবর পাঠাব, তবে সেই খবর যাবে অনশন শুরু করার পূর্ব মুহূর্তে। যেহেতু অনেকদিন হল, গত মাসের ৩০শে আমি চিঠি লিখেছি, সরকার ইতিমধ্যে অবগতির জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছেন।

এই চিঠিখানি আপনি যদি গোপনীয় বলে দেখেন এবং গোপনীয়-ভাবেই সরকারের কাছে যত শীঘ্র সম্ভব অনুগ্রহ করে পেশ করেন তাহলে আমি বাধিত হব।

প্রেসিডেন্সি জেল, ভবদীয়

১৪।১১।৪০ সুভাষচন্দ্র বসু

৪

বাংলার মহামান্য গভর্নর, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদ

সমীপেষু

মান্যবর ও ভদ্রমহোদয়গণ,

৩০শে অক্টোবর ১৯৪০, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে লেখা আমার যে

চিঠি (যার নকল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠানো হয়েছিল) এবং ৩০শে অক্টোবর ও ১৪ই নভেম্বর প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে লেখা গোপনীয় যে চিঠি যথারীতি সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে, সেই সূত্রে বর্তমান চিঠি লিখছি। এই চিঠিতে আমার নিজের অবস্থা সম্পর্কে যা বলার আছে তার পুনরাবৃত্তি করব এবং সেইসঙ্গে কাগজে-কলমে লিখে রাখব কোন কোন কারণ আমাকে আমার জীবনের সব-চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করছে।

আপনাদের কাছ থেকে প্রতিকার পাব আমার সে আশা আর নেই। অতএব আমি দুটি মাত্র অনুরোধ করব। দ্বিতীয় অনুরোধের কথা এই চিঠির শেষে বলা থাকবে। আমার প্রথম অনুরোধ, এই চিঠিখানি সরকারী মহাফেজখানায় যেন সযত্নে রক্ষা করা হয়, যাতে ভবিষ্যতে আমার যে সকল দেশবাসী আপনাদের পদাধিকারী হবেন তাঁরা এটি দেখতে পান। এতে আমার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে একটি বাণী আছে এবং এই কারণেই এটি আমার রাজনৈতিক প্রতীতি।

সরকারিভাবে কোন কারণ বা যুক্তি না দেখিয়ে বাংলা সরকারের আদেশে ভারতরক্ষা নিয়মবলীর ১২৯ ধারা অনুযায়ী ১৯৪০-এর ২রা জুলাই আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে সরকারী সূত্রে প্রথম যে কারণ দেখানো হয় তা আসে ভারতসচিব রাইট অনারেব্‌ল মিস্টার অ্যামেরি-র কাছ থেকে। তিনি হাউস অফ কমন্‌স-এ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে কলিকাতায় হলওয়েল মনুমেণ্ট ধ্বংস করবার আন্দোলনের সূত্রে আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও বঙ্গীয় আইনসভার এক অধিবেশনে এই উক্তি কার্যত সমর্থন করেন এবং বলেন যে আমার মুক্তির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে হলওয়েল মনুমেণ্ট সত্যাগ্রহ। সরকার যখন মনুমেণ্টটি অপসরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেই সূত্রে বিনা বিচারে যারা আটক ছিল তাদের সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হল, দেওয়া হল না শুধু শ্রীনরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তি এম. এল. এ.কে এবং আমাকে। ১৯৪০-

এর আগস্টের শেষাশেষি তাদের মুক্তি দেওয়া হয়, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক আটকের বিধান সমন্বিত ভারত রক্ষা নিয়মাবলীর ১২৯ ধারা অনুযায়ী মূল আদেশের স্থলে ভারত রক্ষা নিয়মাবলীর ২৬ ধারা অনুযায়ী স্থায়ীভাবে আমাকে আটক রাখার আদেশ জারি করা হল।

আশ্চর্যের কথা এই যে, ২৬ ধারা অনুযায়ী আদেশ জারি হবার সঙ্গে সঙ্গেই খবর এল যে দুজন ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে আমার বিরুদ্ধে ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর ৩৮ ধারা অনুসারে মামলা রুজু করা হচ্ছে, তার কারণ আমার তিনটি বক্তৃতা এবং ফরওয়ার্ড ব্লক নামে যে সাপ্তাহিক পত্রিকার আমি সম্পাদক সেই পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধ। এই বক্তৃতাগুলির মধ্যে দুটি বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে ১৯৪০ এর ফেব্রুয়ারীতে এবং তৃতীয়টি এপ্রিল মাসের গোড়ায়। এইভাবে সরকার গত আগস্ট মাসের শেষাশেষি ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর এক ধারা অনুযায়ী বিনা-বিচারে স্থায়ীভাবে আমাকে আটক করেন এবং একই সঙ্গে ওই নিয়মা-বলীর আরেক ধারা অনুযায়ী বিচারবিভাগীয় ট্রাইবুন্যালের সমক্ষে অভিযুক্ত করে অভিনব ও অভূতপূর্ব এক অবস্থা সৃষ্টি করলেন। এই ঘটনা ঘটবার আগে আমি শাসনবিভাগীয় হুকুম এবং বিচারবিভাগীয় পদ্ধতির এইরকম সংমিশ্রণ কখনও দেখিনি। এইপ্রকার নীতি স্পষ্টতঃ বেআইনী ও অন্যায় এবং স্পষ্ট ও প্রাঞ্জলভাবে প্রতিহিংসামূলক।

তথাকথিত অপরাধ অনুষ্ঠিত হবার অনেক পরে যে মামলা রুজু করা হয়েছে তা কারও নজরে না পড়ে পারে না। তাছাড়া ফরওয়ার্ড ব্লক-এর প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধের জন্য পত্রিকাটির ৫০০ টাকা জামানত বাজেয়াপ্ত করে এবং আরও ২০০০ টাকা জামানত তার কাছ থেকে আদায় করে পত্রিকাটিকে যে দণ্ডিত করা হয়েছে, তাও অগ্রাহ্য করা যায় না। উপরন্তু, পত্রিকাটিকে আক্রমণ করা হয় আকস্মিকভাবে, দীর্ঘকাল পরে, এবং এই সময়ের মধ্যে সরকারের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পত্রিকাটিকে একবারও সতর্ক করে দেওয়া হয়নি।

বাংলা সরকারের মনোভাব আরও প্রকট হয়ে ওঠে যখন দুজন বিচারক-ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে জামিনে আমার মুক্তির জন্য আবেদন

করা হয়। সরকারী মুখপাত্র আবেদন দুটির ঘোরতর বিরোধিতা করেন। শেষবার অন্যতম ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার ওয়ালি-উল-ইসলাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন, কিন্তু এই মন্তব্য করতে বাধ্য হন যে যতদিন পর্যন্ত সরকার ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর ২৬ ধারা অনুযায়ী বিনা বিচারে আমাকে আটক রাখার হুকুম প্রত্যাহার না করছেন, ততদিন তাঁর আদেশ নিষ্ফল থাকবে। অতএব দিনের আলোর মত এ কথা স্পষ্ট, সরকার যে নীতি অনুসরণ করে চলেছেন তা বিচার-বিভাগীয় ট্রাইবিউন্যালকে স্ববিবেচনানুযায়ী চলতে বাধা দিচ্ছে এবং আইন প্রয়োগকে ব্যাহত করছে। স্থানীয় সরকারের কার্যকলাপ আরও বেশি আপত্তিকর বলে মনে হয় যদি এ কথা স্মরণ করা যায় যে তাঁরা এই ধরনের মামলা সম্পর্কে ভারত সরকারের যে নির্দেশ ছিল তা আমলেই আনেননি।

সরকারের নীতির আরেকটি আশ্চর্য দিক, দুজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে একই সঙ্গে আমার বিরুদ্ধে মামলা। আমার একাধিক বক্তৃতাকে যদি আদালতের বিচারের বিষয় করা অভিপ্রেত হত, দুজন ম্যাজিস্ট্রেটের সহায়তা না নিয়েও তা ভালোভাবেই করা যেত, কারণ শহর কলিকাতার চৌহদ্দির মধ্যেই বিগত বারো মাসে আমি অসংখ্য বক্তৃতা দিয়েছি। এইজন্যে সাধারণ লোকেও ভাবতে বাধ্য হচ্ছে যে, সরকার আমাকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য এতই উদগ্রীব যে আইনের তূণে আরও একটা তীর মজুত রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

সর্বশেষে, সরকারের কার্যকলাপ নিরপেক্ষ যে কোন ব্যক্তির কাছে পুরোপুরি অভিসন্ধিমূলক বলে প্রতিভাত হবে, যেহেতু তথাকথিত সরকারী স্বার্থবিরোধী কাজ অনুষ্ঠিত হবার দীর্ঘকাল পরে মামলা দায়ের করা হয়েছে। উক্ত কার্য যদি বাস্তবিকই সরকারী স্বার্থ-বিরোধী হয়ে থাকে, তাহলে সরকার বহু পূর্বে, অর্থাৎ তথাকথিত অপরাধ যখন অনুষ্ঠিত হয় তখনই, ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন।

"ভারতরক্ষা নিয়মাবলীতে ধৃত ও বন্দী মুসলমানদের প্রতি এবং আমার মত লোকদের প্রতি আপনাদের মনোভাব একবার তুলনা

করে দেখতে অনুরোধ করি। ভারতরক্ষা নিয়মাবলীতে বন্দী মুসলমান-দের মধ্যে আজ পর্যন্ত কতজনকে কোন কারণ বা কৈফিয়ত না দেখিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, তার কি হিসেব নেবেন? মুড়াপাড়ার মৌলবীর দৃষ্টান্ত একেবারে সাম্প্রতিক, সাধারণের মনে তা এত স্পষ্ট হয়ে জেগে আছে যে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। আমাদের কি এই বুঝতে হবে যে, আপনাদের শাসনে মুসলমানদের জন্য এক আইন এবং হিন্দুদের জন্য আরেক আইন, এবং মুসলমান যখন জড়িত হয়ে পড়ে তখন ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর অর্থ হয় ভিন্ন রকম? তাই যদি হয়, সরকার সেই মর্মে একটি ঘোষণা করে জানিয়ে দিলে তো পারেন।

স্থানীয় সরকার নয়, ভারত সরকার আমাকে বন্দী রাখার জন্য দায়ী, পাছে এই যুক্তি দেখানো হয় বা এইরকম ইঙ্গিত করা হয়, তাই আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এই সেদিন ভারতীয় আইনসভায় পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র আমার সম্পর্কে যে মুলতবী প্রস্তাব আনেন তার উত্তরে ভারত সরকারের তরফে বলা হয় কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিষয়টি উত্থাপন করা উচিত হবে না, যেহেতু বাংলা সরকার আমাকে বন্দী করে রেখেছেন। আমার বিশ্বাস মন্ত্রিমণ্ডলীর তরফ থেকে বঙ্গীয় আইন সভাতেও অনুরূপ স্বীকৃতি করা হয়েছে।

এবং আমরা ভুলে যেতে পারি না, এখানে এই বাংলাদেশে আমরা 'জনপ্রিয়'' মন্ত্রিমণ্ডলীর কল্যাণকর ছত্রছায়ায় বাস করছি।

ভারতীয় আইনসভায় আমার সাম্প্রতিক নির্বাচনে আরেকটি প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে—আইনসভার অধিবেশন চলাকালে আইন-সভার সদস্যদের কারাবাস থেকে "বিমুক্ত" থাকার প্রশ্ন। স্পষ্টভাবে বিধিবদ্ধ থাক বা নাই থাক প্রত্যেক শাসনতন্ত্রে এই অধিকার মজ্জাগত এবং দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রামের পর এই অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। খুব সম্প্রতি বর্মা সরকার একজন দণ্ডিত বন্দীকে বর্মা আইনসভার অধিবেশনে যোগদানের অনুমতি দেন; কিন্তু আমি যদিও দণ্ডিত বন্দী নই, আমাদের "জনপ্রিয়" মন্ত্রিমণ্ডলী আমাকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন।

সরকারের সমর্থনে সরকারী পক্ষ যদি ক্যাপ্টেন র‍্যামসে, এম. পি.র নজীর দেখাবার চেষ্টা করেন, তাহলে আমাকে বলতে হবে যে ক্যাপ্টেন র‍্যামসের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকার। তাঁর বিরুদ্ধে অনেক গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। সব কিছু ঘটনা আমাদের জানা না থাকায়, পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কিছু বলা কঠিন। যদি ক্যাপ্টেন র‍্যামসেকে অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ রাখা হয় এবং শেষ পর্যন্ত কোন প্রতিকারই না পাওয়া যায়, তাহলে বলতেই হবে, মিস্টার কেনেডি (গ্রেটব্রিটেনের মার্কিন রাষ্ট্রদূত) ও অন্যান্যরা যা বলেছেন বলে শোনা যাচ্ছে, যথা, ইংলণ্ডে গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটেছে, তার কিছুটা সত্য। এসব সত্ত্বেও হাউস অফ কমন্স-এর এক কমিটি ক্যাপ্টেন র‍্যামসের ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখছেন। ক্যাপ্টেন র‍্যামসে অন্তত এ সুযোগ পেয়েছেন।

সাধারণভাবে আমার মামলা সম্পর্কে আপাতত দুটি ব্যাপক প্রশ্ন বিবেচনা করা দরকার। প্রথমত, নৈতিক বা জনমতের দিক থেকে ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর কোন সমর্থন আছে কিনা ? দ্বিতীয়ত, নিয়মাবলী যা আছে আমার ক্ষেত্রে তা কি ঠিকমত প্রয়োগ করা হয়েছে ? এই দুটি প্রশ্নেরই উত্তর নেতিবাচক।

ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর পিছনে কোন নৈতিক সমর্থন নেই, যেহেতু তা জনসাধারণের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে। তাছাড়া এইগুলি মূলত যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা এবং একথা প্রত্যেকে জানে যে ভারতকে যুদ্ধরত শক্তি বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ভারতীয় আইনসভার বা ভারতীয় জনসাধারণের বিনা সম্মতিতে ভারতকে যুদ্ধে নামানো হয়েছে। উপরন্তু, যে ব্রিটেন স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শের জন্য লড়াই করছে বলে দাবি করে এই নিয়মাবলী সেই সোচ্চার দাবির পরিপন্থী। সর্বশেষে, কেন্দ্রীয় আইনসভায় ভারতরক্ষা আইন বা ভারতরক্ষা নিয়মাবলী যখন গৃহীত হয় কোনটিতেই কংগ্রেস পার্টি সমর্থন জানায়নি। এই অবস্থায় ভারতরক্ষা নিয়মাবলীকে 'ভারত দমন নিয়মাবলী' অথবা 'অবিচার রক্ষা নিয়মাবলী' বলা

হলে যথার্থ বলা হয় কিনা যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তাহলে অন্যায় হবে না।

সরকারের তরফ থেকে বলা যেতে পারে, ভারতরক্ষা আইন যেহেতু কেন্দ্রীয় আইনসভার আইন, অতএব তার অধীনে যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হয়েছে সমস্ত প্রাদেশিক সরকার তা মেনে চলতে বাধ্য। কিন্তু নিয়মাবলী যেভাবে রচিত আমার ক্ষেত্রে তা যে ঠিকমত প্রয়োগ করা হয়নি, এই অভিযোগের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে এর আগে অনেক কথা বলা হয়েছে। সুস্পষ্টভাবে আইনের বিরুদ্ধতা ও অবিচার করা হয়েছে। আমার মতে এইরকম অদ্ভুত আচরণের কেবলমাত্র একটি ব্যাখ্যাই হতে পারে, যথা, সরকার খোলাখুলিভাবে আমার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক নীতি চালিয়ে চলেছেন এবং এই নীতির ব্যাখ্যা কী তার কারণ জানা নেই।

ছ মাসের উপর হল আমার কাছে এই প্রশ্ন বারে বারে দেখা দিচ্ছে যে এই সঙ্কটে আমার কী করা কর্তব্য। আমি কি অবস্থার চাপে নতি স্বীকার করব এবং বরাতে যা আছে তাই মেনে নেব— অথবা যা আমার কাছে অসঙ্গত অন্যায় ও আইনবিরুদ্ধ তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবো? অত্যন্ত গভীরভাবে চিন্তার পর আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছি যে, এই অবস্থার কাছে আত্মসমর্পণের প্রশ্নই ওঠে না। অন্যায় করা থেকে অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করা আরও জঘন্য অপরাধ। অতএব প্রতিবাদ আমাকে করতেই হবে।

কিন্তু এতদিন ধরে প্রতিবাদ অনেক করেছি এবং প্রতিবাদ করার সাধারণ সব পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয়ে গেছে। সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি মারফত আন্দোলন করা হয়েছে, সরকারের কাছে আবেদন পেশ করা হয়েছে, আইনসভায় দাবি জানানো হয়েছে, আইনের পথ ধরে প্রতিকারের সন্ধান করা হয়েছে—এত সব চেষ্টা কি ইতিমধ্যে অকার্যকর প্রমাণিত হয়নি? কেবল একটিমাত্র উপায় বাকি আছে— কারারুদ্ধ বন্দীর হাতে শেষ অস্ত্র—তা অনশন ধর্মঘট বা প্রায়োপবেশন।

যুক্তির নিরাবেগ দৃষ্টিতে আমি এই পন্থার খারাপ ভালো দুই

দিকই পরীক্ষা করে দেখেছি এবং এর ফলে লাভ-লোকসান কী হবে তাও ভালোভাবে বিচার করেছি। এ বিষয়ে আমার কোন মোহ নেই এবং আমি সম্পূর্ণ সচেতন, আশু ও প্রত্যক্ষ লাভ কিছুই হবে না, কারণ এইরকম সঙ্কটে সরকারী ও আমলাতান্ত্রিক আচরণ কীরকম হয়ে থাকে সে সম্পর্কে আমি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। এই মুহূর্তে আমার মানসচোখে ভাসছে টেরেন্স ম্যাকস্যুইনি ও যতীন দাসের শাশ্বত ও চিরন্তন দৃষ্টান্ত। বিধিব্যবস্থার সে হৃদয় নেই, যা টলানো যেতে পারে, যদিও তার মিথ্যা মর্যাদাবোধ আছে এবং সেই মর্যাদাবোধকে তা সর্বদা আঁকড়ে থাকে।

বর্তমান অবস্থার মধ্যে জীবন ধারণ করা আমার কাছে অসহ্য। অবিচার ও অবৈধতার সঙ্গে আপস করে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা আমার স্বভাবে নেই। এই মূল্য দেওয়ার থেকে বরঞ্চ আমি জীবনই বিসর্জন দেব। পাশবিক বলের সহায়ে সরকার আমাকে কারারুদ্ধ রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তার জবাবে আমার বক্তব্য, "আমাকে মুক্তি দাও, নইলে চাই না আমি বেঁচে থাকতে—এবং আমি বাঁচব না মরব সে-সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার আমারই আছে।"

যদিও আশু ও প্রত্যক্ষ কোন লাভের সম্ভবনা নেই—কোন দুঃখবরণ, কোন আত্মত্যাগই কখনও ব্যর্থ হয় না। একমাত্র দুঃখবরণ ও আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়েই আদর্শের বিকাশ ঘটে এবং তা সার্থক হয়ে ওঠে, এবং সর্বদেশে সর্বকালে "শহীদের রক্তেই নিহিত থাকে ভবিষ্যতের দেবালয়"—এই চিরন্তন বিধানেরই জয় হয়।

এই মরজগতে সবকিছু লয় পাচ্ছে এবং পাবে—কিন্তু ভাবধারার, আদর্শের ও স্বপ্নের লয় নেই। কোন এক ভাবধারার জন্য একজন ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে কিন্তু সেই ভাবধারা তার মৃত্যুর পরে সহস্র জীবনে মূর্ত হয়ে ওঠে। এইভাবেই অভিব্যক্তির চাকা ঘুরে চলে এবং এক যুগের ভাবধারা, আদর্শ ও স্বপ্ন পরবর্তী যুগে সঞ্চারিত হয়। এই জগতে দুঃখবরণ ও আত্মত্যাগের অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে ছাড়া কোন ভাবধারাই সার্থকতা লাভ করেনি।

একটা নীতির জন্য জীবনধারণ ও মৃত্যু বরণ করা—এই অনুভবের থেকে বড় কী সান্ত্বনা থাকতে পারে? একজনের আত্মশক্তি তার অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য বহু আত্মশক্তি সৃজন করবে, এই জ্ঞানের চেয়ে বড় তৃপ্তি মানুষের আর কী হতে পারে? অন্তরের বাণী পাহাড় পর্বত পার হয়ে বিস্তৃত প্রান্তর অতিক্রম করে স্বদেশের সকল প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে এবং সাগর পাড়ি দিয়ে সুদূর দেশে উপনীত হবে—এই নিশ্চয়তা থেকে আরও লোভনীয় কী পুরস্কার মানবাত্মা আশা করতে পারে? স্বীয় আদর্শের বেদীমূলে শান্তিপূর্ণ আত্মোৎসর্গ থেকে মহত্তর আর কী সার্থকতায় মানবজীবনের পরিসমাপ্তি হতে পারে?

অতএব একথা স্পষ্ট, দুঃখবরণ ও আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে কারও কোন ক্ষতি হতে পারে না। এই পৃথিবীর পার্থিব কিছু যদি তাকে হারাতে হয়, অমর জীবনের উত্তরাধিকার লাভ করে বিনিময়ে তার বহুগুণ সে ফিরে পায়।

আত্মার এই কর্মকৌশল। জাতি যাতে জীবিত থাকে সেইজন্য ব্যক্তিকে মৃত্যু বরণ করতে হবে। আজ আমাকে মৃত্যু বরণ করতে হবে যাতে ভারত বেঁচে থাকে এবং তার স্বাধীনতা ও গৌরব ফিরে পায়।

আমার দেশবাসীর কাছে আমার নিবেদন, "ভুলো না, মানুষের সবচেয়ে বড় অভিশাপ গোলাম হয়ে বেঁচে থাকা। ভুলো না, জঘন্যতম অপরাধ অন্যায় ও অবিচারের সঙ্গে আপস করা। মনে রেখো শাশ্বত সেই বিধান: জীবন যদি পেতে চাও, জীবন তাহলে দিতে হবে। মনে রেখো, শ্রেষ্ঠ ধর্ম অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা, তার জন্যে যত মূল্যই দিতে হোক।"

আজকের সরকারের কাছে আমার বক্তব্য, "সাম্প্রদায়িকতা ও অন্যায়ের পথে আপনাদের উন্মত্ত অভিযান ক্ষান্ত করুন। ফিরে যাবার এখনও সময় আছে। এমন অস্ত্র প্রয়োগ করবেন না যা শীঘ্রই আপনাদের বিরুদ্ধে উদ্যত হবে। বাংলাকে আরেকটি সিন্ধু প্রদেশে পরিণত করবেন না।"

আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে। আপনাদের কাছে আমার দ্বিতীয় ও শেষ অনুরোধ, বলপ্রয়োগ করে আমার অনশনে আপনারা হস্তক্ষেপ করবেন না, শান্তিপূর্ণভাবে আমাকে আমার অন্তিম অবস্থায় উপনীত হতে দেবেন। টেরেন্স ম্যাকস্যুইনি, যতীন দাস, মহাত্মা গান্ধীর ক্ষেত্রে এবং ১৯২৬ সালে আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও সরকার অনশনে হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেননি। আশা করি, এবারও তাঁরা তাই করবেন—অন্যথায়, বলপ্রয়োগ করে আমাকে খাওয়াবার যে কোন প্রচেষ্টাকে আমি আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে বাধা দেব, যদিও তার পরিণাম হবে অপর অবস্থা থেকে আরও সঙ্গীন ও বিপজ্জনক।

২৯শে নভেম্বর ১৯৪০ থেকে আমি অনশন শুরু করছি।

প্রেসিডেন্সি জেল, ভবদীয়

২৬।১১।১৯৪০ সুভাষচন্দ্র বসু

পুনশ্চ ঃ—পূর্বেকার অনশনের মতই, আমি কেবলমাত্র লবণজল গ্রহণ করব। কিন্তু প্রয়োজন বোধ করলে পরে তাও বন্ধ করে দিতে পারি।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদ

সমীপেষু

মহাশয়গণ,

আপনাদের কাছে এই আমার শেষ আবেদন।

২। ইতোমধ্যে আমি সরকারকে লিখে জানিয়েছি তাঁরা যেন বলপ্রয়োগ করে খাওয়াবার প্রচেষ্টা না করেন। তাঁদের এ কথাও বলে দিয়েছি, তা সত্ত্বেও এই প্রচেষ্টা করা হলে, আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি তা বাধা দেব, যদিও তার পরিণাম হবে "অপর অবস্থা থেকে আরও সঙ্গীন ও বিপজ্জনক।" ৩০শে অক্টোবর তারিখে প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে লেখা গোপনীয় চিঠিতে এবং ২৬ নভেম্বর তারিখে সরকারকে লেখা চিঠিতে আমি আমার অবস্থা পরিষ্কারভাবে

বুঝিয়ে বলেছি। এইজন্য জেল-কর্তৃপক্ষর কাছ থেকে যখন আভাসে-ইঙ্গিতে জানলাম যে আমার ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ করে খাওয়াবার কথা এখনও চিন্তা করা হচ্ছে, আমি তাতে বিস্মিত হই।

৩। এই বিষয়ে উল্লিখিত চিঠি দুটিতে যে সকল যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে তার সবটা পুনরুল্লেখ করব না, তবে সংক্ষেপে আমার অবস্থাটা আরেকবার বিবৃত করতে চাই।

৪। প্রথমত সরকার যখন উগ্র সাম্প্রদায়িকতা মিশ্রিত অবিচার ও অবৈধতা দ্বারা আমার জীবন দুর্বিষহ করে তোলবার জন্য দায়ী, তখন বলপ্রয়োগ করে আমাকে খাওয়াবার কোন নৈতিক অধিকার সেই সরকারের নেই।

৫। এই পরিস্থিতিতে বলপ্রয়োগ করে আমাকে খাওয়াবার আইনত কোন প্রাধিকারও সরকারের নেই। আমার জানা এমন কোন আইন নেই যা এই বিষয়ে সরকারকে বলপ্রয়োগ করার ক্ষমতা দান করে। সরকারের বিভাগীয় একটি আদেশ আইনের স্থান নিতে পারে না, বিশেষত যখন তা ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে।

৬। প্রতিনিবৃত্ত হবার জন্য আমার বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও বলপ্রয়োগ করে আমাকে খাওয়াবার যদি কোন প্রচেষ্টা করা হয়, তাহলে তার ফলে দৈহিক বা মানসিক যে আঘাত বা যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতে হতে পারে তার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যাঁরা এই প্রচেষ্টায় লিপ্ত থাকবেন তাঁরা দেওয়ানী ও ফৌজদারী দায়ে দায়িক থাকবেন।

৭। নীতিগত উল্লিখিত প্রসঙ্গগুলি ছাড়াও, অনশন আরম্ভ করার পূর্ব ও পরবর্তী আমার দৈহিক অবস্থায় আমার উপর বলপ্রয়োগ করে খাওয়াবার প্রচেষ্টা চালানো অসম্ভব হবে। এ কথা যেন সম্পূর্ণ খেয়াল রাখা হয় যে, এইরকম অবস্থায় বলপ্রয়োগ করে খাওয়াবার যা উদ্দেশ্য তাই ব্যর্থ হবে এবং আমাকে বাঁচিয়ে রাখার পরিবর্তে আমার মৃত্যুকে তা ত্বরান্বিত করবে। এই কারণে বলপ্রয়োগ

করার জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী দায় স্বভাবত আরও বৃদ্ধি পাবে।

৮। এ প্রসঙ্গে আমি আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই যে, বলপ্রয়োগ করে খাওয়ানোর প্রচেষ্টা যদি করা হয়, তার ফলে যে অসহ্য ও দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রণা আমাকে ভোগ করতে হবে তার থেকে মুক্তি পাবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া আমার গত্যন্তর থাকবে না। একমাত্র আত্মহত্যা করেই তা সম্ভব হতে পারে এবং তার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে সরকারের উপর ন্যস্ত হবে। যে লোক জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তার কাছে জীবন শেষ করার হাজার পন্থা খোলা থাকে এবং পৃথিবীতে কোন শক্তি নেই যা তার মৃত্যুকে নিবৃত্ত করতে পারে। আমি সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ উপায় বেছে নিয়েছি এবং কম শান্তিপূর্ণ ও আরও উগ্র পন্থা অবলম্বন করতে আমাকে বাধ্য করা হলে তা হবে নিতান্তই নৃশংসতা। যে পন্থা এখন আমি গ্রহণ করেছি তা সাধারণ উপবাস নয়। এই পন্থা কয়েক মাসের পরিণত চিন্তার ফল এবং কালীপূজার পুণ্য তিথিতে আত্মোৎসর্গের সংকল্পের মধ্যে তা পাকাপাকিভাবে স্থির হয়ে গেছে।

৯। এর আগে কয়েকবার আমি অনশন ধর্মঘট করেছি, কিন্তু এবারকার অনশন অস্বাভাবিক ধরনের। পূর্বে কখনও এরকম অনশন করিনি।

১০। মানুষ কেবল অন্নেই বেঁচে থাকে না। তার নৈতিক ও আত্মিক পুষ্টিরও প্রয়োজন আছে। এই থেকে যখন তাকে বঞ্চিত করা হয়, আপনারা আশা করতে পারেন না সে তখন বেঁচে থাকবে—কেবলমাত্র আপনাদের মতলবের পোষকতা করতে অথবা আপনাদের ইচ্ছার সঙ্গে খাপ খেয়ে চলতে।

১১। ২৬শে নভেম্বর তারিখের আমার চিঠিতে আমি আগেই জানিয়ে রেখেছি, আপনাদের কাছে আমার মাত্র দুটি অনুরোধ আছে—প্রথমত ২৬শে নভেম্বর তারিখের আমার চিঠিটি, যা আমার রাজনৈতিক প্রতীতি, যেন সযত্নে সরকারী মহাফেজখানায় সংরক্ষিত

হয়, এবং দ্বিতীয়ত, শান্তিতে আমাকে যেন এ জীবন শেষ করতে দেওয়া হয়। এতে কি আপনাদের কাছে খুব বেশি কিছু চাওয়া হল?

ভবদীয়

সুভাষচন্দ্র বসু

প্রেসিডেন্সি জেল

১৫।১২।৪০

আমার জীবনের বাণী

নেতাজীর ১৯৪০ সালে জেলে থাকাকালীন কাগজপত্রের মধ্যে দর্শনবিষয়ক এই লেখাটি পাওয়া যায়। এটি এই প্রথম প্রকাশ করা হচ্ছে। লেখাটি 'প্রেরিত হয় নাই' চিহ্নিত ছিল, স্বভাবত তার অর্থ এটি সরকারের কাছে পাঠানো হয়নি। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এটি তিনি লেখেন ১৯৪০ সালের ২৯এ নভেম্বর, যে দিন তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে বিনা বিচারে বেআইনী ভাবে তাঁকে আটক রাখার প্রতিবাদে আমরণ অনশন শুরু করেন। শ. ক. ব.।

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। পিছু ফেরার আর উপায় নেই। আজ সকাল থেকে আমার অনশন শুরু হল। বাংলা সরকারকে এর আগেই আমি একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছি তাতে আমার রাজনৈতিক প্রতীতি বিবৃত আছে। এখন আমি যা জানাতে চাই তাকে বলা যেতে পারে আমার জীবনের বাণী। আমি যখন থাকব না, আমার ইচ্ছা এটি তাদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে যারা জীবনের গভীরতর সমস্যা সম্পর্কে উৎসুক—এবং বিশেষ করে আমার প্রিয় পাত্রটির কাছে যে এরই মধ্যে আমার দার্শনিক চিন্তাধারা সম্পর্কে কিছুটা আভাস পেয়েছে।

আমার মনে হয়, প্রথমে এবং সর্বাগ্রে চিন্তাবিদ্ হবার জন্যই প্রকৃতি আমাকে মূলত গড়ে তুলেছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রের পাকে পড়ে আমার জীবন হয়ে ওঠে অশান্ত রাজনৈতিক কর্মব্যস্ততার জীবন। তার ফলে ভারতের তথা বিশ্বের চিন্তাজগতে কোন অবদান রেখে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিছু দার্শনিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নানা সমস্যা সম্পর্কে আমার কিছু সুনির্দিষ্ট অভিমত আছে। আমার ইচ্ছা, আমাদের পরে যারা আসবে তারা সেগুলি আরও সম্প্রসারিত করবে এবং সেগুলি নিয়ে কাজ করে যাবে। নিজের সম্পর্কে আমি এইটুকু দাবি করতে পারি যে, আমার চিন্তাগুলো শূন্যচারী নয়। আমরা যে বাস্তব জগৎকে জানি তার সঙ্গে

তাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং তা উৎসারিত হয়েছে বিরামবিহীন এক কর্মজীবন থেকে—যে জীবন মাটির সঙ্গে তার যোগ কখনও হারায়নি।

বিশ্ব অভিব্যক্তির পরবর্তী পর্যায়ের জন্য প্রয়োজন একটি নতুন দর্শন, নীতিগত এক নতুন ধারণা এবং অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক থেকে নতুন এক ব্যবস্থা। এই বিষয়ে আমাদের কি দেবার আছে?

নব্য দর্শন—গত কয়েক দশকের মধ্যে মৌলিক বলা যেতে পারে এমন কোন দার্শনিক চিন্তায় ইংলণ্ডের উল্লেখযোগ্য কোন অবদান নেই। আমেরিকা দিয়েছে প্রয়োগবাদ (Pragmatism), ফ্রান্স দিয়েছে আঁরি বার্গসঁ এবং জার্মানি হেগেল-কে। আধুনিক দর্শনের সারতত্ত্ব হেগেলীয়, অর্থাৎ দ্বন্দ্ববাদ (Dialectics) কিন্তু বস্তুজগৎ সম্পর্কে হেগেলের ধারণাকে তা অগ্রাহ্য করেছে। যতদূর আমার জানা আছে নাৎসীবাদের মূলে কোন দার্শনিক তত্ত্ব নেই। গান্ধীবাদ ভ্রান্ত নীতিতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার দর্শন অস্পষ্ট ও রহস্যাবৃত। আমরা যদি নতুন ভারত চাই আমাদের অবশ্য প্রয়োজন এক নব্য দর্শনের।

দার্শনিক সমস্যার মধ্যে প্রধান দুটি সমস্যা এই (১) দেশকালাতীত অবস্থায় সদ্বস্তুর প্রকৃতি কী এবং (২) আমরা যে বস্তুজগৎকে জানি (অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগৎকে) তারই বা কী প্রকৃতি এবং তা কীভাবে অভিব্যক্ত হয়। (নীতিতত্ত্ব, অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে অভিব্যক্তি সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকা একান্ত দরকার)

বেদান্ত যখন বলে দেশকালাতীত বস্তুর অস্তিত্ব অজ্ঞাত ও জ্ঞানাতীত তখন তা ঠিকই বলে। কিন্তু পরম ব্রহ্মকে আমাদের মন ইন্দ্রিয়, ইত্যাদি মারফত যে আমরা ধরবার চেষ্টা করব না তার কোন কারণ নেই। আসলে কিন্তু এই চেষ্টাই অনাদিকাল থেকে হয়ে আসছে, এবং তারই ফলে উদ্ভব হয়েছে বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের যারা নিজেদের মধ্যে প্রায়শই দ্বন্দ্বরত। (পরমব্রহ্মের) কোন একটি

'বিধৃত' চিত্র'-কে মিথ্যা বলে বরবাদ করা ঠিক নয়—যদিও একটা বিধৃত চিত্র অপর একটি থেকে বেশী মাত্রায় মূলানুগ।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দর্শনের কোন মতবাদকেই নিন্দা করেন নি। তাঁরা বলেছেন, "মানুষের যাত্রা মিথ্যা থেকে সত্যের অভিমুখে নয়, সত্য থেকে আরও বড় সত্যের দিকে।" আমার মতে তাঁরা ঠিকই ভেবেছিলেন যে প্রতিটি দার্শনিক চিন্তাধারায় কিছু পরিমাণে সত্য থাকে।

পরম তত্ত্বকে নানাপ্রকার আখ্যা দেওয়া হয়েছে যেমন "ভাব" বা "আদিভাব" (হেগেল), এষণা (ফন হার্টম্যান) 'এলাঁ ভিটাল' বা প্রাণিত আবেগ (বার্গসঁ), 'চিৎ' বা চেতনা (বেদান্ত), "আনন্দ"- (বেদান্ত), 'শক্তি' বা ক্ষমতা (তন্ত্র), প্রেম (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দর্শন) ইত্যাদি। এই ধারণাগুলি সবই সত্য, যদিও কেবল-মাত্র অংশত সত্য—তবে আমার মতে 'চিৎ', 'প্রাণ' এবং 'প্রেম' আর সবের থেকে অধিক সঠিকভাবে দেশকালাতীত সদ্বস্তুর প্রকৃতি জ্ঞাপন করে। মানুষ হিসাবে আমাদের সীমিত ক্ষমতা সত্ত্বেও পরম তত্ত্বকে ধরবার প্রয়াস না করে আমরা পারি না, অংশত আমাদের দুর্দমনীয় দার্শনিক মনোবৃত্তির জন্য এবং অংশত যেহেতু নীতিতত্ত্ব, অর্থনীতি ও রাজনীতির কোন মতবাদের পক্ষে পরমতত্ত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা থাকা দরকার সেই কারণে। আমাদের চূড়ান্ত ভিত্তি-ভূমি হিসেবে এই প্রকার কোন ধারণা না থাকলে আমাদের ভুল করার সম্ভাবনা থেকে যাবে। এবং আমরা যে কোনরূপ সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই না কেন তাকে দেশকালাতীত এই সদ্বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে হবে।

দ্বিতীয় দার্শনিক সমস্যা "এই জগতের এবং অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার প্রকৃতি কী ?" এই সমস্যা পরিদৃশ্যমান জগৎ সম্পর্কিত এবং এর অন্তর্নিহিত পরম সদ্বস্তু সম্পর্কিত নয়। সমস্যাটির দুটি দিক অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। তা সত্ত্বেও প্রথমটির থেকে দ্বিতীয়টির ব্যবহারিক গুরুত্ব বেশি।

সম্ভবত এই সমস্যা সমাধানের প্রাচীনতম বৈজ্ঞানিক প্রয়াস

করেছিল, সাংখ্যদর্শন। সেই দর্শনের অন্তর্ভুক্ত অভিব্যক্তির ধারণা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক যদিও আজকের দিনে অনেকের কাছে তা অসংস্কৃত বলে মনে হতে পারে। প্রাচ্যের মনীষীরা ছাড়াও প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিকরাও এই প্রশ্ন সমাধানের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। এবং যুগ যুগ ধরে এই প্রয়াস চলে আসছে।

জগতের স্বরূপ কী? তা কি জড়বস্তু, না শক্তি, না মন? জড়বস্তুই বা কী? তা কি একগুচ্ছ সংবেদন? অথবা পুঞ্জীভূত পরমাণু? কিংবা শক্তির অচলরূপ? বিশ্লেষণের পর জড়বস্তুর জড়ত্ব কি টিকে থাকে, না শক্তি বা বলে বিলীন হয়ে যায়? পরমাণু কি জড়বস্তুর কণিকা, না শক্তির কেন্দ্র? এই প্রশ্নগুলি চিত্তাকর্ষক এবং তার উপর নিত্য আলোকপাত করে চলেছে বিজ্ঞানের গবেষণা। হয়ত এ বিষয়ে আমরা আজ যা জানি তার চেয়ে অনেক বেশি জানবে আমাদের পরে যারা আসবে তারা। তবে পরিদৃশ্যমান জগতের স্বরূপ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরের তত বেশি তাত্ত্বিক মূল্য নেই যেহেতু তার সত্যতা শুধু আপেক্ষিকই থাকবে এবং পরমতত্ত্ব তখনও অজ্ঞাত ও জ্ঞানাতীত থেকে যাবে। তৎসত্ত্বেও তার কিছুটা বাস্তব মূল্য থাকবেই।

বাস্তব দিক থেকে অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের ধারণার মূল্য কিন্তু আরও বেশি। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত অভিব্যক্তি সম্পর্কে কয়েকটি মত আমরা দেখতে পাই সাংখ্য মত, স্পেনসারীয় মত, হেগেলীয় মত, বার্গসনীয় মত ইত্যাদি। এই ক্ষেত্রেও প্রতিটি মতে কিছু সত্য নিহিত আছে। যদিও আমার ধারণায় আর সবের চেয়ে হেগেলীয় মতই সত্যের সমীপবর্তী।

হেগেলের মতে অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার প্রকৃতি দ্বন্দ্বসমন্বয়ী (তত্ত্ব, বিপরীত তত্ত্ব, তত্ত্বসমন্বয়) এবং ভাব ও বস্তু দুয়ের মধ্য দিয়েই এক দ্বন্দ্বসমন্বয়ী প্রক্রিয়া অনুসৃত। এখন, আমরা যা দেখছি নিঃসন্দেহে তার অধিকাংশের ব্যাখ্যা ও কারণ দ্বন্দ্ববাদে পাওয়া যায় কিন্তু সবার নয়। প্রকৃতপক্ষে অভিব্যক্তি প্রক্রিয়া ততখানি বৈচিত্র্যহীন ও একবিধ নয় যতখানি দ্বন্দ্ববাদ থেকে আমাদের মনে হয়। যে সব প্রকৃত

অভিব্যক্তিতে এমন কিছু থাকে যা আকস্মিক, আপতিক, দুর্জ্ঞেয়। তার থেকেই আমরা মানতে বাধ্য হই যে, সৃজনশীল অভিব্যক্তির বার্গসনীয় মতে কিছুটা সত্য আছে। তাছাড়া জৈবক্ষেত্র সম্পর্কে বলা যেতে পারে, স্পেন্সারের সরল থেকে জটিল অভিমুখী অভিব্যক্তির ধারণাও অসার নয় এবং জৈব অভিব্যক্তিকে কেবলমাত্র তত্ত্ব, বিপরীত তত্ত্ব ও তত্ত্ব সমন্বয়ের সূত্রে ব্যাখ্যা করা চলে না। অতএব সবচেয়ে নিরাপদ ও সুবিবেচনার পথ হবে, সব মতবাদের মধ্যে কিছুটা সত্যতা আছে ধরে নিয়ে আর সবের চেয়ে হেগেলীয় মত যে সত্যের সমীপবর্তী তা মেনে নেওয়া।

সংক্ষেপে, পরিদৃশ্যমান জগতের স্বরূপের প্রশ্নে, অদ্যাবধি বিজ্ঞানের কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি তা জেনে আমাদের খোলা মনে থাকাই বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞানের আরও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও সত্য প্রকট হতে বাধ্য। ইতিমধ্যে আমাদের মনে রাখা উচিত জড়বাদ সম্পর্কে আগেকার ধারণা সম্পূর্ণ অচল হয়ে গেছে। একদিকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা অন্যদিকে দার্শনিক যুক্তি ও অনুমান, এই দুয়ের আক্রমণে তা পর্যুদস্ত।

আমার বিবেক আমার নিজের

৯ই ডিসেম্বর, ১৯৪০-এ এক সাক্ষাৎকারের প্রতিবেদন।

প্রায়োপবেশনের পরে পরেই আটক অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করে নেতাজী যখন অসুস্থ শরীরে বিশ্রাম করছেন, তখন তাঁর এক বন্ধু মহাত্মা গান্ধীর কাছ থেকে পাওয়া এক টেলিগ্রামের উপর তাঁকে মন্তব্য করতে বলেন। টেলিগ্রামটির বিষয় ছিল বাংলা কংগ্রেসদলকে আবার ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রত্যাহার। গান্ধিজীর টেলিগ্রাম ছিল এই।

ওয়ার্ধাগঞ্জ, ২৮।১১।৪০

[বসু] ভ্রাতাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি সত্ত্বেও হস্তক্ষেপ করিতে অক্ষমতা এমন কি অনিচ্ছা জ্ঞাপনে দুঃখিত। মনে হয় অবাধ্যতার জন্য তাঁহাদের ক্ষমা প্রার্থনা ব্যতীত দণ্ডাদেশ প্রত্যাহৃত হইবে না।

নেতাজী এই মন্তব্য করেন: "আমার রাজনৈতিক গুরু ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি আজ আর নেই। তাঁর কাছ থেকে আমি শিক্ষা পেয়েছি, ব্যক্তিগত সম্বন্ধগুলিকে, মানুষের পক্ষে যতখানি সম্ভব, রাজনৈতিক মতবিরোধের উর্ধ্বে রাখতে হবে। এই জন্য, গান্ধী-বাদীদের হাত থেকে যে লাঞ্ছনা আমি পেয়েছি এবং পাচ্ছি তা সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধীর প্রতি গভীর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও প্রীতি আমি পোষণ করি।

"সুইজারল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ বীর উইলিয়ম টেল-এর উপরে একটি কবিতা ইস্কুলে পড়বার সময় পড়েছিলাম—

শান্তভাবে বলেন তিনি আমার জানু নত হবে
ভগবানের কাছে কেবল ভগবানের কাছে,

অস্ট্রিয়ান শত্রু হাতে যখন আমার জীবন বাঁধা
আমার বিবেক আছে তখন নিজের কাছেই আছে।"[১]

"আমি আমার রাজনৈতিক কর্মজীবনে কখনো কোন অন্যায় করেছি বলে জানি না। অতএব মহাত্মার কাছে আমার জবাব হবে দু-একটি শব্দের রদবদল করে উপরের লাইনকটি।"

১। মূল কবিতা : My knee shall bend, he calmly said,
To God and God alone,
My life is in the Austrians' hands,
My conscience is my own.

বাংলা কংগ্রেসের জট

বাংলা কংগ্রেসের ঘটনাবলীর উপরে নেতাজী ১৯৪০-এর ১০ই ডিসেম্বর থেকে ২৪শে ডিসেম্বরের মধ্যে একাধিক বিবৃতি প্রকাশ করেন। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সংসদীয় সাবকমিটির নামে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বঙ্গীয় কংগ্রেস সংসদীয় পার্টির নেতা শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তার ফলে বিধান সভার কংগ্রেসী দলে ঠিক সেই সময়ে নতুন এক সঙ্কট দেখা দেয়। এই বিবৃতিগুলি একত্রিত করা হয়েছে এবং বাদবিসম্বাদের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি বাদ দিয়ে এই সম্পর্কে নেতাজীর মতামতসহ সুসংবদ্ধ বক্তব্য নিচে দেওয়া হল।

গত কয়েকদিন ধরে কতকগুলি চিন্তাভাবনা ক্রমাগত আমার মনে জাগছে, তার ফলে মনে মনে আমি অশান্তি ভোগ করছি। এইসব চিন্তাভাবনা খুলে বলতে পারলে আমার বিশ্বাস এখনকার তুলনায় কিছুটা মনের শান্তি ফিরে পাব এবং তা আমার স্বাস্থ্যোন্নতি ও রোগ নিরাময়ে সাহায্য করবে। অতএব যাতে ধীরেসুস্থে কয়েকটি বিবৃতি প্রকাশ করতে পারি সেইজন্য আমার ডাক্তারদের কাছ থেকে আমি অনুমতি নিয়েছি। এর মধ্যে কয়েকটি বিবৃতি আমার কাছে এখনই তৈরী রয়েছে। আমার জেলে থাকার সময়ে এগুলি অসম্পূর্ণ চিঠির আকারে লেখা।

বাংলাদেশের কংগ্রেস মহল এখন যে বিষয় নিয়ে বিক্ষুব্ধ প্রথমেই আমি সেই বিষয়ে আলোচনা করছি, অর্থাৎ, শ্রীশরৎচন্দ্র বসু সম্পর্কে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের ফরমান। দেশ যখন এত বড় একটা সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছে এবং কংগ্রেস নেতারা নিজেরাই যখন বারে বারে ঐক্যের জন্য আবেদন করছেন, তখন কী করে মৌলানা এরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলেন, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। আমরা যে আমাদের দিক থেকে মনেপ্রাণে জাতীয় একতার

জন্য উদ্‌গ্রীব এবং যা কিছু মতবিভেদ ও সমস্যা রয়েছে তার সম্মানজনক মীমাংসা মেনে নিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, তা আমি না বললেও পারি। কিন্তু কোন কোন কংগ্রেস নেতা যে মনোভাব গ্রহণ করেছেন, আমরা তা মেনে নিতে পারি না। যেমন, বামপক্ষের বন্ধু ও সহকর্মীস্থানীয় কারও কাছে সম্মানজনক আপসের কোন প্রস্তাব করা যেতে পারে না। অতএব, জনসাধারণের চোখে আমাদের হেয় প্রতিপন্ন করার বা আমাদের অপমান বা কলঙ্কিত করার যদি কোনপ্রকার চেষ্টা হয়, তাহলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমরা সেপ্রকার আক্রমণকে শুধু প্রতিহতই করব না ; যে ক্ষেত্রে সম্ভব আমরা পাল্টা আক্রমণ করতে বাধ্য হব। বৃহত্তর নানা সমস্যা নিয়ে আমরা ব্যাপৃত আছি বলে মৌলানা এবং তাঁর বন্ধুরা যেন না ভাবেন, আমরা আমাদের 'ঘরোয়া ফ্রন্টে' দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণ অগ্রাহ্য করব।

১৯৩৯-এর জুলাই থেকে বঙ্গীয় প্রদেশিক কংগ্রেস কমিটির উপর যে আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, শ্রীশরৎচন্দ্র বসুকে আক্রমণ তারই আরেক পর্যায় মাত্র। অতএব এ ব্যাপারে বি. পি. সি. সি. অপরিহার্য-ভাবে লিপ্ত না হয়ে পারে না। বঙ্গীয় কংগ্রেস সংসদীয় পার্টির মধ্যে মৌলানা যখন জোর করে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন, তখন বি. পি. সি. সি.-র জানা দরকার কারা তাদের পক্ষে, কারা বিপক্ষে। ওই পার্টিতে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হই বা না হই, কিছু আসে যায় না। সংখ্যায় বেশিই হোক, কমই হোক, বাংলার আইনসভায় আমাদের বন্ধু ও সমর্থকরা কংগ্রেস সংসদীয় পার্টির নামেই কাজ চালিয়ে যাবেন। আইনসভায় অ্যাডহক কমিটি[১] থেকে যাঁরা সদস্য আছেন তাঁরা কংগ্রেস সংসদীয় পার্টি বলে দাবি করতে পারেন না, যেহেতু তাঁরা একমাত্র বৈধ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির আনুগত্য স্বীকার করেন না।

এ কথা না বললেও চলে যে, যাঁরা এখন বি. পি. সি. সি.-র পক্ষে

১। কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের নীতির বিরুদ্ধে নির্বাচিত কংগ্রেস কমিটি অধিকাংশ সদস্য বিদ্রোহ করার পর, হাই কমাণ্ড বাংলায় একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করেন।

নেই, তাঁরা পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে পুনরায় মনোনীত হবার অধিকার হারাবেন। বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনে মৌলানার নামে কত ভোট পড়বে এবং বি. পি. সি. সি.-র নামেই বা কত পড়বে তা আন্দাজ করতে বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না।

এবং এখানে এখনই আমি বলে রাখছি, কংগ্রেস হাই কমাণ্ড তাঁদের বর্তমান নীতিতে যদি অটল থাকেন তাহলে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের সময় শুধু বাংলাতেই নয়, সারা ভারতে একই সঙ্গে আরেকটা নির্বাচন হবে। গতবারে বামপন্থীদের কাঁধে চেপে দক্ষিণ-পন্থীরা যেমন করে গদি দখল করেছিল, সে সুযোগ আর তারা পাবে না।

সাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে-কোন প্রশ্ন সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দেবার অধিকার জনসাধারণের। বাংলার বর্তমান সংসদীয় জট থেকে যাতে উদ্ধার পাওয়া যায় সে বিষয়ে আমি একটা প্রস্তাব করতে চাই। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ শ্রীশরৎচন্দ্র বসুকে নিন্দাবাদ করেছেন এবং তাঁকে বহিষ্কার করতে চাইছেন। আর সবার তাঁর উপর পুরোপুরি আস্থা আছে। কিন্তু বাংলার জনসাধারণ কী বলে? তাহলে, এই প্রশ্নে আইনসভার সব কংগ্রেস সদস্য পদত্যাগ করে পুনর্নির্বাচন প্রার্থী হোন। চুনোপুঁটিদের সঙ্গে লড়াই করে লাভ নেই। মহাত্মা গান্ধী তাঁর আশীর্বাদ ও সমর্থন দিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের নিজেই দাঁড় করান। তাঁদের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে আমরাও প্রার্থী দাঁড় করাই। তারপর, সম্পূর্ণ আস্থার সঙ্গে এবং পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা নির্বাচকমণ্ডলীর রায়ের প্রতীক্ষা করব। মহাত্মা কি রাজী হবেন?

* * *

পার্টির আদেশ কার্যকর করতে মৌলানা পার্টি (সংসদীয়) নেতাকে পার্টি থেকে এবং আইনসভা থেকে বিতাড়ন করতে চাইছেন। চরম গোপনতায় সংসদীয় পার্টিকে বিন্দুমাত্র না জানিয়ে মৌলানার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং তা গৃহীত হয়েছে ঘটনা ঘটে যাবার প্রায় ছ'মাস পরে।

প্রকৃতপক্ষে এই আক্রমণ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির উপর এবং তার পরিষদীয় ফ্রন্টের উপর আক্রমণ। বাংলার আইনসভায় আমাদের যে একটা শক্ত ঘাঁটি আছে কে না জানে? এই ঘাঁটিটাকে মৌলানা ভেঙেচুরে ধ্বংস করতে চেয়েছেন কিন্তু পারেননি।

এই সূত্রে মৌলানাকে আমি একটা পরামর্শ দিতে চাই। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এবং সংসদীয় পার্টির উপর এইরকম হুকুম জারী করে তাদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু এই প্রদেশে তাঁর না আছে সেই প্রতিষ্ঠা, না আছে সেই লোকবল যাতে এখানকার লোকদের পক্ষে তাঁর এই কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া সম্ভব। তাই ভবিষ্যতে ডিক্টেটারের চালে চলবার সময় নিজের সম্বন্ধে এ কথা যেন তিনি খেয়াল রাখেন।

* * *

আশা করি আমি প্রমাণ করে দেখাতে পেরেছি যে শ্রীশরৎচন্দ্র বসুর বিরুদ্ধে মৌলানার যা কিছু অভিযোগ, তার কোনটারই কোন ভিত্তি নেই। মৌলানা নিজেও যে তাঁর দুর্বলতার কথা একেবারে জানেন না তা নয়। সেই কারণেই ঘরোয়াভাবে ও সাধারণের সমক্ষে বাঁধাধরা একটা কারণ দেখানো ছাড়া তাঁর গতি নেই, যথা: শৃঙ্খলা-ভঙ্গ। শৃঙ্খলার সত্যিকার তাৎপর্য কী এবারে পরীক্ষা করে দেখা যাক।

কোন স্বৈরতান্ত্রিক সংগঠনে শৃঙ্খলার অর্থ ওপরওয়ালা অফিসার বা অফিসারদের হুকুম মেনে চলা। গণতান্ত্রিক সংগঠন এর অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছাকে স্বীকার করে নেওয়া। মৌলানা এবং তাঁর চিন্তাধারার কংগ্রেসকর্মীরা দাবি করছেন, যেহেতু নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সংখ্যালঘু বামপন্থীদের উচিত বিনাপ্রতিবাদে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা পালন করা এবং তা যদি তারা না করে তাদের শাস্তিভোগ করতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনাধিকারের এই নীতি স্বভাবত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা দরকার। কিন্তু তা করা হয়নি। এখানে এই বাংলাদেশে সংখ্যালঘু দক্ষিণপন্থীরা বামপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠকে বিনা দ্বিধায় ও সংকোচে অগ্রাহ্য

করতে চাইছে এবং তাতে তারা সব সময় দক্ষিণপন্থী হাই কমাণ্ডের সমর্থন পাচ্ছে। এভাবে দু দিক থেকে সমান সুবিধা নেওয়া চলে না। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনাধিকার মানা হবে এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে সংখ্যালঘুর শাসনাধিকার থাকবে—এ হয় না। অতএব দিনের পর দিন মৌলানা "যে কোন মূল্যে শৃঙ্খলারক্ষা"র যে যুক্তি দেখিয়ে চলেছেন তা ধোপে টেকে না।

বলা যেতে পারে, যেহেতু হাই কমাণ্ড কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কার্য-নির্বাহক সংস্থা, যেখানে যত কংগ্রেসকর্মী ও কংগ্রেস সংগঠন আছে সবার কর্তব্য তার নির্দেশ মেনে চলা। কিন্তু এই ধরনের শৃঙ্খলাচরণ একমাত্র কর্তৃত্বকেন্দ্রিক সংগঠনেই সম্ভব। আমি আগেই বলেছি, গণতান্ত্রিক সংগঠনে শৃঙ্খলার একমাত্র অর্থ "সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনাধিকার"। কোন অবস্থাতেই তা বোধ হয় ওপরওয়ালা অফিসারের কাছে নতিস্বীকার বোঝায় না।

বর্তমান ক্ষেত্রে মৌলানা বঙ্গীয় কংগ্রেস সংসদীয় পার্টিকে সম্পূর্ণ-ভাবে অগ্রাহ্য করেছেন এবং পার্টির অজ্ঞাতসারে পার্টির একটি প্রস্তাবকে কার্যকর করার জন্য পার্টিনেতাকে শাস্তি দেবার উদ্যোগ করছেন। প্রস্তাবটি ছিল এই, আপার হাউসে পরোক্ষ নির্বাচনের প্রশ্নে ভোটের দাবিতে পার্টিনেতা দলীয় সদস্যদের উপস্থিত থাকার জন্য হুইপ প্রয়োগ করবেন।

যদি এই যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, সংখ্যাধিক্যের শাসনাধিকার নীতি কেবলমাত্র নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যাবে এবং বাকি সব কংগ্রেস-সংগঠনের নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বলতে কিছু নেই, অতএব তারা অন্ধভাবে হাই কমাণ্ডের অর্থাৎ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশ মেনে চলবে—তাহলে আমাকে কংগ্রেস গঠনতন্ত্র উল্লেখ করতে হয়। গঠনতন্ত্রের ২ ধারায় স্পষ্ট বলা আছে, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মত স্থানীয় সংগঠনগুলি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মতই কংগ্রেসের অবিভাজ্য অংশ এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির দয়ায় তাদের

উদ্ভব হয়নি। অতএব যে নীতিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি চালিত হবে, সেই নীতিতেই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিরও চালিত হওয়া উচিত।

তাছাড়া, একজন ডিক্টেটার অথবা কোন এক চক্রের কর্তৃত্ব বরদাস্ত করা চলে যদি তাদের কারও নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলে তেমন প্রতিষ্ঠা বা আনুগত্য থাকে। বাংলাদেশ সম্পর্কে আসল অবস্থা কী তা মৌলানার, এমন কি মহাত্মা গান্ধীরও না জানার কথা নয়।

শেষ পর্যন্ত, কংগ্রেসকে যেরূপ জাতীয় সংগঠন বলে আমরা দাবি করি যদি তা সত্যি তাই হয়, সেই দাবির যৌক্তিকতা নির্ভর করবে জনসাধারণের কতটা আস্থা তা অর্জন করতে পেরেছে তার উপর। বাংলায় যেহেতু অ্যাডহক কমিটি জনসাধারণের আস্থাভাজন নয়, বালীগঞ্জ সারকুলার রোড অথবা ওয়ার্ধা থেকে যত ফরমানই আসুক কিছুতেই তাতে প্রাণসঞ্চার করে তাকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে পরিণত করা যাবে না। অপরপক্ষে, ঐ দুই জায়গা থেকে কোন ফতোয়াই বৈধ বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে খতম করতে পারবে না। এই কারণেই তথাকথিত অধিকারচ্যুত হবার পরও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধীনে থেকেই আমরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও যাব।

এই থেকে বোঝা যাচ্ছে, বাংলার আইনসভার যে সব সদস্য বৈধ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকে মানেন, কেবলমাত্র তাঁরাই বঙ্গীয় কংগ্রেস সংসদীয় পার্টির নামে কাজ করবার অধিকারী। যদি অ্যাডহক কমিটি চায়, তাঁরাও আইনসভায় অ্যাডহক পার্টি গঠন করতে পারেন কিন্তু তাঁরা কংগ্রেস সংসদীয় পার্টির নাম আত্মসাৎ করতে পারবেন না।

শৃঙ্খলারক্ষার যুক্তির সঙ্গে অনুরূপ আরেক যুক্তি প্রায়ই দেখানো হয়ে থাকে। সাধারণ নির্বাচনের সময় আইনসভার সদস্যরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁদের তা মেনে চলা উচিত। এই যুক্তি এতই খেলো যে এ সম্পর্কে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

সেই অঙ্গীকার গ্রহণের পর থেকে সময়, পারিপার্শ্বিক অবস্থা,

পরিস্থিতি ইত্যাদির আমূল পরিবর্তন হয়েছে। যে ওয়ার্কিং কমিটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির আস্থাভাজন ছিল এবং যা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিকেও শ্রদ্ধার চোখে দেখত—তার আর অস্তিত্ব নেই। আজ ওয়ার্কিং কমিটিতে বাংলার কংগ্রেসকর্মীদের অধিকাংশের আস্থা আর নেই। বি. পি. সি. সি.-র আস্থাভাজন নিশ্চয় তা নয়, এবং তার দিক থেকেও, বি. পি. সি. সি.-তেও তার আস্থা নেই। পুরনো অঙ্গীকার আপনাআপনি তাই বাতিল হয়ে গেছে। আগেকার ওয়ার্কিং কমিটি, সেইসঙ্গে আগেকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতি আমাদের ফিরিয়ে দিন—তখনই আগেকার অঙ্গীকার পালন করা হচ্ছে দেখতে পাবেন—অন্যথা নয়।

আমি জানি, যুক্তির দোহাই দিয়ে বলা হবে, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান মাত্রেই "নীতির ধারাবাহিকতা" বলে একটা জিনিস থাকে। কিন্তু বৈপ্লবিক পরিবর্তন যখন দেখা দেয় তখন "নীতির ধারাবাহিকতা" সম্ভব নয়।

*　　*　　*

বি. পি সি. সি.-ই একমাত্র সংগঠন নয় যা হাই কমাণ্ডের হাতে নিগৃহীত হয়েছে। অন্য প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিরাও, যেমন দিল্লী, কেরালা ইত্যাদির, সমানভাবে নিগৃহীত হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসী ডিক্টেটররা যাদুদণ্ড ঘুরিয়ে এই সংগঠনগুলিকে খতম করতে পারবে না। হাই কমাণ্ডের দয়ায় এই সংগঠনগুলি গড়ে ওঠেনি, হাই কমাণ্ড তাই কলমের এক খোঁচায় তাদের লোপ করতে পারে না। যতদিন এইসব সংগঠনের উপর জনগণের আস্থা থাকবে, তারা কংগ্রেস কমিটি হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবে। কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসার প্রশ্নই উঠতে পারে না, যেহেতু আমরাও কংগ্রেসকর্মী এবং আমাদের সংগঠনগুলিও কংগ্রেস সংগঠন। সংসদীয় ক্ষেত্রের বাইরে হাই কমাণ্ডের সঙ্গে যেমন আমরা লড়াই করেছি ভবিষ্যতে দেশব্যাপী নির্বাচনেও যদি তাঁদের সঙ্গে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়, তাহলে তা আমরা কংগ্রেসের নামেই করব, কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে করব

না। কংগ্রেস আর কারও কাছে যত আপনার, আমাদের কাছেও ততটা।

শুনলাম মৌলানা সবাইকে বলে বেড়াচ্ছেন তিনি বাঙালীর চেয়েও সাচ্চা বাঙালী। তাই যদি হন, তাহলে তিনি যেন বাংলার ঐতিহ্য এবং আমাদের মহান নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তাহলে তিনি যেন তাঁর প্রতিহিংসানীতি ত্যাগ করে সম্প্রীতি ও সহনশীলতার মধ্যে দিয়ে এই প্রদেশের জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করেন। সম্প্রীতি ও সহনশীলতার মধ্যে দিয়েই দেশবন্ধু শত্রুকে মিত্রে পরিণত করে ঐক্যবদ্ধ বাংলা গড়ে তুলেছিলেন। অন্য কোন উপদেশই এই প্রদেশের মর্মস্পর্শ করতে পারবে না।

বঙ্গীয় কংগ্রেস সংসদীয় পার্টির মিটিং শেষ মুহূর্তে মুলতবী রেখে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা চরম পরাজয়ের হাত থেকে নিজেদের মান বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গঠনতান্ত্রিক পদ্ধতি সম্পর্কে মৌলানার যদি কোন ধারণা থাকত তাহলে তিনি বুঝতে পারতেন যে, যথারীতি পার্টির মিটিং আহ্বান করার পর তাঁর বা বঙ্গীয় সংসদীয় পার্টির জেনারেল সেক্রেটারির তা বাতিল করবার কোন ক্ষমতা বা অধিকার ছিল না।

বেপরোয়া জবরদস্তির সঙ্গে উল্লিখিত মিটিং বাতিল করার হুকুম দিয়েই মৌলানা ক্ষান্ত হননি, তিনি এখন চাবুক হাতে হাজির হয়েছেন, যারা তাঁর রাজকীয় বেআদব হুকুমনামা মাথা পেতে মেনে নেয়নি তাদের শায়েস্তা করতে। মৌলানা বরাবরই জাহির করে থাকেন, তিনি বাঙালীর চেয়েও সাচ্চা বাঙালী কিন্তু দুনিয়ার এই প্রান্তে যে আতিথেয়তা, ব্যবহার ও ভব্যতার চল আছে সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। জেনারেল সেক্রেটারির আমন্ত্রণে এবং তাঁরই উদ্যোগে সংসদীয় পার্টির সদস্যরা যখন তাঁর বাড়িতে সমবেত হন, তাঁদের অভ্যর্থনা করে আসন গ্রহণ করতে বলার মত সামান্য ভদ্রতাবোধও মৌলানার ছিল না। যতক্ষণ তাঁরা তার বাড়িতে ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি একবারও দর্শন দেননি।

মহামহিম মৌলানার এবার বোঝবার সময় হয়েছে যে মোগল বাদশার চালে চলতে চেষ্টা করে কোন ফয়দা হবে না। তা করার প্রয়াস করে তিনি নিজেকেই হাস্যাস্পদ করছেন। বাংলাদেশে মুষ্টিমেয় অনুগামী ও যৎসামান্য যা প্রভাব তাঁর আছে তারই জোরে তিনি এই প্রদেশের বুকে দুরমুস চালিয়ে যেতে পারেন না।

আমি স্থিরনিশ্চিত বঙ্গীয় কংগ্রেস সংসদীয় পার্টির সদস্যরা তাঁর হালফিল হুমকিকে যথাযোগ্য তাচ্ছিল্যের সঙ্গে গ্রহণ করবেন। মৌলানাকে আমি পরামর্শ দিচ্ছি, এই প্রদেশে আরও বিভেদ সৃষ্টি করার প্রয়াস থেকে তিনি ক্ষান্ত হন। বরঞ্চ ভারতের জনসাধারণ আপাতত ব্যাপকতর যে সব প্রশ্ন নিয়ে বিচলিত সেইসব দিকে তাঁর সামর্থ্য ও মনোযোগ নিবদ্ধ করুন।

আর একটি কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ করছি। মৌলানাকে আমি জানিয়ে রাখছি, কংগ্রেসের প্রস্তাব ও গঠনতন্ত্র অনুযায়ীও নিখিল ভারত সংসদীয় সাবকমিটিকে তিনি যতখানি সর্বশক্তিমান বলে মনে করেন, ততটা তা নয়। নিখিল ভারত সংসদীয় সাবকমিটিকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে হয়, এবং বাংলার কথা যদি বলতে হয়, কে না জানে এখানে বৈধ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কোনটি? আরেকবার মৌলানাকে আমি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, বাংলাদেশে যদি কখনও প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এখানকার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিই সেই নির্বাচন চালাবে এবং তখন আমরা দেখে নেব এই কংগ্রেস থেকে উদ্ভূত অ্যাডহক কমিটির নির্বাচনে কী হাল হয়।

কংগ্রেসের মোগল বাদশাহটি খুব তাড়াতাড়ি একটি ভাঁড়ে পরিণত হচ্ছেন। মোহগ্রস্ত হয়ে তিনি ভাবছেন, বালীগঞ্জ সারকুলার রোডের তাঁর কামরা থেকে মাঝে মাঝে তাঁর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বজ্রনিক্ষেপ করে তিনি বাংলা মুলুককে শাসনে রাখতে পারবেন। তিনি যা করে চলেছেন তা যে খোদ কংগ্রেস গঠনতন্ত্রেরই বিরোধী সেদিকে তাঁর খেয়ালই নেই। এবং তাঁর শাস্তিমূলক ব্যবস্থার দাপটে

তিনি যে কংগ্রেস থেকে আপামর জনসাধারণকে শীঘ্রই বিতাড়িত করে ছাড়বেন, তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।

তাঁকে দেখে আমার শেষ মোগল সম্রাটদের কথা মনে পড়ে যায়। তখনও পর্যন্ত রাজকীয় জাঁকজমক আড়ম্বরের মধ্যে থাকার ফলে তাঁরা একেবারেই বুঝতে পারেননি যে তাঁদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে, বুঝতে পারেননি তাঁদের সাম্রাজ্য আগেই বেহাত হয়ে গেছে। আমাদের এই একালের বাদশাহর কাণ্ডজ্ঞান কে ফিরিয়ে আনতে পারে, আমি ভেবে পাই না।

ওয়ার্কিং কমিটি তার সব ক্ষমতা মহাত্মা গান্ধীকে অর্পণ করে এবং তার বেশির ভাগ সদস্যই জেলে চলে যায়। মৌলানা আবুল কালামের হাতে তাই কোনই ক্ষমতা নেই, তবু তিনি বিখ্যাত ফরাসী সম্রাটের মত ভেবে চলেছেন—"আমিই রাষ্ট্র"। আজ যদি কোন একজন ব্যক্তির কংগ্রেসের নামে কথা বলার অধিকার থাকে, তা আছে মহাত্মা গান্ধীর, মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নয়।

এমন কি যখন ওয়ার্কিং কমিটি চালু ছিল, তখনও না প্রেসিডেন্টের, না নিখিল ভারত সংসদীয় সাবকমিটির শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার ছিল। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের যখনই দরকার হোক, ওয়ার্কিং কমিটিকে সর্বদা মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এ বিষয়ে মৌলানার যদি কোন সন্দেহ থেকে থাকে, তাকে অনুরোধ করছি, ওয়ার্কিং কমিটির যে প্রস্তাবে সংসদীয় সাবকমিটি নিয়োগ করা হয়েছে তার শর্তগুলি তিনি যেন নজর করে দেখেন।

নিয়মশৃঙ্খলা ও অঙ্গীকার রক্ষার যুক্তি মৌলানার একমাত্র সম্বল। কিছুতেই তিনি বুঝছেন না, যেহেতু সেই অঙ্গীকারের পরে কংগ্রেসের ভিতরে বৈপ্লবিক সঙ্কট দেখা দিয়েছে অতএব ঐ যুক্তি আর টেকে না। ওয়ার্কিং কমিটি জনগণের আস্থা হারিয়েছে। বাংলাদেশে ওয়ার্কিং কমিটি বিধিসঙ্গত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিরও আস্থাভাজন নয়। ফলে সেই অঙ্গীকার আপনি বাতিল হয়ে গেছে। ১৯৩৬-৩৭ সালে যে পরিস্থিতি ছিল তাতে এবং সেইসঙ্গে তখনকার ওয়ার্কিং কমিটিকে

ফিরিয়ে আনা হোক, তাহলেই অঙ্গীকারের দায় স্বীকার করা হবে। বর্তমান ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৩৬-৩৭এর কমিটির উত্তরাধিকারী, এই যুক্তিও অসার, কারণ, বৈপ্লবিক সঙ্কট যখন দেখা দেয় তখন আগেকার আনুগত্য অঙ্গীকার কিছুই টিকে থাকে না।

কংগ্রেস গঠনতন্ত্র বা গঠনতান্ত্রিক বিধিবিধান যাই বলুক না কেন, মৌলানা নিজে হয়ত ভাবছেন, তাঁর মুখের বয়ানই বিধান। এই কারণেই, বিধিবিধান ও নিয়মকর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতাবশে, তিনি অত্যন্ত ধৃষ্টতার সঙ্গে বঙ্গীয় কংগ্রেস সংসদীয় পার্টির যে বার্ষিক সভা জেনারেল সেক্রেটারি নিয়মসম্মতভাবে আহ্বান করেছিলেন তা বাতিল করার আদেশ দেন। এবং এই কারণেই পাঞ্জাব কংগ্রেস সংসদীয় পার্টিকে কোন ব্যক্তিবিশেষকে নেতা নির্বাচিত করার নির্দেশ দিয়ে একই প্রকার ধৃষ্টতার তিনি পরিচয় দেন।

মৌলানার দুর্ভাগ্য, ওই পার্টি তাঁর হুকুমনামা সত্ত্বেও সর্দার সম্পূরণ সিংকে নেতা নির্বাচিত করেছে। কিন্তু এই সর্দারজী নেতারূপে নির্বাচিত হবার পর থেকে মৌলানা তাঁর পিছনে লেগে রয়েছেন। মোগল বাদশাহ এখন কংগ্রেস পার্টি থেকে সর্দার সম্পূরণ সিংকে বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছেন। সেই পার্টি তাঁদের নেতাকে ত্যাগ করবে না, বাংলাদেশের মত নেতার সপক্ষে দাঁড়াবে, যথাকালে তা দেখা যাবে।

যাই ঘটুক, মাস্টার তারা সিং এবং সর্দার সম্পূরণ সিংয়ের মত গণ্যমান্য নেতাদের কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত করে কংগ্রেস হাই কমাণ্ড যে কার্যত শিখদের কংগ্রেস থেকে দূর করে দিতে চাইছে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। শুধু এইটুকু আশা করা যেতে পারে শিখরা নীরবে এই মোড়লি মাথা পেতে নেবে না, যেহেতু কংগ্রেস একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং কোন ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর সম্পত্তি নয়।

যেভাবে আমাদের মোগল বাদশাহটি সর্বত্র ভণ্ডুল করে চলেছেন তাতে সৎ ব্যক্তিমাত্রই চিন্তিত হবে। সর্দার সম্পূরণ সিংয়ের সাম্প্রতিক ব্যাপারে কংগ্রেসের সর্বাধিনায়ক হিসেবে মহাত্মা গান্ধীকে ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, কিন্তু মৌলানা মাথা না গলিয়ে থাকতে পারেননি।

এখন দেখা যাচ্ছে সিন্ধুর ব্যাপারেও তিনি গোলমাল পাকিয়েছেন। মৌলানার দারুণ বিরোধিতা সত্ত্বেও আসামে যখন কংগ্রেস কোআলিশন মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়, তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন, মন্ত্রিসভার সঙ্গে সঙ্গে পতন ঘটবে। কিন্তু আমি যা বলেছিলাম সেইমত ওই মন্ত্রিসভা সর্বপ্রকার আক্রমণ সহ্য করে পাহাড়ের মত অটল রয়ে গেল। যখন যুদ্ধ বাধল মৌলানা তাঁর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করলেন। সেখানে কংগ্রেস পার্টির যারা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তাদের হাতে তিনি ওই প্রদেশটি সমর্পণ করলেন।

সিন্ধুতে, তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী খাঁবাহাদুর আল্লা বক্স কংগ্রেস পার্টি সমেত অন্যান্য পার্টির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোআলিশন গঠন করবার জন্য যখন মরিয়া হয়ে উঠেছেন এবং কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি যখন তাঁর প্রয়াসকে দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করছি, মৌলানা তখন তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। তার ফলে ধীরে ধীরে অবস্থার অবনতি ঘটল এবং পরিণামে সিন্ধুতে দেখা দিল এক বিশৃঙ্খল অবস্থা।

সিন্ধুতে দীর্ঘকাল থাকার পর সবেমাত্র সেইদিন মৌলানা প্রতিশ্রুতি দিলেন, সেখানে স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠিত হবে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তাঁর সব আয়োজনই বানচাল হতে চলেছে।

পরিশেষে মৌলানার কাছে আরেকবার আমি আবেদন করছি, স্থানীয় ও প্রাদেশিক ব্যাপারে ডিক্টেটারের চালে চলা থেকে তিনি যেন বিরত থাকেন। বাংলাদেশে মিউনিসিপাল নির্বাচনে, প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে, প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচনে অসংখ্যবার তিনি সমুচিত শিক্ষা পেয়েছেন। এই প্রদেশে তাঁর কতটুকু প্রভাবপ্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা আছে এবারে তা তাঁর বোঝবার সময় হয়েছে। যদি তিনি তাঁর বর্তমানের আত্মহননীতি পরিহার করে সমগ্র দেশকে ব্যাপকতর যে সমস্যাগুলি বিচলিত করছে সেইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, তাহলে তিনি দেশের বিরাট একটা কাজ করবেন।

লর্ড লিনলিথগোকে লেখা দুইটি চিঠি

১

৩৮।১ এলগিন রোড
কলিকাতা
২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৪০

মান্যবরেষু,

অনেক দ্বিধাসংকোচের পর আপনাকে চিঠিতে বাংলার পরিস্থিতি জানাব স্থির করেছি, যদিও আমি নিজে এখনও শয্যাশায়ী আছি। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী এবং দেরি করা চলে না। তাছাড়া, সৌভাগ্যবশত আপনি এই সময়ে বাংলাতেই রয়েছেন, সেই কারণে আপনার পক্ষে সরেজমিনে পরিস্থিতিটা বিচার করা এবং সেইসঙ্গে আমি যা বলছি তার সত্যতা যাচাই করা সহজ হবে। এই সুযোগ দুর্লভ এবং জনসাধারণের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে আমার পক্ষে এই সুযোগ ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না। আপনার সময় অপহরণ এবং মনোযোগ আকর্ষণ করায় যদি আমার অন্যায় হয়ে থাকে তাহলে তা এই কারণে মার্জনীয়।

২। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের কাঠামো থাকা সত্ত্বেও সপরিষদ বড়লাটের প্রাদেশিক ক্ষেত্রেও কিছু কিছু দায়িত্ব রয়েছে। কিন্তু প্রাদেশিক ব্যাপার নিয়ে আপনি নিবিষ্ট থাকবেন এরূপ প্রত্যাশা করার পক্ষে একমাত্র গঠনতান্ত্রিক বিধানটুকুই যথেষ্ট নয়। অবশ্য যুদ্ধের ফলে ভারতে যে গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তা কেন্দ্রাভিমুখী, এ ছাড়া সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের শাসন-দায়িত্ব এখন সরাসরি ভারত সরকারের।

৩। যে সমস্যা আপনার কাছে আমি উপস্থাপিত করতে চাই সোজাসুজি আমি এখন সেই প্রসঙ্গে আসছি। বাংলাদেশ যে মন্ত্রিসভার শাসনাধীন, উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি উভয়তই তা প্রবলভাবে

সাম্প্রদায়িক। এই শাসনের আড়ালে একটা বোঝাপড়া রয়েছে—সম্ভবত অলিখিত একটা বোঝাপড়া। তার একপক্ষে আছে মুসলিম এম. এল. এ.রা এবং অপরপক্ষে আছে ইংরেজ সরকার ও ইংরেজ সওদাগরী সমাজ। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে, মুসলিমদের যা খুশি তাই করতে কোন বাধা নেই, অথচ রাজনৈতিক প্রশ্নে গভর্নরের ও ইংরেজ সওদাগরী সমাজের ইচ্ছাকেই মান্য করা হয়। উভয়পক্ষের কোন-দিকেই যারা নেই, ১৯৩৭ সাল থেকে বাংলার শাসনপটে তাদের কোন স্থান নেই। তাদের বাইরে থাকাতে তেমন কিছু এসে যেত না যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে যতটুকু সততা, যোগ্যতা ও অপক্ষপাতিত্ব শাসনব্যবস্থায় থাকা দরকার শাসনকার্যে ততটুকু থাকত। দুর্ভাগ্যবশত তা নেই। নগ্ন সাম্প্রদায়িকতা মনে হয় এই শাসনব্যবস্থার মূলনীতি, অযোগ্যতা ও দুর্নীতি তার অপর বৈশিষ্ট্য।

৪। একটা কথা এখনই আমার বলে রাখা দরকার। উল্লিখিত-ভাবে বাংলার মন্ত্রিসভাকে সমালোচনা করেছি বলে আমার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে হিন্দুমহাসভার দৃষ্টিভঙ্গির কোনই মিল নেই। মুসলিমদের স্বার্থ জড়িত সবকিছুতে তাদের প্রাপ্য অংশ স্বেচ্ছায় ও সানন্দে স্বীকার করে নিতে আমার মত লোকেরা সর্বদা প্রস্তুত। এ বিষয়ে আমাদের সদিচ্ছা অতীতে আমাদের কাজে আমরা প্রমাণ করেছি—যে কাজের ফলে হিন্দুদের মধ্যে যারা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন তাদের কাছে আমরা অপ্রিয় হয়েছি। আজ সারা ভারতে সম্ভবত আমরাই একমাত্র পার্টি যারা এখনও দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনার আশা রাখে এবং ভারতীয় মুসলমানদের বিরাট এক অংশের শুভেচ্ছা এখনও দাবি করতে পারে।

৫। এ দেশে ব্রিটিশশাসনের সূত্রপাত থেকে বাংলাদেশেই যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ লালিত হয়েছে, এ কথা কেউ অস্বীকার করবে না। বিশেষ করে হিন্দুবাংলা বিগত দশকগুলিতে জাতীয়তার ধারায় চিন্তা করে এসেছে এবং তারই ভিত্তিতে নিজেদের গড়ে তোলার প্রয়াস করেছে। তার ফলে হিন্দুমহাসভা কখনই এখানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ

হতে পারেনি। কিন্তু আজ মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার অনিবার্য প্রতিফলস্বরূপ হিন্দু বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে। সাম্প্রদায়িক ঘূর্ণির অন্তহীন আবর্তের মধ্যে পড়ে যারা জাতীয়তায় বিশ্বাসী তারাও অসহায় বোধ করছে।

৬। অবশ্য এ কথা বলা যেতে পারে, ১৯৩৭ সাল থেকে বাংলাদেশের হিন্দুরা যে নিগৃহীত হচ্ছে, অথবা তাদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িকতার প্রসার হচ্ছে বা শাসনব্যবস্থা সাম্প্রদায়িকতায়, অযোগ্যতায় ও দুর্নীতিতে কলুষিত হচ্ছে, এ সবের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের বা ইংরেজ সওদাগরী সম্প্রদায়ের কিংবা সাধারণভাবে মুসলিমদের প্রত্যক্ষত কোন যোগ নেই। কিন্তু তা কেবল আপাত সত্য। আমার বক্তব্য এই যে, আজ যদিও বাংলার হিন্দুরা দুর্দৈব ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে, অবস্থার এমন পরিণতি ঘটছে যাতে খুব শীঘ্রই অপরাপর সম্প্রদায়গুলিকেও তা প্রভাবিত করবে। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায়, বাংলাদেশের মুসলিম মন্ত্রিমণ্ডলী যে অস্ত্র নিক্ষেপ করে চলেছেন অনতিবিলম্বে তার প্রত্যাঘাতের শিকার হবে আর সব সম্প্রদায়। এবং বাংলাদেশে যেদিন সিন্ধুর সঙ্কট দেখা দেবে, পরিস্থিতি তখন এমন হবে যে কোন প্রতিকার সম্ভব হবে না।

৭। বাংলার নিদারুণ সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি, তার কারণ এই নয় যে, হিন্দুরা দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে, তার কারণ এই যে, অনতিবিলম্বে এর প্রতিবিধানের উপায় যদি না পাওয়া যায় এবং তা কার্যকর করা না হয় তাহলে সমগ্র প্রদেশের ভবিষ্যৎ শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে।

৮। এর অন্যতম সম্ভাব্য প্রতিবিধান, এবং বর্তমান অবস্থাবিপাকে মনে হয় সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবিধান, এমন একটি সরকার গঠন করা যা প্রধান প্রধান সম্প্রদায় দুটির আস্থাভাজন হবে এবং সমগ্র প্রদেশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে। ন্যায়বিচার, সততা ও যোগ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থাই এই সমস্যার আদর্শ সমাধান। বর্তমানে যদিও আমাদের কিছু মন্ত্রী আছেন যাঁরা নিজেদের হিন্দু বলে

পরিচয় দেন, তাঁদের উল্লেখযোগ্য কোন প্রভাব নেই। এর ফলে বর্তমান সরকারের উপর সমগ্রভাবে হিন্দুসম্প্রদায়ের কোন আস্থা নেই। তফসিলী জাতিদের সম্পর্কে বলতে গেলে, বঙ্গীয় আইনসভায় তাঁদের অধিকাংশ প্রতিনিধি বিরোধীপক্ষের আসনে বসেন এবং তফসিলী জাতির দুজন মন্ত্রীর উদার হাতে অনুগ্রহ বিতরণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা আইনসভায় তফসিলী জাতির বিরোধিতায় ফাটল ধরাতে সক্ষম হননি। মুসলমানদের সম্পর্কেও সঙ্গতভাবে বলা যেতে পারে যে, তাঁদের মধ্যে প্রভাবশালী একটা অংশ বর্তমান প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। তার প্রমাণ কৃষক প্রজা পার্টি। এঁদের প্রভাব মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এই পার্টি বরাবর বিরোধীপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেছেন।

৯। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই ব্যাপারে আপনার বিরাট একটা দায়িত্ব আছে। প্রত্যক্ষ দায়িত্ব আসছে গঠনতান্ত্রিক সূত্রে। পরোক্ষ দায়িত্বের মূলে আছে বাস্তব এই সত্য যে, বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী তার অস্তিত্বের জন্য সম্পূর্ণভাবে গভর্নর ও ইংরেজ সওদাগরী সমাজের উপর নির্ভর করে।

১০। আপনি যদি বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে খুশী থাকেন, তার কারণ যাই হোক, আমার তাহলে আর বলার কিছু নেই, তাহলে আমার এই চিঠিটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারেন। তবে আমরা জানি, পরিস্থিতি দারুণ সঙ্কটাপন্ন এবং তা সত্য, এবং ইংরেজ সরকার ও ইংরেজ সওদাগরী সমাজ উভয়েই নিজেদের স্বার্থে এই ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত হবেন। হলওয়েল মনুমেণ্ট সত্যাগ্রহের ক্ষেত্রে বেসরকারী ইংরেজ সমাজ দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন এবং তার জন্য তাঁরা ভূয়সী প্রশংসাও পেয়েছেন। বর্তমানক্ষেত্রেও তাঁদের রাজনৈতিক সূক্ষ্মবুদ্ধির অভাব ঘটবে না, খুবই সম্ভব।

১১। আরও একটি প্রতিবিধানের উপায় আমার মনে হচ্ছে, যুদ্ধ চলাকালে গঠনতন্ত্রকে স্থগিত রাখা। কিন্তু সমাধানের অন্য উপায় যখন রয়েছে তখন ওই উপায় সম্পর্কে আপাতত আমি কিছু বলতে চাই না।

১২। ১৯৩৭ সাল থেকে বাংলাদেশের জনজীবনে ইংরেজ সরকার ও ইংরেজ সওদাগরী সমাজ যে ভূমিকা পালন করে আসছেন তাই যদি করে চলেন তাহলে অনিবার্যগতিতে অবস্থার অবনতি ঘটবে, এবং শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় পৌছবে যখন আর প্রতিকার সম্ভবপর নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে পরিণামে যদি তাই-ই ঘটে, তাহলে আমাদের অন্তত এইটুকু সান্ত্বনা থাকবে যে এ বিষয়ে যথাসময়ে আমরা দেশের সর্বোচ্চ শাসনকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম।

ভবদীয়

সুভাষচন্দ্র বসু

২

৩৮।২ এলগিন রোড

কলিকাতা

তারিখ ৩রা জানুয়ারী, ১৯৪১

মান্যবরেষু,

গত ১লা তারিখে মিস্টার লেইথওয়েট এর পত্রে আপনি যে বাণী পাঠিয়েছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে আরও একটি বিষয় আপনার গোচরে আনা আমার উচিত ছিল বলে মনে করি।

২। প্রায় দু'মাস আগে বাংলা সরকার নতুন এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে সর্বপ্রকার সভা, শোভাযাত্রা, প্রতিবাদ সভা ইত্যাদি নিষিদ্ধ করে দেন, অথচ এইগুলি জনসাধারণের জীবনযাত্রার অপরিহার্য অঙ্গ। ১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাঁধবার সময় বাংলা সরকার যে আদেশ জারি করে এই আদেশ তার থেকেও কঠোর।

৩। যাঁরা সরকারি মুখপাত্র তাঁদের জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা সচরাচর বলে থাকেন, তথাকথিত নিষেধাজ্ঞা বস্তুতপক্ষে নিষেধাজ্ঞাই

নয়—যেহেতু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে সভা ইত্যাদির অনুষ্ঠান হতে পারে। কিন্তু যাঁরা আমার যুগের মানুষ, যাঁরা বিশ বছর ধরে জনসেবার কাজে লিপ্ত আছেন তাঁরা সভা অনুষ্ঠানের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে কখনই অভ্যস্ত নন এবং সেই অভ্যাস আমরা এখন ত্যাগ করতে রাজী নই। সরকারও যে আমাদের না জানেন তা নয়। অতএব উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি বস্তুতপক্ষে সর্বপ্রকার সাধারণ সভা ইত্যাদির উপর নিষেধাজ্ঞা হয়েই দাঁড়াচ্ছে।

৪। আপনার হয়তো স্মরণে আছে, ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় বাংলা সরকার যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন সে বিষয়ে গত বৎসরে আমি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তারপরে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাই, তাঁরা যেন সেই অদ্ভুত বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করে ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। আমি তাঁদের বিশেষ করে বলেছিলাম, দিল্লী সমেত দেশের সর্বত্র আমার বক্তৃতা দিতে কোন বাধা নেই অথচ বাংলাদেশে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মুখ বন্ধ করতে হবে—এই ব্যাপারটা কতখানি অসংগত। আমি আরও জানিয়েছিলাম, অন্যান্য সরকারের মত বাংলা সরকারও রাজদ্রোহাত্মক যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতার ক্ষেত্রে যা ব্যবস্থা নেবার তা নিতে পারেন, কিন্তু তাই বলে সব ধরনের সভা ইত্যাদির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা শুধু অন্যায় নয় অপ্রয়োজনীয়ও। আমার আবেদনে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি, অগত্যা পাঁচ মাস অপেক্ষা করার পর শেষ পর্যন্ত নিছক মরিয়া হয়ে আমরা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করতে শুরু করলাম। প্রথম প্রথম আমাদের কিছু কিছু লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, অনতিকাল পরেই দেখা গেল কর্তৃপক্ষের সুমতি হয়েছে, পরে তাঁরা আর আমাদের সভায় হস্তক্ষেপ করেন নি। আমি মনে করি না, এই রকম অদ্ভুত আচরণে বাংলা সরকারের মর্যাদা বেড়েছিল।

৫। আজ ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে এবং বাংলা

সরকার তাঁদের দুর্বোধ্য নীতির দয়ায়, একটা আইন অমান্য আন্দোলন যেচে ডেকে আনছেন। একজন স্বাধীনতাকামী মানুষ স্থানীয় সরকারকে টলাতে সর্বপ্রকারে যখন ব্যর্থ হয়েছে তখন তার পক্ষে এই রকম অবস্থায় কী করা উচিত কিংবা সে কী করতে পারে, আপনাকে যদি এই প্রশ্ন করি আপনিই কী বলবেন?

৬। আমাদের সরকার সংবাদপত্রগুলিকেও রেহাই দেয়নি। প্রথমত, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় এখানকার দৈনিকগুলিকে অনেক বেশি কঠিনভাবে সেন্সর করা হয়। বিভিন্ন প্রদেশের সংবাদপত্র তুলনা করে দেখলেই এই কথার সত্যতা যাচাই হবে। কিন্তু এর থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ, তুচ্ছতম অজুহাতে সরকার কর্তৃক কোন কোন সংবাদ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা। হলওয়েল মনুমেন্ট সত্যাগ্রহের সময় বাংলা সরকার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে সেই আন্দোলন সম্পর্কিত যাবতীয় সংবাদ প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহের সংবাদ প্রকাশ সম্পর্কে ভারত সরকারের বর্তমান যে নীতি তার সঙ্গে কী আকাশপাতাল পার্থক্য!

৭। প্রায় এক মাস আগে, বাংলার বিভিন্ন জেলে কিছু রাজনৈতিক বন্দী যখন অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করেন, বাংলা সরকার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে অনশন ধর্মঘট সম্পর্কিত যাবতীয় সংবাদ, নোটিশ ইত্যাদির প্রকাশ নিষিদ্ধ করে দেন। আমার বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতায় অনুরূপ কোন ঘটনার কথা আমার জানা নেই। এই ঘটনার সবচেয়ে দুঃখজনক দিক এই যে, ব্যাপারটি ঘটেছে "জনপ্রিয়" এক মন্ত্রিমণ্ডলীর সামনে। এই প্রদেশের জনসাধারণ এই প্রকার "জনপ্রিয়" মন্ত্রিমণ্ডলী সম্পর্কে যদি উৎসাহিত বোধ না করে তাহলে অবাক হবার কিছু নেই।

৮। নিজেদের সুবিধা মাফিক যখন বোঝেন বাংলা সরকার তখন কর্মনীতির সাম্যের কথা বড়াই করেন। কিন্তু যখন দেখা যায় কর্মনীতিতে অন্যান্য জায়গা এই প্রদেশ থেকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন সুবিধামত আগের যুক্তির কথা তাঁরা ভুলে যান।

৯। আপনাকে আমার এই চিঠি লেখার উদ্দেশ্য প্রতিকার পাওয়া নয়, আপনাকে শুধু অবহিত করতে চাই, যাতে যে বাধাবিপত্তির মধ্যে বাস করে আমাদের কাজ করে যেতে হয় অন্ততপক্ষে আপনি তা উপলব্ধি করতে পারেন।

ভবদীয়
সুভাষচন্দ্র বসু

ভারতের মহামহিম ভাইসরয় ও গভর্নর জেনারেল।

বসু-গান্ধী পত্রালাপ : ১৯৪০-৪১

[মহাত্মা গান্ধী যুদ্ধ বিরোধী ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পর নেতাজী নিজের দলের পক্ষ থেকে নিঃশর্ত সহযোগিতার প্রস্তাব করে এই পত্রালাপ শুরু করেন। ১৯৪০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে নেতাজীকে লেখা গান্ধিজীর শেষ মূল চিঠিটি নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে।
—শ. ক. র]

৩৮।২ এলগিন রোড
কলিকাতা
২৩।১২।৪০

শ্রদ্ধাস্পদেষু, মহাত্মাজী,

মহাদেবভাই প্রেসিডেন্সি জেলে আমার সঙ্গে যখন দেখা করেন, সেই সুযোগে তাঁর মারফত আপনার কাছে আমার কিছু বক্তব্য পাঠাই। আমি তাঁকে আপনাকে বলতে বলেছিলাম যে, আপনি যদি কোন আন্দোলন শুরু করেন তাহলে আমাদের সমস্ত শক্তি, তার মূল্য যতটুকু হোক, আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে। আমি তাঁকে আরও বলি, বাংলাদেশের বিবাদটা মিটিয়ে ফেলার জন্যে আপনাকে উদ্যোগী হতে যেন অনুরোধ করেন, তা হলে এই প্রদেশ তার সমস্ত শক্তি নিয়ে আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়তে পারে। আপনি সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হয়েছেন বলে কংগ্রেসের তরফ থেকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা করা সহজ হত, অন্তত তাই আমি ভেবেছিলাম।

সেই সময়ে আমার একান্ত আশা ছিল আপনি গণআন্দোলন শুরু করবেন, যেমন করেছিলেন ১৯২১, ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালে—যদিও মহাদেবভাই আমাকে বলেছিলেন যে, আপনি ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনের কথা ভাবছেন। আজ একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, আপনার এ আন্দোলন আমাদের স্বাধীনতার জাতীয় দাবির প্রশ্নে

নয়। সরকার যদি যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা দিতে দেয়, তাহলে, আমার যা মনে হয়, আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটবে। যদিও এই আন্দোলনের ক্ষেত্র ও প্রকৃতি সীমিত, তা সত্ত্বেও আমাদের রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, আমাদের শক্তিতে যতখানি সম্ভব আমরা এই আন্দোলনের সঙ্গেই সহযোগিতা করতে উৎসুক। আমরা জানতে চাই, আমাদের এই সহযোগিতার মূল্য যাই হোক, আপনি তা গ্রহণ করবেন কি না—এবং যদি করেন, তাহলে সহযোগিতার এই প্রস্তাবের পরে আপনি আমাদের কী করতে বলেন। এই অযাচিত সহযোগিতা এই অর্থে কোন শর্তসাপেক্ষ নয় যে, কংগ্রেস হাই কমাণ্ডের বিরুদ্ধে আমাদের যতই অভিযোগ থাক, তা আমাদের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে না। যদি হাই কমাণ্ড আমাদের সঙ্গে অসঙ্গত ও অন্যায় ব্যবহার করেন এবং যখন তা করবেন, তখন আমাদের যথোচিত প্রত্যুত্তর দিতে হবে। এখন যেমন আমাদের বাধ্য হয়ে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের যথেচ্ছ ও বেপরোয়া কার্যকলাপের প্রতিবাদ করতে হচ্ছে, তেমনই তাঁদেরও প্রতিবাদ করতে হতে পারে। কিন্তু এইজন্যে দেশের সামনে বৃহত্তর যে প্রশ্নগুলি রয়েছে তাদের দিকে আমরা চোখ বুজে থাকব না এবং সেইসব ক্ষেত্রে আমাদের রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে সহযোগিতা সম্ভব পূর্ণমাত্রায় সেই সহযোগিতা আপনি পেতে পারেন। আমাদের এই সহযোগিতার প্রস্তাব গ্রহণ করতে আপনাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে মহাদেবভাইকে আমি বলেছিলাম, আপনি যদি একতা চান, ইচ্ছা করলেই আপনি তা পেতে পারেন এবং তার জন্যে কেবল দরকার আপনার সঙ্গে আমার দাদা শরৎবাবুর বাক্যালাপ। তার পর থেকে অবস্থার অবনতি ঘটেছে। এ বিষয়ে আপনি নীরব ও উদাসীন থাকাই ভাল বলে বোধ করেছেন। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে মৌলানা উন্মাদের মত যাকে তিনি বলেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সেই পথে ধেয়ে চলেছেন। এইজন্যে আমি উদ্বিগ্ন নই, যেহেতু যদি তাই তাঁর মনোগত ইচ্ছা হয় এবং তিনি তাই

চান, আমরা তাঁর সঙ্গে তাঁর নিজক্ষেত্রেই লড়াই করতে প্রস্তুত আছি। জনসাধারণের কাছে আমাদের যে প্রতিষ্ঠা রয়েছে বিন্দুমাত্র তিনি তা ক্ষুণ্ণ করতে পারবেন না। তিনি এই প্রদেশের জনসাধারণের কাছে নিজেকে কেবল হাস্যাস্পদ করছেন এবং তার দ্বারা কংগ্রেসের সুনামকে কর্দমলিপ্ত করছেন। অত্যন্ত বিনীতভাবে আমি এইটুকু বলে রাখতে চাই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের সঙ্গে এঁটে ওঠা তাঁর সাধ্যে নেই। যেহেতু মৌলানা যা করেছেন তাতে আপনার পরোক্ষ সম্মতি আছে, আমি আপনাকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বলব না। আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া অপ্রীতিকর এই গৌণ ঘটনা সত্ত্বেও আমার মনোগত অভিলাষ এই যে, যে যে ক্ষেত্রে বৃহত্তর প্রশ্ন জড়িত সেই সব ক্ষেত্রে আমাদের দিক থেকে সহযোগিতা করা উচিত হবে, এবং সহযোগিতা করার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব। মনেপ্রাণে আমি আপনার কাছে আমাদের সহযোগিতার প্রস্তাব করছি

আমার এক আত্মীয় নাগপুরে যাচ্ছেন, তাঁরই হাত দিয়ে আমি এই চিঠি পাঠাচ্ছি। উত্তরের জন্য তাঁকে আমি অপেক্ষা করতে বলে দিচ্ছি।

আপনার স্বাস্থ্য এখন কেমন আছে? সংবাদপত্রে আবার উদ্বেগজনক খবর বের হচ্ছে। আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হচ্ছে, তবে ধীরে ধীরে।

আপনার স্নেহাস্পদ
সুভাষ

মহাত্মা গান্ধী
ওয়ার্ধা

সেবাগ্রাম
ওয়ার্ধা
২৯।১১।৪০

কল্যাণীয় সুভাষ,

সুস্থ অসুস্থ সব অবস্থাতেই তুমি অদম্য। আগুনের খেলায় মাতিবার আগে তোমার সারিয়া ওঠা নিশ্চয় দরকার।

মৌলানা সাহেবের সহিত আমার কোন সলাপরামর্শ হয় নাই। তবে সংবাদপত্রে সিদ্ধান্ত বিষয়ে যখন পাঠ করি আমি তাহা অনুমোদন না করিয়া পারি নাই। নিয়মানুবর্তিতা এবং নিয়মানুবর্তিতার অভাবের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করিতে তুমি নারাজ দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি।

কিন্তু এক বিষয়ে আমি তোমার সহিত সম্পূর্ণ একমত। জনপ্রিয়তার দিক হইতে তোমাদের দুইজনের কোন একজনের সহিত মৌলানা পারিয়া উঠিবেন না। কিন্তু মানুষকে জনপ্রিয়তার পূর্বে বিবেকের কথা ভাবিতে হইবে। আমি জানি তোমাদের দুইজনকে বাদ দিয়া বাংলাদেশে কাজ করা দুঃসাধ্য। আমি ইহাও জানি যে, কংগ্রেসকেও বাদ দিয়া তোমরা তোমাদের কাজ চালাইয়া যাইতে পার। কিন্তু কঠিন বাধাবিপত্তির মধ্যেও কংগ্রেসকে যেমন করিয়াই হোক, সামলাইয়া চলিতেই হইবে।

সুরেশ আমাকে লিখিয়াছিল শরৎ আসিতেছে। আমি তার প্রতীক্ষায় আছি। যখন খুশি সে আসিতে পারে এবং তুমিও পার। তুমি জান, এখানে তোমার দেখাশোনা ভালমতই হইবে।

তোমার ব্লকের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করার বিষয়ে আমি মনে করি, তোমার আমার মধ্যে যখন মৌলিক মতভেদ রহিয়াছে তখন তাহা সম্ভব নয়। যতদিন আমাদের মধ্যে একজন অপরের মতাবলম্বী না হয় ততদিন আমাদের ভিন্নপথে পাড়ি দিতেই হইবে, যদিও আমাদের উভয়ের লক্ষ্যস্থল আপাতদৃষ্টিতে, কেবলমাত্র আপাতদৃষ্টিতেই এক মনে হইতে পারে।

ইত্যবসরে একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া আমরা পরস্পরকে যেন ভালবাসিয়া যাইতে পারি।

তোমার

বাপু

৩৮।২ এলগিন রোড

কলিকাতা

১০।১।৪১

শ্রদ্ধাস্পদেষু মহাত্মাজী,

২৯শে ডিসেম্বর তারিখের আপনার চিঠিখানি পেয়ে আমি খুশী হয়েছি, খুশী হওয়ার কারণ চিঠির বিষয়বস্তুর জন্য যতটা নয়, ততটা তাতে আপনার মতামতের যে বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে, তার জন্য। আমাদের দিক থেকে, মনেপ্রাণে সহযোগিতা করার প্রস্তাবটি কেবলমাত্র আমারই ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা নয়, আমার সঙ্গে যাঁরা আছেন তাঁদের অনেকেরই আকাঙ্ক্ষা তাই। তা করতে গেলে আমাদের রাজনৈতিক নীতি ও আদর্শ ত্যাগ করার বা বিকিয়ে দেবার দরকারও নেই, তা কাঙ্ক্ষিতও নয়। আপনার তো জানা আছে, পূর্বেকার সংগ্রামে অনেকে একনিষ্ঠ গান্ধীবাদীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন যদিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে তাঁদের সঙ্গে মতভেদ ছিল। আবার তা হবে না কেন? আপনার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি।

আপনার চিঠিতে একটি বাক্য আছে যার পুরা তাৎপর্য আমি ঠিকমত ধরতে পেরেছি কিনা, আমি সুনিশ্চিত নই। আপনি বলেছেন—"যতদিন আমাদের মধ্যে একজন অপরের মতাবলম্বী না হয় ততদিন আমাদের ভিন্নপথে পাড়ি দিতেই হইবে, যদিও আমাদের উভয়ের লক্ষ্যস্থল আপাতদৃষ্টিতে, কেবলমাত্র আপাত-

দৃষ্টিতেই এক মনে হইতে পারে।" ইহার অর্থ কি এই যে, আপনার মতে আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য বিভিন্ন ? কী করে তা হতে পারে ? আপনি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন অনুগ্রহ করে জানাবেন।

পত্রালাপের বিষয়ে আমাদের মতামত জানবার জন্য অনেকেই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন এবং তাঁদের মধ্যে কিছু লোক আমাদের মধ্যে মতৈক্য আশা করছেন। এই চিঠিপত্র তাঁদের দেখাতে এবং প্রয়োজন হলে প্রকাশ করতে আমাকে অনুমতি দিচ্ছেন কি ? আজ অবধি আমি কেবল জনাকয়েক বন্ধুকে তা দেখিয়েছি।

আশা করি আপনি ভাল আছেন। মোটের উপর আমি ভালই আছি—তবে কিছু কিছু গোলযোগ সহজে যাবার নয়।

সশ্রদ্ধ প্রণামসহ

আপনার স্নেহাস্পদ
সুভাষ

মহাত্মা গান্ধী
সেবাগ্রাম

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদের নিকট শেষ চিঠি

৩৮।২ এলগিন রোড
কলিকাতা
৯. ১২. ৪০

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীপরিষদ সমীপে,
[অতিরিক্ত সচিব, বাংলা সরকার, মারফত]

মহাশয়গণ,

গত ৫ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ প্রায় ৪।৩০টার সময় প্রেসিডেন্সি জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমার সেলে যথারীতি আমাকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও আমার কুশল জিজ্ঞাসা করে আমাকে বলেন, "আমার উপর হুকুম এসেছে আপনাকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিতে হবে। অ্যাম্বুলেন্স তৈরি রয়েছে।" এই কথার অর্থ যে কী অত্যন্ত নির্বোধের কাছেও তা সহজবোধ্য।

পরের দিন সকালে আমি জেনে অবাক হই যে, সরকার ভারত-রক্ষা নিয়মাবলীর ২৬ ধারা অনুযায়ী আটকের আদেশ কেবলমাত্র 'স্থগিত' (প্রত্যাহার নয়) রেখেছেন।

তা সত্ত্বেও অনুমান করা গিয়েছিল, যাই হোক না কেন, অন্তত-পক্ষে ফৌজদারী মামলাগুলি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। দেখা যাচ্ছে অনুমানটা ঠিক হয়নি।

এখন মনে হচ্ছে জেলে থাকাকালে এইসব ব্যাপার জানলে আমার সুবিধা হত। যাই হোক, এখন আমি সরকারকে অনুগ্রহ করে জানাতে অনুরোধ করছি—

(১) তাঁরা ভারতরক্ষা নিয়মাবলীর ২৬ ধারা অনুযায়ী আদেশ প্রত্যাহার করবেন কি না ;

(২) আমার বিরুদ্ধে যে মামলা দুটো এখনও চলছে তা তাঁরা প্রত্যাহার করবেন কি না।

তাঁদের কাছ থেকে জবাব পাবার পর আমি স্থির করব, আমি আবার জেলে ফিরে গিয়ে সুস্থ হবার পর অনশন ধর্মঘট শুরু করব, না, এখনই তা শুরু করব।

একটা কথা যেন ভেবে দেখা হয়, আইনের দিক থেকে মামলা দুটোর অবস্থা অত্যন্ত গোলমেলে, কারণ আমি এখন পুলিস হেফাজতেও নেই, জেল হেফাজতেও নেই।

এতৎসত্ত্বেও সরকার গত ৫ই তারিখে আমার প্রতি যে সৌজন্য দেখিয়েছেন তার জন্য আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

ভবদীয়

সুভাষচন্দ্র বসু

বাংলা সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট এই পত্রের নকল প্রেরিত হইল।

পরিশিষ্ট

১

নেতাজীকে লেখা রাসবিহারী বসুর একটি চিঠি ১৯৩৮

[নেতাজী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন খবর পেয়ে জাপান থেকে রাসবিহারী বসু ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁকে এলাহাবাদের স্বরাজ ভবনের ঠিকানায় এই চিঠিটি লিখেছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ গুপ্তচর বিভাগ চিঠিটি পথে আটক করে। ফলে চিঠিটি নেতাজীর হস্তগত হয়নি। মূল ইংরাজী চিঠিটি দিল্লীর ন্যাশনাল আরকাইভস-এর সৌজন্যে পাওয়া গেছে। —শ. ক. ব]

২৫।১।৩৮
টোকিও

প্রিয় সুভাষবাবু,

ভারত থেকে আসা এক সংবাদ-সূত্র থেকে জেনে খুশী হলাম যে আপনি পরবর্তী কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। বাঙালী হিসেবে আমি আপনার জন্য গর্ব বোধ করছি। ভারতে ব্রিটিশ অধিকারের জন্য বাঙালীরা অংশত দায়ী ছিল, এবং আমার মতে বাঙালীদের প্রাথমিক কর্তব্য ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য আরও বেশী আত্মত্যাগ করা। বাঙালীরা তাদের আত্মত্যাগ ও নিগ্রহের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতকে চালিত করবে, বিধির এই বিধান। এই আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এবং এই আমার প্রত্যাশা, আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য আপনি কংগ্রেসকে সুনির্দিষ্ট নেতৃত্ব দান করবেন।

বর্তমানে কংগ্রেস একটা সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলেছে। এটি আপাতত একটি নিয়মতান্ত্রিক সংগঠন এবং তা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছে। কোন পরাধীন দেশে নিয়মতান্ত্রিক বা বৈধ সংগঠন কখনই স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে না, যেহেতু গঠনতন্ত্র

বা আইন শাসকরা রচনা করে তাদের নিজেদের স্বার্থে ও প্রয়োজনে। ব্রিটিশের চোখে যে সংগঠন অ-নিয়মতান্ত্রিক বা অবৈধ কেবলমাত্র এইরূপ সংগঠনই দেশকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কংগ্রেস অ-নিয়মতান্ত্রিক সংস্থায় পরিণত হয়েছিল, এবং সেই কারণেই তা প্রচুর কাজ করতে পেরেছিল। কিন্তু বর্তমানে তা আবার আগেকার নির্দোষ সংস্থায় ফিরে গিয়েছে। বলতে গেলে কংগ্রেস ও অন্যান্য মডারেট দলগুলির মধ্যে কার্যত কোনই পার্থক্য নেই। আমি বুঝে উঠতে পারি না, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সরকারী পদ গ্রহণ করেছিলেন বলে কংগ্রেসীরা আগে কেন সমালোচনা করেছিল। স্যার সুরেন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য মডারেটরা আগেকার তথাকথিত রিফর্মের সময় যা করেছিলেন কংগ্রেসীরা এখন হুবহু তাই করে চলেছে। বরঞ্চ সেই সময়কার মডারেটরা সব রাজনৈতিক বন্দীদের অপরাধ মকুব করার জন্য যে দাবি জানিয়েছিল তার জন্য তারা শ্রদ্ধার পাত্র। এখন কেবল নির্দিষ্ট-সংখ্যক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে কিন্তু তখন সব রাজনৈতিক বন্দীদের অপরাধ মকুব করে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এই সময়ে দেশকে সঠিকভাবে চালিত করার জন্য কংগ্রেসের যা দরকার তা হচ্ছে বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি। এখন এটি বিবর্তনশীল সংস্থা। এটিকে অবশ্যই একটি বিপ্লবী সংস্থায় পরিণত করতে হবে। সারা দেহ যখন বিষাক্ত হয়ে গেছে তখন কয়েকটি অংশে ওষুধের প্রলেপ দিয়ে কোন লাভ নেই।

অহিংসার ভূতকে ঝেড়ে ফেলতে হবে এবং মূলনীতি পালটাতে হবে। "সম্ভবপর যে কোন উপায়ে" আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে, অহিংস হোক, হিংসাত্মক হোক। অহিংস পরিবেশ ভারতীয়দের নিছক মেয়েলী পুরুষ করে তুলছে। বর্তমান জগতে কোন জাতি যদি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে দুনিয়ায় টিঁকে থাকতে চায় তাহলে তার অহিংসার কথা চিন্তা করা উচিত হবে না। এত দীর্ঘকাল ধরে আমাদের কানে "পারলৌকিকতা"র মন্ত্র দেওয়ার ফলে আমাদের যত

বিপত্তি। এই ধারণাকে সম্পূর্ণ বরবাদ করতে হবে। "পারলৌকিকতা"র স্থলে আমাদের প্রথমে "ইহলৌকিকতা" প্রচার করতে হবে যেমন স্বামী বিবেকানন্দ প্রচার করেছিলেন। দরিদ্রনারায়ণদের জন্য সর্বপ্রথমে অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের সংস্থান করতে হবে। আগে তারা দুনিয়াটাকে উপভোগ করুক। তারপরে স্বর্গের কথা বলা যাবে। মুসলমানরা বলে ঃ পীর, আমীর, ফকির ঃ ফকির হও, তবেই দুনিয়াকে তুচ্ছ করতে পারবে। যদি ফকির হতে না পার, আমীর হও এবং জীবনটাকে উপভোগ কর। আমীর যদি না হতে পার, পীর হও। তার অর্থ একটা কাফেরকে হত্যা কর, তারপরে জনসাধারণ পরলোকস্থিত তোমাকে বা তোমার কবরকে ভগবানজ্ঞানে পুজো করবে। গীতাও তাই বলে। আমরা যেন আত্মত্যাগ করি যাতে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ভোগ করতে পারে।

কেবলমাত্র একটি বিষয়ে কংগ্রেসের মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত, তা সামরিক প্রস্তুতি। এখনও জোর যার মুলুক তার। এ-কথা আমাদের মনে রাখতেই হবে। ধর্মের বুলি আউড়িয়ে নিজেদের প্রতারণা করে লাভ নেই। প্রথমে সেনাবাহিনীকে, সেনাবাহিনীর সমস্ত শাখাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কংগ্রেসের আন্দোলন করা উচিত। শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা ইত্যাদি কখনই আমাদের স্বাধীন করতে পারবে না। আসল প্রয়োজন শক্তির। আপনার সমস্ত শক্তি এই একটি বিষয়ে নিবদ্ধ করুন। আমি মনে করি ডাঃ মুঞ্জে সামরিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত করে কংগ্রেসের থেকে অনেক বেশী কাজ করেছেন। সর্বপ্রথমে ভারতীয়দের সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব অর্জন করতে হবে। তাদের অর্জন করতে হবে অস্ত্রধারণের অধিকার।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিন্দু-সংহতি। মুসলমানরাও হিন্দু, যখন তারা ভারতে জন্মগ্রহণ করেছে এবং যখন তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্তান ইত্যাদি অঞ্চলের মুসলমানদের থেকে পৃথক। ইসলামকে হিন্দুপক্ষপুটে আশ্রয় দিতে হিন্দুধর্মের ঔদার্যের অভাব হবে না, অতীতেও যেমন হয়নি। ভারতবাসী মাত্রেই

হিন্দু যদিও তারা নানা ধর্মে বিশ্বাসী হতে পারে, যেমন সব জাপানীই জাপানী যদিও তাদের মধ্যে বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ইত্যাদি থাকতে পারে।

কংগ্রেসের উচিত হবে এশিয়াকে ঐক্যবদ্ধ করার আন্দোলন সমর্থন করা। চীন-জাপান সংঘর্ষে জাপানের উদ্দেশ্য না বুঝে জাপানকে নিন্দা করা কংগ্রেসের উচিত হবে না। ভারত এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশ জাপানের বন্ধু। তার প্রধান উদ্দেশ্য এশিয়ায় ব্রিটিশ প্রভাব লোপ করা। চীনে সে তা শুরু করেছে।

কংগ্রেসের একটা বিশ্বদৃষ্টি থাকা দরকার। ভারতের স্বার্থে ও প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পর্যবেক্ষণ এবং সদ্ব্যবহার করা উচিত। ব্রিটেনের শত্রুদের সঙ্গে আমাদের মিত্রতা করতে হবে। আমাদের পররাষ্ট্র নীতি হওয়া উচিত এই। বাস্তব রাজনীতিক্ষেত্রে ভাবাবেগের কোন স্থান থাকবে না। স্বার্থই একমাত্র ভিত্তি। স্বাভাবিক কারণে জাপান এখন ইংলণ্ড, রাশিয়া ও আমেরিকার চক্ষুশূল। তারা যেনতেনপ্রকারে জাপানকে পদানত করতে চায়। জাপানের পতনের সঙ্গেই পুনরুজ্জীবিত স্বাধীন এশিয়ার সব আশা বিলুপ্ত হবে। জাপান-বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে কংগ্রেস দারুণ ভুল করেছে। আমাদের মনে রাখা উচিত, এমন সময় আসতে পারে যখন ইংলণ্ড জাপানের করমর্দন করবে, এবং জাপানের সঙ্কটকালে ভারতীয়দের জাপান-বিরোধী কার্যকলাপের কথা জাপানকে স্মরণ করিয়ে ভারতকে নিয়ন্ত্রণ করে চলবে। এখন ভারতীয়দের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি জাপানকে সমর্থন করা এবং এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বিশ্বরাজনীতিতে তাদের প্রভাব বৃদ্ধি করা এবং আপাতত যতখানি সম্ভব ব্রিটেনের কাছ থেকে সুবিধা আদায় করা।

পরাধীন দেশের পক্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনে একনায়কত্বের একান্ত দরকার। যুদ্ধের সময় যেমন একনায়কত্ব অপরিহার্য, তেমনই বর্তমানে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও সমান প্রয়োজন একনায়কত্বের। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় কিছু পরিমাণে একনায়কত্ব

দেখা গিয়েছিল, এবং সেই কারণেই সেই আন্দোলন অত সাফল্য লাভ করেছিল।

শান্তির সময় গণতন্ত্র চলতে পারে, কিন্তু যুদ্ধের সময় যদি তা মানা হয় তবে সেই দেশে বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

জীবন কি করে ভোগ করতে হয় তাও যেমন আমরা জানি না তেমনি জীবন কি করে বিসর্জন দিতে হয়, তাও জানি না। আমাদের মুশকিল এখানেই। এই ব্যাপারে আমরা যেন জাপানীদের অনুসরণ করি। তারা এখন তাদের স্বদেশের জন্য হাজারে হাজারে মৃত্যুবরণ করছে। এই আত্মশক্তি আমাদেরও জানতে হবে। আমাদের জানতে হবে কি করে মরতে হয়, তারপরে ভারতের স্বাধীনতার সমস্যার আপনি সমাধান হয়ে যাবে।

আপনার উপর আমার আস্থা আছে। সমালোচনা, বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে যান। সঠিক পথে দেশকে চালিত করুন। আপনার এবং ভারতের সাফল্য আসবেই।

আশীর্বাদসহ,

আপনার প্রীতিভাজন

রাসবিহারী বসু

পুনশ্চ: আপনার বই জাপানীতে অনূদিত হচ্ছে এবং একটি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। আবার আমি জোরের সঙ্গে বলছি "নৌ, স্থল ও বিমানবাহিনী আমাদের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে, অন্যান্য বিভাগে থেকে ব্রিটিশরা ভারত শাসন করুক।"

২

১৯৩৯ সালে নেতাজীর চীন সফরের পরিকল্পনা সংক্রান্ত নথিপত্র

(১) ডক্টর হুয়াং চাও-চিন, ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত কলিকাতায় চীনের কনসাল জেনারেল ছিলেন। ১৯৬৬ সালে তিনি যখন কলিকাতায় আসেন নেতাজী ভবনে তাঁর নিম্নলিখিত বিবৃতিটি লিপিবদ্ধ করা হয়।*

আমার মনে আছে, চীনা কনসাল জেনারেলরূপে কলিকাতায় আমার আগমনের চার-পাঁচ মাস পরে এই ঘরে** নেতাজীর সঙ্গে আমার দু'বার সাক্ষাৎ হয়। একদিন তিনি আমাকে টেলিফোন করে এখানে আসতে বলেন। তাঁর সঙ্গে যখন আমার কথা হয় তখন কেবলমাত্র তিনি এবং আমি উপস্থিত ছিলাম। তিনি আমাকে জানান, তাঁকে গ্রেপ্তার করার সম্ভাবনা আছে এবং তাঁর আশঙ্কা হচ্ছে তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যেতে আর সক্ষম হবেন না। তাঁর পক্ষে চীনের রাজধানী চুংকিংএ রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করা সম্ভব হবে কি না, এ সম্পর্কে তিনি আমার অভিমত জানতে চাইলেন। আমি নেতাজীকে বলি, তিনি যদি চীনের রাজধানীতে বেড়াতে যেতে চান আমি তাঁকে কথা দিতে পারি তাঁকে সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। এবং যথোচিত সংবর্ধনা জানানো হবে। কিন্তু যদি তিনি সেখানে থেকে যেতে চান, আমাকে সসংকোচে তাঁকে বলতে হল, তাহলে আমাকে আমার সরকারের নির্দেশ নিতে হবে। আমি তাঁকে এ-কথাও বলি যে, আমার মনে হয় না আমার সরকার তাঁর প্রস্তাবে রাজী হবেন, কারণ ব্রিটিশ সরকার চীনের মিত্র, এবং কোন মিত্ররাজ্যের (এক্ষেত্রে চীন) পক্ষে এমন কোন রাজনৈতিক দেশত্যাগীকে আশ্রয় দেওয়া সৌজন্যসূচক হবে না

* শ. ক. ব. কর্তৃক অনুলিখিত ও সম্পাদিত।

**নেতাজীর আপিস-ঘর

যিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেন। তিনি বলেন, বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে পরে আমাকে জানাবেন। কয়েকদিন পরে তিনি আমাকে আবার টেলিফোন করে জানালেন যে, তিনি বিষয়টি ভালোভাবে বিবেচনা করে দেখেছেন এবং মনে করেন, আমি যা বলেছি তাই ঠিক। ভারতের বাইরে চলে যাবার জন্য তাঁকে অন্য কোন উপায় অবলম্বন করতে হবে। কারণ তাঁর স্বাধীনতা যদি চলে যায়, তাহলে দেশের জন্য তিনি কিছুই করতে পারবেন না।

(২) ডিরেক্টর ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর কাছে স্বরাষ্ট্র বিভাগের ১৭-১০-৩৯ তারিখের লিখিত লিপি।

স্বরাষ্ট্র বিভাগ। পোল। এফ। নং ২৮।৭৯।৩৯

বিষয়ঃ শ্রীসুভাষচন্দ্র বোসের চীন সফরের জন্য পাসপোর্ট দিবার প্রস্তাব।

পৃঃ নং। ১।

চীনে যাইবার জন্য শ্রীসুভাষচন্দ্র বোসকে পাসপোর্ট দিতে প্রাদেশিক সরকারের কোন আপত্তি নাই। ডি. আই. বি. তাহার মন্তব্যের জন্য অথবা আমাদের দিক হইতে যদি কোন আপত্তি থাকে সেইজন্য ইহা দেখিতে পারেন।

১৭।১০।৩৯ স্বাঃ

১৮।১০

(৩) স্বরাষ্ট্র বিভাগের কাছে ডিরেক্টর ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরোর ১৮-১০-৩৯ তারিখের লিখিত লিপি।

ডি। আই। বি

এইচ। ডি। ইউ। ও। নং এফ ২৯।৭৯।৩৯। পোল। তাং ১৮-১০-৩৯

এই প্রচেষ্টার সংবাদ আমি আগেই পাইয়াছি এবং আমার নিকট ইহা অত্যন্ত সন্দেহজনক বলিয়া মনে হয়। সমগ্রভাবে ভারতের এবং বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের গঠনতন্ত্র ও সরকারের বিরুদ্ধে খোলাখুলি আন্দোলনের নেতা ও সংগঠকরূপে সুভাষ বোসের বিঘোষিত যে পরিকল্পনা ও লক্ষ্য, তাহার সহিত প্রস্তাবিত সফরের কোনই সঙ্গতি নাই। অপরপক্ষে বোসকে শত্রুপক্ষের এজেন্ট বলিয়া দৃঢ় সন্দেহ পোষণ করা হয় এবং তাঁহার জার্মান অর্থপ্রাপ্তির গুজব সম্পর্কে সুবিবেচিত অভিমত এই যে, তিনি এখনও তাহা যথেষ্ট পরিমাণে পান নাই, তবে তিনি যদি "কার্যোদ্ধার" করিতে পারেন, তাহা হইলে অর্থ এবং পরে সমর্থন লাভের আশা করিবার কারণ তাঁহার আছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে চীন সফরের পরিকল্পনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বোস বিমানে যাইতেছেন : তিনি ব্যাঙ্ককে থামিতেছেন। সেখানে বহুসংখ্যক জার্মান রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে মালয় হইতে এমন অনেক দেশত্যাগী আসিয়া মিলিয়াছে যাহারা সেখানকার অন্তরীণ আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছে। তাহাদের সহিত যোগাযোগ করিয়া এবং তাহাদের নিকট হইতে অর্থ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ লইয়া তিনি যাইতেছেন চীনে, চীনের কোথায় তাহা অবান্তর—তারপর তিনি অন্তর্হিত হইতেছেন—পরে তাঁহার আবির্ভাব হইতেছে ইউনানে বা শ্যামে জার্মান পরিচালনাধীনে বর্মা ও ভারতের বিরুদ্ধে এক বৈপ্লবিক আন্দোলনের নেতারূপে। এই প্রকার আন্দোলনের সহিত যোগসূত্র থাকিতেছে বিগত ছয় মাস বা অনুরূপ সময় বোস গোপনে যে

চক্রান্ত গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহারই ফলে প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে বাঙালী সন্ত্রাসবাদের এবং বৈপ্লবিক উগ্রপন্থার সহিত। ইহা মনগড়া কল্পনা নহে, ১৯১৫ সালে শ্যামে অথবা বর্মা সীমান্তে যাহা ঘটিয়াছিল এবং যাহার পরিণতিতে বর্মায় সাত ব্যক্তিকে (ভারতীয়) মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল, তাহার সহিত ইহার অত্যন্ত মিল আছে।

এই প্রসঙ্গে একটি অকিঞ্চিৎকর বিষয়ও প্রণিধানযোগ্য। আসন্ন ভবিষ্যতে ভারতের আভ্যন্তরিক পরিস্থিতিতে বিরাট এক পরিবর্তনের সম্ভাবনা যখন রহিয়াছে, আমাদের এমন কিছু করা উচিত হইবে না যাহাতে সুভাষ বোসের মত একজন বিপজ্জনক ব্যক্তিকে ভারতরক্ষা আইনের অধীনে যেরূপ যথোচিত নিয়ন্ত্রণে রাখা হইয়াছে তাহা শিথিল করিবার ঝুঁকি লইতে হয়।

যে ভিসার জন্য আবেদন করা হইয়াছে তাহা দিবার বিরুদ্ধে আমি দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করিতেছি।

স্বাঃ

১৯-১০-৩৯

(৪) সেক্রেটারির নিকট স্বরাষ্ট্র বিভাগের ২০-১০-৩৯ তারিখে লিখিত লিপি।

এইচ। ডি

ডি। আই। বি। ইউ। ও। নং ১২। পি এফ। ৩৯-এ

তাং ২০-১০-১৯৩৯

ডি। আই। বি-র অভিমত দৃষ্টে আমরা বোসকে পাসপোর্ট না দিবার জন্য বাংলা সরকারকে অনুরোধ করিতে পারি। সম্ভবত ইহার ফলে প্রচুর সমালোচনা হইবে, বিশেষত যখন নেহরুকে সম্প্রতি

চীনে যাইতে দেওয়া হইয়াছিল, তবুও মনে হয় কোন ঝুঁকি লওয়া সমীচীন হইবে না।

স্বাঃ

সেক্রেটারী ২০-১০-১৯৩৯

(৫) ২১-১০-৩৯ তারিখে লিখিত স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারির লিপি।

স্বরাষ্ট্র বিভাগ। পোল। এফ। নং ২৮।৭৯।৩৯

সুভাষ বোস চীন সফরে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এই সংবাদে আমার নিজের ধারণা হইয়াছে যে তাঁহার অভিপ্রায় ছিল রাশিয়ার সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা। তাহা যে বামসংহতি কমিটির তাঁহার কম্যুনিস্ট বন্ধুদের মনঃপূত হইত, ইহা সহজেই অনুমেয়। মিস্টার কারোকে আমি ইহা বলিয়াছি এবং তাঁহার ধারণাও একই প্রকার দেখিতেছি। তাঁহার মতে সুভাষ বোস সিংকিয়াং যাইতে পারেন এবং ভ্রাম্যমান এক বিপ্লবীকে মধ্য-এশিয়ায় ছাড়িয়া রাখিতে পররাষ্ট্র বিভাগ নিশ্চয় চাহিবে না, ছাড়া থাকিলে তিনি সহজেই বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে পারেন।

২। কিন্তু রাশিয়ার সহিত কিংবা তাহার নামেমাত্র মিত্র জার্মানীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করায় মিস্টার বোসের যাহাই উদ্দেশ্য হোক আমার মতে তাঁহার ভারতে থাকাই শ্রেয়, কারণ এখানে আমরা তাঁহার উপর দৃষ্টি রাখিতে পারিব এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে "গাঁথিয়া তুলিতে" পারিব, কিন্তু চীনে বা মধ্য-এশিয়ায় কোন স্থানে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে, আমরা তাহা পারিব না।

৩। অতএব আমরা বাংলা সরকারের টেলিগ্রামের প্রস্তাবিত উত্তর দিতে পারি। নেহরুর যতই দোষত্রুটি থাক, তিনি সুভাষ বোস হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এবং আমি মনে কবি না তাঁহার সফরের

নজির অপর সম্পর্কে একই আচরণ করিতে কোনপ্রকারে আমাদের বাধ্য করে। তাহা ছাড়া, নেহরুর সফরের পরে পরিস্থিতির পরিবর্তন হইয়াছে।

স্বাঃ
২১-১০-৩৯

(৬) স্বরাষ্ট্র সদস্যের (হোম মেম্বারের) লিপি

এইচ। এম।

সেক্রেটারির সহিত আমি একমত।

স্বাঃ
২১-১০-৩৯

৩

নেতাজীকে লেখা জয়প্রকাশ নারায়ণের গোপন চিঠি ১৯৪০

[১৯৪০এর ডিসেম্বরে নেতাজী যখন তাঁর বিদেশ যাত্রাব পবিকল্পনা সম্পূর্ণ করছিলেন, জেল থেকে এক বিশেষ দূত মাবফত জয়প্রকাশ নারায়ণ নিজ হাতে ইংরাজীতে লেখা চিঠিটি গোপনে তাঁর কাছে পাঠান। চিঠিতে কোন তারিখ ছিল না এবং লেখক সাবধানতাব খাতিবে নিজেব নাম সই করেননি। মূল ইংরাজী চিঠিটি নেতাজী বিসার্চ ব্যুবোর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে।

শ. ক. ব.]

প্রিয় কমরেড

এই চিঠি লিখতে আমার যথেষ্ট দুর্ভাবনা হইতেছে না তাহা নহে। দুর্ভাবনা এই কারণে, আপনি ইহা কিভাবে গ্রহণ করিবেন আমি

স্থিরনিশ্চিত নহি। আমি জানি না আপনি আমার কথায় কোন গুরুত্ব আরোপ করিবেন কিনা যদি আমি এই কথা বলি যে কোন সময়েই ব্যক্তিগতভাবে আপনার বিরুদ্ধে আমি কোন আক্রোশ পোষণ করি নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে মতপার্থক্য হইয়াছে, তাহা গোপন করিবার চেষ্টা করি নাই। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত কখনও কিছু হয় নাই। অপরপক্ষে সর্বদা আমি আপনার একনিষ্ঠা ও সাহসের তারিফ করিয়াছি। এবং এসব, সবকিছু যখন আমার নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে আমি আপনার পূর্ববোধ ও ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির তারিফ করিতেছি।

এখানে আমি নিজের মনেই সবকিছু ভাবিয়া দেখিতেছি। সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর জন্য আমার চিন্তাকে সম্পূর্ণ নূতনভাবে সাজাইতে হইয়াছে। আমি স্বীকার করিতেছি, আপসবিরোধী সম্মেলনের এবং আপনি ও স্বামীজী যে মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার যৌক্তিকতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। সুযোগ পাওয়া-মাত্রই প্রকাশ্যে আমি তাহা বলিব।

অত্যন্ত জরুরী এক প্রস্তাব করিবার জন্য আমি এই চিঠি লিখিতেছি। আপনাকে তাহা গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। প্রস্তাবটি আমাদের ভবিষ্যতের সমস্ত কর্মপন্থা এবং ভারতে বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিকাশ সম্পর্কিত। এইখানে স্বামীজীর সহিত তাহা লইয়া আলোচনা করিয়াছি। তিনি অনুকূল মনোভাব পোষণ করেন। আরও বিশদভাবে আমাদের এখনও আলোচনা করিতে হইবে। তাহার ফলাফল যথাকালে আমি জানাইব।

বাহিরের সি. এস. পি. বন্ধুদের নিকট প্রস্তাবটি ইতিমধ্যে আমি পাঠাইয়াছি। সম্ভবত তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তৎসহ অনুশীলন বন্ধুরা এই সূত্রে আপনার সহিত দেখা করিতে পারেন।

প্রস্তাবটি সম্পর্কে কিছু বলিবার পূর্বে কী চোখে আমি বর্তমান পরিস্থিতি ও আসন্ন ভবিষ্যৎকে দেখিতেছি সে সম্পর্কে আপনাকে সংক্ষেপে একটা ধারণা দিতে চাই।

আমার মনে হয় আজ আমাদের মৌলিক কর্তব্য এমন একটি কর্মপন্থা নির্ধারিত করা মূলত যাহা কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্র। কংগ্রেস যদি আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে তবুও এই কর্তব্যের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র হ্রাস পাইবে না। আইন অমান্য আন্দোলন যদি শুরু হয় তাহা হইলেও তাহার উদ্দেশ্য যে সাম্রাজ্যবাদের নিকট হইতে সুবিধা আদায় করার বেশী কিছু থাকিবে না ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। জওহরলাল যতই বলুন দিল্লী প্রস্তাব মোটেই মৃত ও বিলুপ্ত হয় নাই। যে মুহূর্তে ব্রিটিশ সরকার আপসের ইচ্ছা প্রকাশ করিবে সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে বাহির করা হইবে। অতএব, যাহাই হোক না কেন আমাদের সম্মুখে যে সুনিশ্চিত পরিণতি দেখা যাইতেছে তাহা এই, কংগ্রেস যে কোন মূল্যে সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপসরফা করিবে—মূল্য বেশি হইবে না কম হইবে উভয়পক্ষের গরজের উপর তাহা নির্ভর করিবে।

এতদিন আমরা আমাদের এখনকার কাজের ভিত্তি হিসাবে ধরিয়া লইয়াছিলাম যে, রাজনীতিক্ষেত্রে কংগ্রেসই কাজ করার প্রধান হাতিয়ার—সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটি বহুশ্রেণিক ফ্রন্ট (তার এক প্রান্তে শ্রমিকরা, অপর প্রান্তে জাতীয় বুর্জোয়া)। অতঃপর সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্ত হইতে আমাদের কাজে অগ্রসর হইতে হইবে ; তাহা এই, রাজনীতিক্ষেত্রে কাজ করিবার প্রধান ভিত্তি কংগ্রেস আর নাই। আমার বক্তব্য এই নয় যে, জনসাধারণের উপর কংগ্রেসের প্রভাব লোপ পাইয়াছে (যদিও ইহার বিপরীত বর্তমানে যত সত্য গত কয়েক বৎসরের মধ্যে কখনই তেমন হয় নাই ; যথা : কংগ্রেসের উপর জনসাধারণের যতটুকু প্রভাব ছিল তাহা লোপ পাইয়াছে), অথবা তাহার সাম্রাজ্যবাদকে বিরোধিতা করার ভূমিকা শেষ হইয়াছে। বলিতে কি, বর্তমান পরিস্থিতিতে এইরূপ বিরোধিতার সম্ভাবনা অত্যধিক। কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য হইবে দিল্লী প্রস্তাবের দাবি অনুযায়ী কিছু অর্জন করা। এমন কোন সম্ভাবনাও নাই যাহাতে বর্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে কংগ্রেসকে প্রভাবিত করা সম্ভব।

কংগ্রেসের মধ্যে যে পরিবর্তন হইয়াছে এইখানে তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। এখনও ইহা গণভিত্তিক সংগঠন আছে ঠিকই কিন্তু ইহার নেতৃত্ব আগের চাইতেও অধিকতরভাবে যে গোষ্ঠীর কুক্ষিগত তাহা গণবিরোধী (শ্রমিকবিরোধী, কৃষকবিরোধী, এমন কি কিছুমাত্রায় অগণতান্ত্রিক) এবং ভাবাদর্শে ও সহানুভূতিতে সম্পূর্ণরূপে বুর্জোয়া। কৃষক, শ্রমিক ও বামপন্থী জাতীয় প্রভাবগুলিকে পৃথক করিয়া দেওযা হইয়াছে। এই অবস্থায় গণবিপ্লব সংক্রান্ত কাজের জন্য কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী হওয়া চরম বাতুলতা হইবে। উপরন্তু কংগ্রেসের সংগ্রাম যদি শুরু হয় এবং যখন শুরু হইবে বিপ্লবের দিকে আমরা তাহার মোড় ফিরাইতে পারিব এইরূপ আশা করা আমাদের পক্ষে সুদূরপরাহত। তাহার যে কোনই সম্ভাবনা নাই তাহা আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে।

বর্তমানে আমরা কেন কংগ্রেস হইতে স্বতন্ত্রভাবে রাজনৈতিক গণ-আন্দোলনের ভিত্তি রচনার প্রয়াস করিতেছি তাহার আরও একটি কারণ আছে। কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করা। স্বাভাবিকভাবে এই উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বৈপ্লবিক উপায়েই সাধিত হইতে পারিত; এবং কংগ্রেসের নিকট আশা করা গিয়াছিল তাহা বিপ্লবের পথে কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইবে (তাহার দ্বিধাসঙ্কোচসহ)। বর্তমান অবস্থায় এই উদ্দেশ্যের যতখানি পালন করা কংগ্রেস (বর্তমানে যেরূপ সংগঠিত) অভিপ্রেত বলিয়া মনে করে তাহা সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপস করিয়া পালন করার সম্ভাবনা যথেষ্ট রহিয়াছে। নিঃসন্দেহে আপসের জন্যও চাপ দেওয়া দরকার এবং নিঃসন্দেহে কংগ্রেস এই চাপ চালাইয়া যাইবে (এমন কি কোন প্রকারের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ঝুঁকি লইয়াও)। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর রক্তদানে শ্রীরাজাগোপালাচারী যে ক্ষমতা "দখলে"র আশা করেন তাহা পূর্ণ স্বরাজ নয়। শ্রীরাজাগোপালাচারীর এবং তাঁহার কংগ্রেসের পক্ষে ইংরাজের সামরিক ও অর্থনৈতিক অভিভাবকতা বজায় রাখিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী যতখানি স্বরাজ তাঁহারা লইতে পারেন,

তাহা ঠিক ততখানি স্বরাজ হইবে (অভিভাবকতার উদ্দেশ্য তাঁহাদের "স্বরাজ"কে বহিরাগত আক্রমণ হইতে ও ভিতরকার "বিশৃঙ্খলা" হইতে রক্ষা করা, এবং অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থাকে সংরক্ষিত করা ও নিরাপদ রাখা)। কোন কোন অবস্থায়, যে অবস্থার উদ্ভব দেরিতে না হইয়া শীঘ্রই হইতে পারে, ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর নিকট এই প্রকার ব্যবস্থা বিসদৃশ বলিয়া যে বোধ হইবে না, তাহা আশা করা দুরাশা নয়।

ইহা হইতে আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয় যে আমরা একটা পর্যায়ের শেষ প্রান্তে আসিয়া পৌছিয়াছি। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের (জাতীয় বুর্জোয়শ্রেণী, শহরবাসী মধ্যবিত্ত, কৃষকসমাজ, শ্রমিকদল) মিলিত আক্রমণ শেষ দশায় আসিয়াছে। জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী এবং মধ্যবিত্তশ্রেণীর একটা অংশ এই সংগ্রামকে পরিহার করিতেছে (জাতীয় প্রতিরক্ষা ইত্যাদির নামে)। সাম্রাজ্যবাদের নিকট হইতে কিছুটা ক্ষমতা তাহারা আয়ত্ত করিতে পারে, কিন্তু তাহাদের নিকট আশা করা যায় না যে, সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত নিদর্শন নিশ্চিহ্ন না হওয়া অবধি তাহারা লড়াই চালাইয়া যাইবে। সাম্রাজ্যবাদের যাহা অবশেষ থাকিবে তাহা নিশ্চিহ্ন করিবার এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে আগাইয়া লইয়া যাইবার দায়িত্ব শ্রমিক, কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণীগুলির উপর বর্তাইবে। অতএব ভারতের মত দেশে দ্বিতীয় পর্যায়ে কৃষকশ্রেণীর ভূমিকা প্রাধান্য লাভ করিতে বাধ্য এবং এই পর্যায় মুখ্যত কৃষিবিপ্লবের পর্যায়। ইহা দ্বারা এই বোঝায় যে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের (কৃষিবিপ্লব তাহারই অংশ) কাল শেষ হয় নাই এবং প্রলেতারীয় বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায় এখনও আসে নাই। তবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বিতীয় অংশের (কৃষিবিপ্লব তাহারও অংশ) অবসান হয় নাই এবং প্রলেতারীয় বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্যায় এখনও আসে নাই। কিন্তু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম অংশ (সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বদলীয় মিলিত সংগ্রামের কাল) শেষ হইয়াছে এবং দ্বিতীয় ও শেষ অংশ কৃষিবিপ্লব শুরু হইতেছে।

এখানেও আমি বলিতেছি না সত্যসত্যই কৃষিবিপ্লব শুরু হইয়া গিয়াছে, এই অর্থে যে কৃষকরা জমিদারদের জমি দখল করিতে, গ্রাম হইতে তাহাদের বিতাড়িত করিতে, বড় বড় জোত-জমি নিজেদের অধিকারে আনিয়া নিজেদের মধ্যে তাহা বাঁটোয়ারা করিতে নিজেরাই উদ্যোগী হইতেছে। এই অবস্থা এখনও দেখা দেয় নাই যেমন দেখা দিয়াছিল চীনে ১৯২৭ সালে। কিন্তু আমি যাহা বিশেষভাবে বলিতে চাই তাহা এই যে ভারতীয় বিপ্লবের পূর্ব-পর্যায়ের শেষ অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, এবং এইবার পরবর্তী পর্যায়কে ত্বরান্বিত করিতে আমা-দিগকে সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্টভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে।

কোন কোন মহলে এখনই সোভিয়েত গঠনের কথা শোনা যাইতেছে। ইহা স্টালিনের কথা অনুযায়ী "হার মানিতে ঝাঁপ দেওয়া" —একটা পুরা পর্যায় উল্লম্ফন করা। নিঃসন্দেহে কিষাণসভাগুলির অস্তিত্ব রহিয়াছে এবং সর্বত্র তাহাদিগের অভ্যুত্থান হইবে এবং তাহারা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিবে এবং যথার্থ কিষাণ সোভিয়েতগুলির জীবন্ত অগ্রদূত হইবে। (আমাদের 'সোভিয়েত' কথাটি ঋণ করিবার প্রয়োজন নাই। বৈপ্লবিক ঐতিহ্যমণ্ডিত সহজবোধ্য নাম হিসাবে 'কিষাণসভাই' যথেষ্ট ভাল।)

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে ইহাই বোঝায় যে, আমাদের দৃষ্টি কংগ্রেস হইতে কিষাণসভায় ফিরাইতে হইবে। খুব বেশী-সংখ্যক কিষাণসভা নাই এবং তাহাদের সংগঠন কংগ্রেসের মত অত ব্যাপক নহে, ইহা সত্য হইলেও ইহাতে আমাদের দমিবার কোন কারণ নাই। উপযুক্ত পথনির্দেশ এবং ঠিকমত স্লোগান পাইলে তাহারা ভুঁইফোড়ের মত সর্বত্র জাগিয়া উঠিবে।

কিষাণসভাগুলির উপর আমার গুরুত্ব আরোপ করিবার অর্থ যেন এই করা না হয় যে, আমরা আমাদের অন্যান্য কার্যকলাপ এবং প্রলেতারীয় বিপ্লবের জন্য এ তৎসহ আমাদের যাহা কর্তব্য তাহা অবহেলা করিব। শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের প্রতি আমাদের সর্বদা দৃষ্টি রাখিয়া যাইতে হইবে।

কংগ্রেসে আমাদের থাকা উচিত হইবে, না, তাহা ত্যাগ করা বিধেয় এই প্রশ্নে কিছু কিছু লোক উত্তেজিত হইয়া ওঠে। আমার নিকট এই প্রশ্নের গুরুত্ব তেমন নাই। আসল কথা, আমাদের নিকট কংগ্রেস আর বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের সংগঠন নয় এবং এই কারণে এইরূপ ক্রিয়াকলাপের জন্য আমাদের স্বতন্ত্র ভিত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে। যতদিন কংগ্রেস কোন প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যসাধন করিবে আমরা কংগ্রেসে থাকিয়া যাইতে পারি। কিন্তু আমরা জনসাধারণকে তাহাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্য কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে বলিতে পারি না। জনসাধারণকে কংগ্রেসের সহিত বাঁধিয়া রাখিলে তাহাদের চরম অনিষ্টসাধন হইবে এবং বিপ্লবের সর্বনাশ করা হইবে। কংগ্রেসের উপর জনসাধারণের নির্ভরতা দূর করা আমাদের সুস্পষ্ট কর্তব্য। ইহার জন্য জনসাধারণকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে আমাদের দুইটি জিনিস করিতে হইবে: একটি ইতিবাচক, আরেকটি নেতিবাচক। সহজ ভাষায় বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্বের চরিত্র জনসাধারণের নিকট আমাদের ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হইবে (নেতিবাচক)। তাহাদের সংগ্রাম করিবার নিজস্ব সংগঠনগুলি আমাদের গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং একমাত্র তাহাদের উপর নির্ভর করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে।

আমার ধারণা অনুযায়ী আমাদের যখন এই কর্তব্য, তখন, সর্বপ্রথমে আমাদের যাহা করিতে হইবে, একটি বৈপ্লবিক মতাদর্শসমন্বিত একটি বৈপ্লবিক দল, অর্থাৎ, একটি বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক পার্টি গড়িয়া তোলা। আমার নিজস্ব পার্টি, সি. এস. পি. সম্পর্কে বলা চলে। আমাদের সম্মুখে যে কর্তব্য রহিয়াছে তাহার পক্ষে ইহার গঠন অত্যন্ত অনুপযোগী। সমস্ত বিপ্লবীদের একটি বৈপ্লবিক পার্টিতে একত্রিত করিবার সুবর্ণ সুযোগ এখন দেখা দিয়াছে। আমরা একেবারে নূতন করিয়া শুরু করিব, ইহা ধরিয়া লইলে দেশের বিভিন্ন বৈপ্লবিক ধারাকে একই প্রবাহে মিলিত করা সম্ভব হইতে পারে। এবং ইহাই

আমার প্রস্তাব। সি. এস. পি., অনুশীলন, ফরওয়ার্ড ব্লক, কীর্তি, লেবার পার্টি এবং অনুরূপ অন্যান্য দল বা ব্যক্তিদের লইয়া আসুন আমরা নূতন একটি বৈপ্লবিক পার্টি গড়িয়া তুলি। এমন একটি পার্টি যাহা পুরোপুরি মার্কসবাদ লেনিনবাদে নির্ভরশীল, যাহা আর সব রাজনৈতিক পার্টি ও সংগঠন হইতে স্বতন্ত্র। আমি মনে করি ইহা খুবই সম্ভব যদি আপনি ইচ্ছা করেন। সি. এস. পি.কে নূতন পার্টি কেবলমাত্র মঞ্চ ও আবরণ হিসাবে এবং যতদিন আমাদের নিকট সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হইবে, বিশেষ করিয়া কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কাজ করিয়া যাইতে বজায় রাখা যাইতেও পারে, নাও পারে।

যাহাদের লইয়া নূতন পার্টি গঠিত হইবে তাহাদের মধ্যে সি. পি.র উল্লেখ আমি করি নাই। যেহেতু সি. পি. তাহার নিজস্ব গঠনতন্ত্র এবং সি. আই.-এর গঠনতন্ত্র অনুযায়ী অপর কোন সমাজতান্ত্রিক পার্টিতে নিজস্ব অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিতে পারে না। যদ্যপি তাহারা মুখে তাই বলে, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য অপর পার্টিতে প্রবেশের এবং তাহা দখলে (ভাঙিবার) সুযোগ লওয়া। অতএব নূতন পার্টিকে সি. পি. হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে হইবে কিন্তু উভয়ের মধ্যে কাজের ভিত্তিতে একটা বোঝাপড়া থাকিবে।

ইহার অর্থ এই নয় যে নূতন পার্টি সি.আই.-বিরোধী হইবে বলিয়া আমি মনে করি। বাস্তবিকপক্ষে আমাদের মস্কোর সহিত যোগ রক্ষা করিতে হইবে এবং আমাদের বিপ্লবে সোভিয়েতের সাহায্য আমরা চাহিব। তবে তাহা তাহার নিজস্ব নীতি অনুসরণ করিবে, মস্কোর নির্দেশে চলিবে না।

আমার ধারণা নূতন পার্টিটি হইবে সম্পূর্ণভাবে গুপ্ত পার্টি এবং তাহাতে বিপ্লবীরা সর্বদা কর্মরত থাকিবে। ইহার ক্রিয়াকলাপের মধ্যে থাকিবে—(বাক্যটি আমি অসমাপ্ত রাখিলাম। আপনি কারণ কী বুঝিবেন।)

আমার প্রস্তাব সংক্ষেপে এই। এই ব্যাপারে আমি অত্যন্ত আগ্রহী। এবং আপনাকেও আমার অনুরোধ, যথেষ্ট গুরুত্বের সহিত

ইহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আশা করিতেছি পরের মাসের শেষে আমি বাহির হইব। আপনার বিচারের সময় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চেষ্টা করিব। ইত্যবসরে অনুগ্রহ করিয়া ওখানকার বন্ধুদের সহিত, বিশেষ করিয়া অনুশীলন বন্ধুদের সহিত আলোচনা করিবেন। শর্মাজী মারফত আপাতত আপনি কী পরামর্শ দেন আমাকে জানাইতে পারেন। যদি আমরা এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করিতে পারি, তাহা হইলে ভারতে বড় আকারের কিছু একটা করিয়া উঠিতে আমরা সমর্থ হইব।

পার্টির কথা ছাড়াও সংগ্রামের জন্য এবং ক্ষমতা দখলের জন্য আমাদের গণ-সংগঠন প্রয়োজন। প্রধানত কিষাণ ও মজদুর-সভাগুলিতেই আমি সেইরূপ দেখিতেছি। কৃষক ও শ্রমিকদের বিরাট ইউনিয়নে (কংগ্রেস অফ পেজাণ্টস্ অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স সোভিয়েটস) এইগুলিকে মিলিত করিতে হইবে। আসন্ন ভবিষ্যতে এই ইউনিয়ন গঠন করা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য হইবে।

আশা করি আপনার স্বাস্থ্য ভাল আছে এবং আপনার নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছেন। আমরা এখানে সম্পূর্ণ সুস্থ আছি।

শুভেচ্ছাসহ

আপনার

কমরেড